সূচী

বিশ্ব-সাহিত্য

বিশ্ব-সাহিত্য কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্যেটে। ১৮২৭ সনের ২৭শে জানুয়ারি গ্যেটে একারমানকে বলেন যে, জাতীয় সাহিত্যের মূল্য ক্রমশ কমে আসছে, এখন শুরু হয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যের (weltliteratur) যুগ। কিন্তু প্রায় একশ চল্লিশ বছর পরেও তাঁর আদর্শানুযায়ী বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ আসেনি। অবশ্য এখন আমরা বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বেশী আগ্রহান্বিত, এবং বিশ্ব-সাহিত্য কথাটির প্রচলনও খুব বেড়েছে।

তবু বিশ্ব-সাহিত্যের সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। বিশ্ব-সাহিত্য বললেই আমাদের মনে পড়ে এমন এক সাহিত্যের কথা যা বিশেষ দেশ বা জাতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, এবং যার আবেদন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অনুভূত হবার মতো গুণসম্পন্ন। এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতটাই বিশ্ব-সাহিত্যের সবাপেক্ষা বড লক্ষণ।

সাধারণ অর্থে বিশ্ব-সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের সমষ্টিকে। এখানে গুণবিচারেব প্রশ্নটা গৌণ। বিশ্ব-সাহিত্যের এটাই সবচেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা। কিন্তু এই ব্যাপক সংজ্ঞা বিশ্ব-সাহিত্যের মূল আদর্শের সহায়ক নয়। যে-সব বই ভাষা ও দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে পৃথিবীর সাহিত্যরসিকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে, পৃথিবীর সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে যেসব বই বিভিন্ন দেশেব মধ্যে ভাববিনিময়ে সহায়তা করে তাদের নিয়েই বিশ্ব-সাহিত্য। সুতরাং বিশ্ব-সাহিত্যকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করলে বিশেষ গুণবিশিষ্ট নির্বাচিত পুস্তকসমষ্টি বুঝায়। যেমন আমরা বলি, শকুন্তলা, ফাউস্ট, হ্যামলেট ইত্যাদি বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কালিদাস, গ্যেটে ও সেক্সপীয়রের সব বই বিশ্ব-সাহিত্যের গৌরব দাবি করতে পারে না। বিচারের দ্বারা গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়।

বিচার করতে বসে প্রথমেই দেখতে হবে বিদেশে বইটি কি পরিমাণ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে; পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কি-না। শুধু অনুবাদ হলে চলবে না। যে ভাষায় অনুবাদ হল সে ভাষার পাঠকদের মধ্যে বইটি সমাদর লাভ করেছে কি-না তাও দেখতে হবে। প্রশ্ন উঠবে,

এমন তো অনেক বই আছে যার অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। যেমন মেরী করেলির বই একদা দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং শুধু জনপ্রিয়তা ও অনুবাদের প্রমাণ দেখিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায় না। আর-একটি অত্যাবশ্যক গুণের প্রয়োজন। সেটি হল কালজয়ী হবার ক্ষমতা। সময়ের বিচারে অনেক জনপ্রিয় বইও বাতিল হয়ে যায়। বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে স্থান পেতে হলে দেশ, ভাষা ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করা চাই। সকল দেশে, সকল যুগে যে বই পাঠকদের নিকট সমাদর লাভ করে, বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থানলাভের যোগ্যতা সে বই নিশ্চয়ই অর্জন করেছে।

জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি চয়ন করে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করা হয়। বিশ্ব-সাহিত্যের এই ব্যাখ্যা পাঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাজনক। কিন্তু সমালোচক এবং সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা জাতীয় সাহিত্যের ধারা থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক দেশের সাহিত্যই কতকগুলি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সকল সাহিত্যেই রোমাণ্টিসিজম-এর প্রভাব কখনো-না-কখনো আসে। শুধু সময়ের ব্যবধান ঘটতে পারে। তা ছাড়া, প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেরই অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রচনা-কৌশল, বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি সকল সাহিত্যেই তো প্রায় একরকম। দেশের সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো গ্রন্থের বিচার যথার্থরূপে হতে পারে না। সকল সাহিত্যই যখন একই বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে তখন তাদের ক্রমবিকাশের আলোচনাটা একসঙ্গে হওয়া উচিত। এই আলোচনা অবশ্যই তুলনামূলক হবে। কোনো বিশেষ বই বা লেখককে প্রাধান্য না দিয়ে বিবর্তনের ধারাটা হবে মূল আলোচ্য বিষয়। এ ধরনের আলোচনা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচকরা এরূপ আলোচনার পক্ষপাতী। বিদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কম্পারেটিভ লিটারেচার বা তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার বিভাগ খুলেছেন। এই তুলনামূলক আলোচনায় বিশ্ব-সাহিত্যকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় সাহিত্যকে উপেক্ষা করে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে

না। বরং জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেই বিশ্ব-সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। গ্যেটে বিদেশী পণ্যের বাজারের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনা করেছেন। প্রত্যেক দেশ তার সর্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য বিদেশের বাজারে প্রেরণ করে। দেশের সম্মান এবং বাণিজ্য-প্রসারের জন্য পণ্যদ্রব্যের উৎকর্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় পণ্যদ্রব্য নিকৃষ্ট প্রমাণিত হলে ক্রেতা পাওয়া যাবে না। তেমনি একমাত্র ক্রমাগত সাধনার ফলে রচিত জাতীয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে মর্যাদা লাভের দাবি করতে পারে।

বাজারের সঙ্গে তুলনাটা আরও এগিয়ে নেওয়া যায়। বিশ্ব-সাহিত্য ভাববিনিময়ের আন্তর্জাতিক বাজার, পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদের উপর বিশ্ব-সাহিত্য মিলনের সেতু রচনা করে। বিশ্ব-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে বাহ্যিক কতকগুলি পার্থক্যের অন্তরালে মানুষের মনের কাঠামো সর্বত্রই এক। বিশ্ব-সাহিত্য এই মূলগত ঐক্য প্রকাশ করে বৃহৎ মানবসমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে পুঁথিপত্রের ও ভাববিনিময়ের যে সুযোগ এসেছে তা পূর্বে কখনো ছিল না। দেশ ভ্রমণের নতুন সুবিধার সূচনা দেখেই গ্যেটে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভৌগোলিক ব্যবধানটা যখন দূর হতে বসেছে, তখন জাতিতে জাতিতে মনের ব্যবধান দূর হবারও ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। তাই শুধু জাতীয় সাহিত্য নিয়ে থাকলে হবে না, ভাবতে হবে বিশ্ব-সাহিত্যের কথা।

তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেল। যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই মন্তব্য স্পষ্ট হবে। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি যে দেশে যে ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক তা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ভূগোলের সীমা মানে না। অ্যাটমের তত্ত্ব য়ুরোপ, এশিয়া, আমেরিকা সর্বত্রই এক। এক বৈজ্ঞানিক তাঁর সাধনা যেখানে শেষ করেন, অন্য

একজন সেখান থেকেই কাজ শুরু করেন। এমনি করে আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। বৈজ্ঞানিকের জাতি ও ভাষার গণ্ডি নেই; বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তাঁর পরিচয়। অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনেকটা একথা খাটে। অর্থনীতির কোনো তত্ত্ব পৃথিবীর যে দেশের পণ্ডিতই প্রথম আলোচনা করুন না কেন, তার বিশেষ মূল্য থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রকেও তা পড়তে হবে। কিন্তু সাহিত্যের বেলায় তা হবে না। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্যের ছাত্র তার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। বাংলা-বিভাগের ছাত্র হলে শুধু বাংলা পড়বে। অন্য সাহিত্যের খবর না রাখলেও কিছু যায় আসে না। এই সংকীর্ণতার জন্য বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্য কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

সংকীর্ণতার কারণটা সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রথমত, একটি বিশেষ ভাষাকে আশ্রয় করে যে-আঙ্গিকের মাধ্যমে লেখক তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন, অন্য দেশের পাঠকের জন্য তা রূপান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু ভাষান্তর করা কঠিন নয়; বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির বেলাতেও তা করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের দেহ বা আঙ্গিককে নবরূপ দেওয়া সহজ নয়। বিজ্ঞানে তত্ত্বই একমাত্র, সাহিত্যে তত্ত্বটা গৌণ, প্রকাশের রীতিটাই মুখ্য। তাই ভাষান্তরের দ্বারা বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু পেখমহীন ময়ূরের মত ভাষান্তরিত সাহিত্যগ্রন্থ শ্রীহীন হয়ে পড়বার আশঙ্কা। একমাত্র প্রতিভাবান অনুবাদক মূল লেখকের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। তেমন অনুবাদকের সংখ্যা খুবই কম।

দ্বিতীয় কারণ পাওয়া যাবে সাহিত্যের বিশেষ কোনো সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতার মধ্যে। সাহিত্যে সার্বজনীন আবেদনের উপকরণ থাকলেও লেখকের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা তা কিছুটা আচ্ছন্ন থাকে। বিদেশের পাঠক-সাধারণের পক্ষে তাই পূর্ণ রসোপলব্ধিতে বাধা জন্মে।

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের এই অসুবিধা সত্ত্বেও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, একমাত্র সাহিত্যই সকল বিভেদ দূর করে এক বৃহৎ মানব-সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভৌগোলিক ব্যবধান দূর করবে, কিন্তু মনের সেতু রচনা করবে সাহিত্য।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলি বহুল প্রচারিত হলে দেখা যাবে, সকল দেশের মানুষের জীবনই প্রায় অনুরূপ সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত। বিশ্ব-সাহিত্য এই সত্যকে সর্বসাধারণের উপলব্ধির মধ্যে এনে দিলে নতুন যুগের সূচনা হবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব-সাহিত্য প্রচারের একমাত্র উপায় ভাল অনুবাদ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য সফল করতে বিশ্ব-সাহিত্য যে সহায়তা করতে পারে, একথা উপলব্ধি করে ইউনেস্কো এখন সাহিত্যগ্রন্থ অনুবাদ করবার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অনুবাদের মান উন্নয়নের জন্য অনুবাদকের মর্যাদা এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধির প্রয়োজন। সব অনুবাদ যে প্রথম শ্রেণীর হবে এমন আশা করা যায় না। তবু যে-কোনো অনুবাদ থেকেই কিছু-না-কিছু উপকার পাওয়া যাবে। গ্যেটে অনুবাদের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন: (১) মূল গ্রন্থের আঙ্গিক অনুবাদে আনবার চেষ্টা না করে সরল গদ্যে ভাষান্তরিত করা, (২) অনুবাদক সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করে নিজের ভাষায় নিজের রীতি অনুসারে বইটিকে ভাষান্তরিত করবেন, (৩) সর্বাপেক্ষা সফল অনুবাদে মূল গ্রন্থের আঙ্গিক ও ভাবসম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রথম দুই শ্রেণীর অনুবাদে অভ্যস্ত হবার পর আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য অনুবাদে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করা উচিত। সরল গদ্যে ভাবানুবাদ করা খুব কঠিন কাজ নয়; অথচ বিশ্ব-সাহিত্য প্রচারে এ ধরনের অনুবাদেরও মূল্য আছে।

অনুবাদের দায়িত্ব যখন প্রকাশকের উপর থাকে তখন সে লাভের দিকটাই বড় করে দেখবে। যে বই বাজারে কাটতি হবার সম্ভাবনা আছে, প্রকাশক সে বই-ই নির্বাচন করবে। যে বই অনুবাদ হল, তা বিশ্ব-সাহিত্যের গুণসম্পন্ন কি-না, তা দেখবার দায়িত্ব প্রকাশকের নয়।

বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে পাঠকদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে না পারলে ভাল অনুবাদ হবে না, এবং অনুবাদ হলেও তার প্রচার হবার আশা কম। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য-পত্রিকায় বিশ্ব-সাহিত্যের আলোচনা, সভাসমিতির উদ্যোগে দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সংবাদ পরিবেশন প্রভৃতির দ্বারা এ আগ্রহ কিছুটা সৃষ্টি করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশে এ ধরনের উদ্যোগ কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে সাহিত্যের খণ্ডিত পাঠ শিক্ষা দেবার ফলে পরবর্তী জীবনে

বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শের প্রতি আকর্ষণটা পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে হয় না। সাহিত্যকে সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্তি দেবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কম্পারেটিভ লিটারেচারের বিভাগ খুলেছেন। ছাত্রদের বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত করে তোলাটা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য নয়, প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় সাহিত্যের বাইরে যে সমৃদ্ধ বিশ্ব-সাহিত্য আছে সে-বিষয়ে সচেতন করে দেওয়া। অধ্যাপকের লক্ষ্য থাকে দেশ-বিদেশের বড় বড় লেখক এবং তাঁদের বই সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে দেওয়া, পরীক্ষার ভীতি দিয়ে রসোপলব্ধিতে বাধা জন্মানো হয় না। বলা বাহুল্য, অনুবাদগ্রন্থের সাহায্যেই বিশ্ব-সাহিত্যের আলোচনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ ছাড়া অনেক কলেজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ বইগুলি সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেছে।

ভারতে এতগুলি সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে। নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ছাড়া এদের পরিচয় আমরা ক' জন জানি? অথচ আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য এদের পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। রেলপথের লৌহজাল এক প্রান্তের লোককে অন্য প্রান্তের লোকের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু এটা শুধুই দৈহিক সান্নিধ্য। এখনও মনের সঙ্গে মনের মিলন ঘটেনি। ঘটবে কি করে? জাতির হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার সাহিত্যে। আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির পরিচয় লাভ করবার সুযোগ নেই আমাদের। পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেবার জন্য কোনো কর্মতৎপরতাও এখন পর্যন্ত দেখা যায় না।

বিশ্ব-সাহিত্য আমাদের জানতে হবে বই কি! কিন্তু প্রাধান্য দিতে হবে ভারতীয় সাহিত্যের উপর। জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এর প্রয়োজন। আর প্রয়োজন সাহিত্য-পাঠকে সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দেবার। কালিদাসের শকুন্তলার গল্পাংশটুকু না জেনেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে বাংলাসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হতে বাধা নেই। সে যদি প্রেমচাঁদ, ভাল্লাথোল, ভারতী ও ইকবালের নাম শুনে না থাকে, তাহলেও তার পরীক্ষার ফল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও সাহিত্যের অধ্যাপনা এমনি গণ্ডিবদ্ধ।

ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সাহিত্য-আলোচনার ব্যবস্থা করা জাতীয় স্বার্থ ও সাহিত্যের মুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা হবে,—সবগুলি সাহিত্যে ছাত্রদের পণ্ডিত করে তোলবার দুরাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। অধ্যাপকের সবচেয়ে বড় গুণ হবে রসগ্রাহিতা। পাঠ্য বই না-ও থাকতে পারে। ভাষার প্রাচীর পার হয়ে মূল গ্রন্থ পড়ানোর চেষ্টাও করা হবে না। একটি বিশেষ সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ও তাঁদের রচনার পরিচয় হৃদয়-গ্রাহী করে ছাত্রদের নিকট বলতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রথম পর্যায় এতেই সফল হতে পারে।

কিন্তু চৌদ্দ-পনেরোটি সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা করা এখন হয়ত সম্ভব নয়। তাছাড়া ছাত্রদের পক্ষে তা আয়ত্ত করাও কঠিন। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্যের পরিচিতি লাভ করা কঠিন নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দী, অসমীয়া ও ওড়িয়া সাহিত্য-পাঠের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিবেশী সাহিত্যগুলি পড়াবার বন্দোবস্ত করা যায়। ক্রমশ সবগুলি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যাপনার ব্যবস্থাও করতে হবে।

ভারতীয় সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের একটি বিভাগ মাত্র। ভারতীয় সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী এবং জরুরি বলে আমাদের আঞ্চলিক সাহিত্য-গুলির আলোচনার উপর জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষ্য বিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব-সাহিত্যের আলোচনা এখনও হতে পারে।

সাহিত্য-পাঠনা

আজকাল বই ও পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু তার ফলে সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রই অন্য বিষয়ের পাঠ নিতে উৎসুক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় পড়বার জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখন বিশেষজ্ঞের যুগ , সুতরাং বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য এই আগ্রহ স্বাভাবিক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সাহিত্য সকলের জন্য। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য-চর্চা নিবদ্ধ নয়। তাই সাহিত্যের শেষ পাঠ গ্রহণ করেও বিশেষজ্ঞের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করা যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান এই অবজ্ঞার ফলে সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার সমীক্ষা আবশ্যক। সমাজের সকল স্তরে চরিত্রের যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে তার জন্য সাহিত্য-বিমুখতা হয়ত অনেকটা দায়ী। বিশেষ করে ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগ, সাহিত্যপাঠের উপর জোর দিলে তা কিছু হ্রাস পেত বলে মনে হয়। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমের এমন সুনির্দিষ্ট বিষয়-বিভাগ ছিল না। বিজ্ঞানের ছাত্রও সাহিত্য পড়ত। চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই মিশ্র পাঠক্রম বিশেষ উপযোগী। শুধু দেশের সমাজের মধ্যেই সাহিত্য-পাঠের উপকারিতা নিবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের বৈঠক যতই হোক না কেন তাতে জাতির সঙ্গে জাতির অন্তরের মিল হয় না। সেই মিলনের জন্য সাহিত্যের সেতু চাই। জাতির চিন্তাভাবনা ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহৎ সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত থাকে। কোনো দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে অধিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরিচয় সন্দেহ ও সংঘাতের মূল কারণ। এই অপরিচয় দূর করে সাহিত্য আন্তর্জাতিক

মিলনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ঠিক এই কারণেই য়ুরোপ আমেরিকায় বিশ্ব-সাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রসার ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশের গণ্ডিতে ফিরে আসা যাক। জন মর্লি বলেছেন: "Literature is one of the instruments, and one of the most powerful instruments, for forming character, for giving us men and women armed with reason, braced by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by that public spirit and public virtue of which it has been well said that they are the brightest ornaments of the mind of man."

তিনি আরও বলেছেন: "Poets, dramatists, humorists, satirists, masters of fiction . . . teach us to know man and to know human nature. This is what makes literature . . . a proper instrument for a systematic training of the imagination and sympathies, and a genial and varied moral sensibility."

মহৎ সাহিত্যের মধ্যে জীবনের রূপ যেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও শিক্ষা যেরূপ গভীরতা লাভ করে, প্রত্যক্ষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। কারণ, আমাদের যে জীবন নানা তুচ্ছতা ও অপ্রয়োজনীয়তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে যায়, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, শক্তিশালী লেখক তাঁর কলাকৌশলের দ্বারা তারই উপর আলোকপাত করেন। যা আগে দেখিনি তা চোখে পড়ে। নানা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত মন বইয়ের মধ্যে সংহত হয়, সুতরাং জীবনানুভূতি গভীর হতে পারে।

মহৎ সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবন সম্বন্ধে বহু মানুষের বহু যুগের অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। এই শিল্পমণ্ডিত অভিজ্ঞতা পথ নির্বাচন করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ব্যক্তি তার অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার গণ্ডি অতিক্রম করে সাহিত্যে জীবন-সমুদ্রের স্বাদ পায়। ভবিষ্যতের অপরিচিত পথে চলবার ইঙ্গিতও সংগ্রহ করা যেতে পারে সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে। জীবনের পথে যারা নতুন যাত্রা শুরু করেছে সেই তরুণ-তরুণীদের পথ-চলার সমস্যা শুষ্ক উপদেশ দিয়ে যতটা সমাধান করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পারা যায় সাহিত্যে বিধৃত যুগযুগান্তের শিল্পমণ্ডিত

অভিজ্ঞতা থেকে। আর সবচেয়ে বড় লাভ হল, সাহিত্য পড়ে তারা নিজেরাই নিজেদের পথ নির্বাচন করে নেয়, হৃদয়ানুভূতির গতি নিয়ন্ত্রণ করে, উপদেশের মত উপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় না। এইজন্যই চরিত্রগঠনের একটি প্রধান উপায় সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যের পঠন-পাঠন উপেক্ষা করবার অর্থ শুধু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয়, মানবজাতির চিরাগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সুযোগ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা।

আধুনিক সভ্য সমাজে অনেক কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বের সমাজেও যা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এখন তা পরিতৃপ্ত করবার উপায় নেই। এই অবদমিত কামনার তাড়নায় ব্যক্তির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় কিংবা তার মানসিকতা খর্ব হয়। ফ্রয়েড বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে বিকল্প পরিতৃপ্তির উপায় সাহিত্যপাঠ। বিশেষ করে উপন্যাসের মধ্যে পাঠক তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পাত্র-পাত্রীদের জীবনে পূর্ণ হয়েছে দেখতে পায়। অথবা, নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কাহিনীর মধ্যে দেখতে পেয়ে উপলব্ধি করে জীবন শুধু তাকেই বঞ্চনা করেনি। এমন বঞ্চনা সংসারের সর্বত্রই আছে। সুতরাং অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিক্ষোভ উপন্যাস পাঠ করে খানিকটা শান্ত হয়। এই বিক্ষোভ শান্ত হবার পথ না থাকলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হবার আশঙ্কা থাকে। উপন্যাসের প্রাচুর্য একালের কৃত্রিম জীবনের অভিশাপ কিছু পরিমাণে লঘু করতে পেরেছে। উপন্যাসের জগতে আমাদের কামনা-বাসনাকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়ে আমরা খানিকটা স্বস্তি লাভ করি।

তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত নাগরিকের চরিত্রগঠন ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাহিত্যপাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে সাহিত্য-পাঠনার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে বই পড়ার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রতি ছেলেবেলায় আকৃষ্ট না হলে পরবর্তী জীবনে বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে উপযুক্ত বই ও উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন।

বেশী দরকারী উপযুক্ত বই। বই ভাল না হলে যোগ্য শিক্ষকও কিছু করতে পারেন না। আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোনো নির্দিষ্ট মান নেই। ক্লাস থ্রি-র বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হবে সে সম্বন্ধে কোনো পদ্ধতি স্থির হয়নি। তাই একই শ্রেণীর জন্য লিখিত বইয়ের মান বিভিন্ন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে সমীক্ষা করে দেখা হয় কোন্ বয়সের ছেলেমেয়ে কোন্ কোন্ শব্দ সর্বদা কথাবার্তায় ব্যবহার করে। সেই শব্দের তালিকা সামনে রেখে সেসব দেশের লেখকরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। আমাদের দেশে তেমন সমীক্ষা হয় না, লেখকরা নিজেদের খুশিমতো শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেন। এসব বই সাধারণত যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের বোধশক্তির তুলনায় উচ্চমানের হয়। তাই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে বিরূপতার সৃষ্টি হয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেই এ কথা সত্য নয়, ছেলেদের জন্য লেখা অধিকাংশ গল্পের বইয়েও পাঠকের বয়স ও শক্তি অনুসারে ভাষা এবং ভাবের ব্যবহার করা হয় না। আর সবচেয়ে বড ত্রুটি হল এই যে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য ও সদুপদেশ শিক্ষা দেবার ঝোঁক বেশী, সাহিত্যরস পরিবেশনের আয়োজন কম। বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকগুলি বিচার করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বিদ্যালয়ে কয়েকটি পুস্তক পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয় কেন? পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি মুখস্থ করলেই কি ভাষা শেখা কিংবা সাহিত্যের রস উপলব্ধি করা যায়? তাহলে সাহিত্যপাঠ তো খুব সহজ হত। পাঠ্য হিসাবে কয়েকটি বই নির্দিষ্ট করবার উদ্দেশ্য হল শিক্ষক সে-সব বই পড়িয়ে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাইরে পরবর্তী জীবনে স্বাধীনভাবে সাহিত্যপাঠের পদ্ধতি নির্দেশ করবেন। পাঠ্যপুস্তক পড়ানো অনেকটা গণিতের 'ওয়ার্কড আউট এগ্‌জাম্পল'-এর মতো। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে বই কি করে পড়তে হয় তার দৃষ্টান্ত পেলে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যপাঠ সার্থক হয়, স্বাধীনভাবে বই পড়ে পরিপূর্ণরূপে সাহিত্যের রস আস্বাদন করা সহজ হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক পড়বার এবং পড়াবার এই মূল উদ্দেশ্য আমরা সকলেই ভুলে গেছি। এখন সাহিত্যপাঠ পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র। পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রেও সাহিত্য প্রধান নয়। পাঠক্রমে বাংলার স্থান অপ্রধান। উচ্চমানের পাঠক্রমে বাংলা অপেক্ষা ইংরেজীর প্রাধান্য বেশী। সাহিত্যের জন্য যেটুকু সময় দেওয়া সম্ভব তার অধিকাংশ বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য পাঠের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। কি বাংলা কি ইংরেজী—কোনো সাহিত্যই সুষ্ঠুরূপে পড়ানো হতে পারে না।

পূর্বেই বলেছি, উপযুক্ত মানের পুস্তক নির্বাচন করা না হলে শিক্ষার্থীর মন

বইয়ের প্রতি কখনো আকৃষ্ট হবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন জাতের বই প্রয়োজন। বারো চৌদ্দ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইয়ে জীবনের আনন্দের দিকটাই প্রাধান্য লাভ করবে। বেদনা এবং আবেগময়তা এ জাতীয় পুস্তকের উপযোগী নয়। ভাষা অবশ্যই সহজ হবে। এই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কবিতা হবে সংগীতধর্মী। নাটক এদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ পড়ে উপভোগ করবার জন্য যে কল্পনার বিস্তার আবশ্যক, এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তা থাকে না।

উচ্চতর শ্রেণীতে প্রধানত তিন প্রকারের সাহিত্যগ্রন্থ পড়ানো হয়ে থাকে —কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-সাহিত্য তথ্যমূলক ; শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ যে শুধু পড়ে তাই নয়, প্রবন্ধ লেখা তাদের অভ্যাসও করতে হয়। প্রবন্ধের পাঠনা এইজন্য সহজ। কাব্য ও উপন্যাস পড়াবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার্থীর জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নেই ; আর কল্পনাশক্তির এমন প্রাখর্য নেই যাতে পরিবেশ ও অনুভূতি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর কল্পনা উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে প্রসারিত করতে হবে। কাব্য-পাঠনায় আঙ্গিকের শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও কাব্যের গঠনরীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা কমই আছে। কাব্য উপভোগের পক্ষে আঙ্গিক সম্বন্ধে অজ্ঞতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

চরিত্রগঠনের জন্য ভাল উপন্যাসের পাঠনা ফলপ্রদ হতে পারে। কিন্তু আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় উপন্যাসের স্থান নগণ্য। উপন্যাস সম্বন্ধে হ্যাজলিট যা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য : "It makes familiar with the world of men and women, records their actions, assigns their motives, exhibits their whims, characterizes their pursuits in all their singular and endless variety, ridicules their absurdities, exposes their inconsistencies .. shows us what we are, and what we are not ; plays the whole game of human life over before us, and by making us enlightened spectators of its many-coloured scenes. enables us (if possible) to become tolerably reasonable agents in which we have to perform a part."

শিল্পকলার দিক থেকে উপন্যাসের স্থান হয়ত কাব্যের নীচে কিন্তু জীবনে উপন্যাসের প্রভাব বেশী। ভার্নন লী এই কথাটি সুন্দর করে বলেছেন: "The novel has less value in art, but more importance in life. Emotional and scientific art...trains us to feel and comprehend—that is to say, to live...The novelists have, by playing upon our emotions, immensely increased the sensitiveness, the richness, of this living keyboard."

পাঠনার উপরে নির্ভর করে সাহিত্য জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করবে। আমাদের দেশে শিক্ষক প্রায়ই ক্লাসে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন; শিক্ষার্থীর জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করে দেবার চেষ্টা করা হয় না। আর সাহিত্য-পাঠনার সবচেয়ে বড় অন্তরায় রস ও সৌন্দর্য অপেক্ষা তত্ত্বকে বড় করে দেখবার মনোবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত যে-সব সমালোচনা-গ্রন্থ আছে তাদের বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে রসোপলব্ধির চেয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি বড়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট গুরুদেব, ঋষি অথবা দার্শনিক; সৌন্দর্যসাধক হিসাবে সহজভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা বোধ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠনার ফলে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পায়।

পাঠক্রমে সাহিত্য যথার্থ মর্যাদা লাভ করলে এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে পড়াবার ব্যবস্থা থাকলে জাতীয় চরিত্রগঠনের পক্ষে তা অনুকূল হবে।

ক্লাসিক্‌স্‌-এর ক্রান্তিকাল

প্রতি বৎসর নতুন নতুন বইয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিক্রিও হয় প্রচুর। য়ুরোপ আমেরিকায় জনপ্রিয় বইয়ের পাঁচ দশ লাখ কপি বিক্রি প্রায় সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো বাংলা বইয়েরও আজকাল এত বেশী কপি বিক্রি হয় যা বিশ-পঁচিশ বছর আগে কল্পনাতীত ছিল। তবু লেখক ও পাঠকের মনে তৃপ্তি নেই। এমন বই কোথায়, যা গভীরভাবে পাঠকের মন অভিভূত করতে পারে? এখন যে-সব বইয়ের চাহিদা খুব ' বেশী তাদের পড়তে ভাল লাগে, খারাপ বলে উপেক্ষা করা যায় না; তবু আমরা অন্য এক জাতের বইয়ের জন্য উৎসুক হয়ে থাকি। এই জাতের সাহিত্যের নাম ক্লাসিক্‌স্‌।

সাহিত্যগ্রন্থ মোটামুটি দুই শ্রেণীর—books of entertainment and books of existence দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকে আনন্দের অতিরিক্ত কিছু থাকে, এবং তার জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে। মহাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে-সব বই শত শত বৎসর যাবৎ পাঠকের মনোরঞ্জন করে আসছে তারাই ক্লাসিক্‌স্‌। ক্লাসিক্‌স্‌ হল 'বুক্‌স্‌ অব এক্সিস্‌টেন্স'। আমাদের রাষ্ট্র, ধর্ম, রুচি ও ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। এসব পরিবর্তন উপেক্ষা করে ক্লাসিক্‌স্‌ পাঠকের মনে চিরকালই আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম। হোমার, কালিদাস ও সেক্সপীয়র সমসাময়িক পাঠকদের আনন্দ দিয়েছেন; এখনো সেই আনন্দের উৎস অনেকের নিকট অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, ভৌগোলিক ব্যবধান—এসব কিছুই সেই উৎসকে রুদ্ধ করেনি। বরং আজকাল অনুবাদের সহায়তায় ভাষার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এক দেশের ক্লাসিক্‌স্‌ সকল দেশে প্রচার লাভ করছে। কত সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেছে, কত নগর ও সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু স্বল্পায়ু মানুষের রচিত কতকগুলি বই ধ্বংসের হাত অতিক্রম করে কালজয়ী হতে পেরেছে।

বাহ্যিক পরিবর্তনের অন্তরালে যে চিরন্তন জীবনধারা বয়ে চলেছে সেই জীবনের মর্মকথা বলতে পারার মধ্যেই রয়েছে ক্লাসিক্‌স্‌-এর বেঁচে থাকার রহস্য। জীবনের কোনো সাময়িক বিক্ষোভ, আনন্দ ও বেদনার উপর ভিত্তি করে যে-বই

লেখা হয় তা কিছুদিনের জন্য বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। কিন্তু ক্লাসিক্স্-এর মর্যাদা পেতে হলে মানবমনের চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অনুভূতিকে রূপ দেওয়া চাই। রূপকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এই অনুভূতিকে শিল্প-রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখককে অবশ্যই তাঁর কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে এক বিশেষ কালের সমাজকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু রচনার শাশ্বত প্রাণধারা দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে নদীর মত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যুগ হতে যুগান্তরে বয়ে চলে।

এই মৌলিক অর্থে বিচার করলে বিশ্ব-সাহিত্যে ক্লাসিক্স্-এর সংখ্যা বেশী নয়। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল বা কালিদাসের মত ক'জন লেখক আছেন যাঁদের কালের কষ্টিপাথরে বিচারের সুযোগ পাওয়া গেছে? মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে ধর্মবহির্ভূত বিষয় নিয়ে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে। এই নতুন যুগের নেতা সেক্সপীয়র, অর্থাৎ ছাপার আমলের প্রথম খ্যাতনামা লেখক সেক্সপীয়র। বাল্মীকি যে অর্থে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই অর্থে সেক্সপীয়রকে পরীক্ষা করবার সুযোগ এখনো আসেনি। তবু সেক্সপীয়রের অনেকগুলি নাটকই আমরা ক্লাসিক্স্ শ্রেণীভুক্ত করতে দ্বিধা করব না। মৌলিক অর্থে না হলেও একটু ঢিলে অর্থে গত দুই শতাব্দীর অনেক রচনাকে আমরা ক্লাসিক্স্ বলে স্বীকার করেছি। বৃহত্তর অর্থে যেসব গ্রন্থকে ক্লাসিক্স্ বলি তাদের মধ্যে আমরা কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখতে পাই। এসব বই পড়বার পরও তাদের প্রভাব মন থেকে দূর হয় না। পাঠকের মন গভীরভাবে অভিভূত করবার ক্ষমতা ক্লাসিক্স্-এর একটি প্রধান গুণ। কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে পাঠকের একাত্মবোধ জন্মে, তাদের সুখদুঃখের ঢেউ পাঠকের চিত্ত আলোড়িত করে। সে আলোড়ন ক্ষণিক নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কয়েকটি পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের কোনো একটা দিক সম্বন্ধে গভীর ইঙ্গিত দেন। লেখকের জীবনদর্শনের গভীরতার উপরে ক্লাসিক্স্-এর মূল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই বৃহত্তর অর্থে ডিকেন্স, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, রোলাঁ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকদের অনেক গ্রন্থই ক্লাসিক্স্ পর্যায়ভুক্ত।

একজন সমালোচক বলেছেন যে ক্লাসিক্স্ হল তেমন সব বই "which please all and please always."—জাতি, ধর্ম, দেশ, ভাষা, বয়স, শিক্ষা

ইত্যাদির পার্থক্য সত্বেও সব পাঠকই ক্লাসিক্‌স্‌-এর রস উপভোগ করবে এই হচ্ছে তাঁর দাবি। কিন্তু এত বড় দাবি যুক্তিসম্মত নয়। অনেকের ভাল লাগতে পারে, সকলের একটি বই ভাল লাগবে তা হতে পারে না। অন্তত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক্‌স্‌ সম্বন্ধে একথা জোর করেই বলা চলে। আমরা সাহিত্যের ক্লাসিক্‌স্‌ নিয়েই আলোচনা করছি। অন্যান্য বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থকেও ক্লাসিক্‌স্‌ বলা হয়। কিন্তু ক্লাসিক্‌স্‌-এর মৌলিক অর্থের মধ্যে তারা পড়ে না।

এলিয়ট বলেছেন ঃ "A classic can only occur when a civilisation is mature ; when a language and a literature are mature , and it must be the work of a mature mind." এই মন্তব্য অনুসারে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিংশ শতাব্দীই ক্লাসিক্‌স্‌ রচনার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। কেননা, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি যে সময়ে রচিত হয়েছে তার তুলনায় বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা পূর্ণতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু আসলে ক্লাসিক্‌স্‌ রচনার যুগ এটা নয়। বর্তমান শতকে ক্লাসিক্‌স্‌ রচনার উপযুক্ত মানসিক ও সামাজিক প্রেরণা অনুপস্থিত। সমসাময়িক সাহিত্যে ক্লাসিক্‌স্‌-এর লক্ষণাক্রান্ত রচনার অভাব এবং অদূর ভবিষ্যতেও ক্লাসিক্‌স্‌ সৃষ্টির সম্ভাবনাহীনতা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই আমাদের প্ররোচিত করে যে, ক্লাসিক্‌স্‌-এর মৃত্যু হয়েছে।

ক্লাসিক্‌স্‌-এর যে-সকল গুণের কথা আমরা বলেছি তা লেখকের অব্‌জেক্‌টিভিটির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। লেখক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কাহিনীর পশ্চাতে গোপন না রাখলে বহু দিন ধরে বহু লোকের রচনাটি ভাল লাগতে পারে না। লেখকের নিজের মনের চড়া রঙ মেখে কাহিনী যদি বেশী রঙিন হয়ে ওঠে, তাহলে পাঠকের পক্ষে তা সহজে গ্রহণ করতে বাধে। লেখকের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পাঠকের ব্যক্তিসত্তার সংঘর্ষ দেখা দেয়। প্রাচীন ও আধুনিক কালের সাহিত্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এখানে। প্রাচীন সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিসত্তা প্রাধান্য লাভ করে পাঠকের বা শ্রোতার ব্যক্তিগত রুচি ও চিন্তাকে কখনো আঘাত দিত না। কিন্তু এখন আত্মকেন্দ্রিক লেখক তাঁর রচনার মধ্যে নিজেকে এত বেশী স্পষ্ট করে তোলেন যে চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে

সমধর্মী পাঠকরাই শুধু লেখার পূর্ণ রসোপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রথমেই রচনার আবেদনের গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে ক্লাসিক্স্‌-এর মর্যাদা লাভ করতে বাধা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে আমরা ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে উঠছি। শিল্পী ও লেখকের মধ্যে অনুভূতির প্রখরতার জন্য আত্মসচেতনতার মাত্রাটা বেশি। ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের প্রেরণায় গীতি-কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। লিরিক কবিতা এ-যুগেরই বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আদর্শের মহাকাব্য এ-যুগে রচিত হওয়া সম্ভব নয়। সেই নৈর্ব্যক্তিকতা এবং বৃহৎ পটভূমিকা বর্তমান কালে আশা করা যায় না। প্রাচীন ক্লাসিক্স্‌গুলি সবই মহাকাব্য। মহাকাব্যের যুগ শেষ হওয়ায় নাটক ও উপন্যাসের মধ্যেই ক্লাসিক্স্‌-এব সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হয়েছে।

প্রাচীন ক্লাসিক্স্‌গুলি যতদিন মুদ্রিত পুস্তকের নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে বাঁধা পড়েনি ততদিন পর্যন্ত এদের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি মহাকাব্যের উপরে অনেক কবির প্রভাব পড়েছে। বাল্মীকির পূর্বেও রামায়ণের কাহিনী ছিল। বাল্মীকি তাঁর প্রতিভার স্পর্শে প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। বাল্মীকির পরবর্তী কবিরাও তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধন করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় কবিরা রামায়ণ অনুবাদ করতে গিয়ে পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছেন।

রামায়ণের প্রথম পাণ্ডুলিপি কেমন ছিল তা আমাদের জানবার উপায় নেই। শত শত বৎসর ধরে সেই মূল সংস্করণের যুগোপযোগী পরিবর্তন করায় রামায়ণ কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছে। ভারতের উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে রামায়ণের বিভিন্ন রূপ। আঞ্চলিক রুচি ও ধর্ম অনুসারে রাম কোথাও বৈষ্ণব, কোথাও শক্তির পূজারী। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, সীতা ছিলেন রামের বোন। যে দশরথ-জাতক রামায়ণের ভিত্তি, সেখানেও তা-ই আছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ভাই-বোনের বিয়ে হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। ক্লিওপেট্রা নিজের ছোট ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। শক রাজবংশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের ফলে এটা যখন রুচিবিগর্হিত মনে হল, তখন সীতার জন্মের ইতিহাস বদলে দিয়ে রামায়ণের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। সীতার তাই মা নেই, বাবা নেই; লাঙ্গলের মুখে মাটি থেকে উঠে

এসেছেন। এরূপ পরিবর্তন ও সংশোধনের অধিকার না থাকলে ক্লাসিক্‌স্ কালজয়ী হতে পারত কি-না সন্দেহ। অবশ্য সংশোধনের দ্বারা ক্লাসিক্‌স্-এর মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরিবর্তনটা প্রধানত বাহ্যিক। বাড়ির রং বদলের মতো। তথাপি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের রুচি অনুযায়ী সংশোধনের প্রথাটা ক্লাসিক্‌স্-এর পরমায়ু দীর্ঘ করতে সহায়তা করেছে।

মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এই পরিবর্তনের সুযোগ নেই। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ আছে। একই সঙ্গে হাজার হাজার পাঠকের কাছে সেই রূপটি পৌঁছে যায়। তাই সহজে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আছে কপিরাইট-এর বাধা। ছাপাখানার সঙ্গে এসেছে কপিরাইট। কপিরাইট যতদিন পর্যন্ত থাকে ততদিন লেখক ছাড়া অন্য কারো কোনো পরিবর্তনের অধিকার নেই। কপিরাইট-এর মেয়াদ পার হবার পরও সমালোচকরা কোনো পরিবর্তন বরদাস্ত করবে না। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে পুঁথির সংখ্যা ছিল কম। পাঠক অপেক্ষা শ্রোতার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশী। কোন সাহিত্যরসিক কোথায় কি পরিবর্তন করল শ্রোতাদের পক্ষে তার হিসাব রাখা কঠিন ছিল।

মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সব রচনাই অন্য লেখকদের হাতে পড়ে কমবেশি পরিবর্তিত হত। কোনো কবি হয়ত নিজের কবিপ্রতিভা প্রকাশের লোভ সংবরণ করতে পারতেন না, আঞ্চলিক রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেও অদলবদল করা হত, পরিবর্তনের আর একটি বড় কারণ ছিল ধর্মবিশ্বাস। নিজের সম্প্রদায়ের দেব-দেবীকে প্রাধান্য দেওয়া হত। যিনি পরিবর্তন করেন, তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাহিনীতে শাক্ত, বৈষ্ণব বা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রাধান্য দেন। পরিবর্তনের অধিকার প্রাচীন সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একালের বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় রূপ লাভ করেছে। এর ফলে জনপ্রিয়তার মেয়াদের কালও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বহু ক্লাসিক্‌স্‌কে বর্তমানে আমরা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দিয়েছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জনপ্রিয়তা নেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে আলমারিতে তুলে রাখি, পড়ি না। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত শ্রীরামপুরের প্রেসে প্রথম ছাপা হবার পর থেকে ক্রমশঃ তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। একালের ছেলেমেয়েদের অনেকেই মূল বাল্মীকির রামায়ণ তো দূরের কথা, কৃত্তিবাসের রামায়ণও

পড়ে না। এই বিজ্ঞানের যুগে নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে আমাদের মানসিক ও সামাজিক জীবনে অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। সেই পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে একটি বিশেষ গ্রন্থ একজন লেখকের সৃষ্ট সীমিত মানসিক পরিবেশের ছাপ নিয়ে দীর্ঘকাল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এমন আশা করা যায় না।

সাহিত্য জীবনেরই প্রতিবিম্ব। জীবনে যদি পরিবর্তন আসে তাহলে সাহিত্যেও তার ছাপ পড়বে। পাঠক তার নিজের এবং সমকালীন জীবনের প্রতিফলন সাহিত্যে দেখতে চায়। বিগত যুগের সাহিত্যে এই প্রতিফলন নিশ্চয়ই বর্তমান যুগের মতো স্পষ্ট হতে পারে না। তাই সাধারণ পাঠক আধুনিক বইয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। পূর্বে জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং ভাবাদর্শ শত শত বৎসর যাবৎ অপরিবর্তিত থাকত। আমাদের দেশে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির পারিবারিক সম্পর্কের একই আদর্শ কত সহস্র বৎসর যাবৎ অপরিবর্তিত ছিল, যেমন ছিল আমাদের ঢেঁকি ও গোরুর গাড়ি। তাই শ্লথ পরিবর্তনের যুগে রচিত গ্রন্থ দীর্ঘকাল যাবৎ উপভোগ করা সম্ভব ছিল। তখন সামাজিক জীবন এবং চিন্তাদর্শ সহজে বদল হত না, সুতরাং বই সহজে পুরনো হবার আশঙ্কা ছিল না।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীবনের সকল বিভাগে খুব দ্রুত পরিবর্তন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তনের স্রোতে পড়ে খুব কম বই-ই দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কত ক্ষুদ্র সে সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করি আমরা। কিন্তু সেই ক্ষমতা মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর অধিকারগত। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের দাস। মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচা মাল যোগান দেওয়া, কিংবা মেশিন চালানো বা বন্ধ করা তার কাজ। সাধারণ মানুষকে ভেবে-চিন্তে কাজ করবার, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করবার সুযোগ বিজ্ঞান দেয়নি। সব চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব কয়েক জন বিজ্ঞানীর। তাঁরাও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দাস, জীবনের সমগ্র রূপকে উপলব্ধি করবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গী নেই। আগে চাষী যখন জমি চাষ করত তখন দেহের প্রতিটি মাংসপেশী পরিশ্রমে ও ফলসৃষ্টির আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠত। এখন কলের লাঙ্গল মাটি চাষ করে,

কলের সাহায্যে বীজ ছড়ানো হয়, কলের কাস্তে শস্য কাটে। কল বড় হয়ে উঠেছে, চাষীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা গৌণ হয়ে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনি ব্যক্তিগতভাবে শৌর্য, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা দেবার সুযোগ নেই। প্রকৃত যুদ্ধ হয় রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে, বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে। এমনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ নিজে ছোট হয়ে বিজ্ঞানের দানকে বড় করেছে।

মহাকাব্যে এবং ক্লাসিক্ উপন্যাসে বিরাট চরিত্রের প্রাধান্য। বিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রভাবে সেই বিরাটত্ব এবং পৃথক ব্যক্তিত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পূর্বে রাজনীতি রাজদরবারের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। এই গণতন্ত্রের যুগে দরিদ্রতম ব্যক্তিও রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। গণতন্ত্রের আদর্শ এই যে, সমাজের প্রত্যেকে সমান অধিকার লাভ করবে। সকল নাগরিক আত্মোন্নতির সমান সুযোগ পাবে। বিজ্ঞান ও রাজনীতির সমন্বয় মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ কিছুদূর পর্যন্ত সহজ করেছে। কিন্তু বিশেষ এক ব্যক্তির সমাজে প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বিস্তার গণতন্ত্রের অভিপ্রেত নয়। এর ফলে রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব বিরাট চরিত্রের দেখা পাই, তেমন চরিত্র বর্তমান সমাজে কল্পনা করাও যায় না। অথচ এই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী বিরাট চরিত্রগুলিই ক্লাসিক্স্-এর স্তম্ভ। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও আমরা বিরাট চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখতে পাই। কিন্তু বর্তমান শতকে সমাজে, এবং পরিণামস্বরূপ সাহিত্যে দেখা পাই সাধারণ মানুষের। সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের অন্য পাঁচজন লোক থেকে পৃথক করে দেখবার মতো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-কালের সাহিত্যাদর্শ সাধারণ মানুষকেই বড় করেছে। এটাই উচিত। কিন্তু ক্লাসিক্স্-এর মৌলিক আদর্শ এ-জাতীয় পাত্র-পাত্রীকে দিয়ে রক্ষিত হওয়া কঠিন।

বিজ্ঞানের যুগে কলে-তৈরি জিনিসগুলি যেমন এক ছাঁচে গড়া, তেমনি মানুষের জীবনযাত্রার ধারাও প্রায় এক রকম হয়ে উঠেছে। আপিসে ও কারখানায় কর্মীরা প্রায় সর্বত্র একই রুটিন অনুসরণ করে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও ধীরে ধীরে এক হয়ে আসছে। নিয়মমাফিক বৈচিত্র্যহীন জীবন মহৎ সৃষ্টির অনুকূল নয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে এখন এমনই শৃঙ্খলা যে, দৈনন্দিন জীবনের রুটিন-বহির্ভূত অসাধারণ কিছু ঘটবার সুযোগ নেই বললেই চলে। বাঁধাধরা সাধারণ জীবন থেকে ক্লাসিক্স্-এর উপাদান সংগ্রহ করা যায় না।

আধুনিক সাহিত্য মানুষের মনোজীবনকে আশ্রয় করে এই সমস্যার সমাধান করেছে। ক্লাসিক্‌স্‌-এর পক্ষে যে বিস্তার ও বৃহৎ পটভূমিকা অপরিহার্য, মনোবিশ্লেষণের দ্বারা তা পাওয়া যাবে না। ক্লাসিক্‌স্‌কে যদি কারুকার্যখচিত জমকালো প্রাসাদ বলে ধরা যায়, তাহলে মনোবিজ্ঞানমূলক আধুনিক কথা-সাহিত্যকে তুলনা করা যায় সুড়ঙ্গের সঙ্গে।

অবসরের অভাব সাহিত্যে বৃহৎ পটভূমিকা সৃষ্টির একটি প্রধান অন্তরায়। লেখকের আর পূর্বের মতো প্রচুর অবসর নেই। তখন রাজা, জমিদার ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকরা লেখককে আর্থিক সাহায্য করতেন। এই সাহায্য তাঁরা একালের প্রকাশকের মতো ওজন করে আদায় করতে উৎসুক ছিলেন না। লেখক হয়ত সারা জীবনের সাধনায় একটি বই শেষ করতেন। তাই সে বইয়ের পটভূমিকা হত বিস্তৃত এবং চরিত্রগুলি ছিল বিরাট। এখন লেখক সমাজ থেকে বিশেষ কোনো সুবিধা পান না, বেঁচে থাকবার জন্য তাঁকেও অন্য সকলের মতোই সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং মহৎ সৃষ্টির জন্য যে স্থৈর্য, শান্তি ও নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন তা আর নেই। পাঠকেরও সময় কোথায়? সে-ও দ্রুতআবর্তিত জীবনের চাকার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। হাজার দু'হাজার পৃষ্ঠার ক্লাসিক পড়বার সময় নেই। ছোটগল্প, রম্যরচনা অথবা উপন্যাসের নামে বড় গল্প পড়া যেতে পারে। যুগের প্রয়োজনে পত্রিকা-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যে সাহিত্যের আয়তন সংক্ষিপ্ত, যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-রূপে যুক্ত, যার সুর লঘু, সে রকম সাহিত্যই আজকাল সমাদর লাভ করে। চায়ের কাপ হাতে করে, ট্রামে-বাসে ভ্রমণের সময়, অথবা ঘুমাবার আগে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ-ধরনের সাহিত্য শেষ করা যায়। আমাদের জীবনের পরিধি খণ্ডিত ও সংকীর্ণ হয়েছে, বিস্তৃত আকাশের স্বপ্ন দেখে লাভ কি?

পূর্বেই বলেছি, লেখকরা প্রাচীনকালে সমাজের যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন এখন তা আর নেই। অন্যান্য লোকের মতোই লেখককেও জীবিকা অর্জনের কথা ভাবতে হয়। লেখার কাটতির উপরে তাঁর উপার্জন নির্ভর করে। সুতরাং লিখতে বসে পাঠকের রুচি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। সেই সচেতনতা উদ্দেশ্যমূলক যদি বা না হয়, অলক্ষ্যে এসে যায়। সাহিত্য আজকাল আর শুধুই আনন্দের উপকরণ নয়, বাজারের পণ্যও হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের পণ্যসত্তা তার নিছক শিল্পসত্তাকে প্রায় কোণঠাসা করে তুলেছে। কেননা,

বই বিক্রির উপরে লেখকের জীবন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। সুতরাং আজকের রুচিকে তৃপ্ত করবার দিকেই লেখক ও প্রকাশকের ঝোঁক। শাড়ি-গহনার বেলায় প্রচলিত রুচির উপরে ব্যবসায়ী যেমন জোর দেয়, বইয়ের ব্যাপারেও ঠিক তা-ই। ক্লাসিক্স্-এর মর্যাদা লাভ করবার জন্য জীবনের শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করবার আগ্রহ অপেক্ষা বর্তমান যুগকে রচনায় প্রতিফলিত করে প্রতিষ্ঠালাভের ঔৎসুক্য লেখকদের মধ্যে বেশি। একশ' দুশ' বা হাজার বছর পরে আমার বই কি মর্যাদা পাবে তা ভেবে সান্ত্বনা পেলে চলবে না। আজ টাকা চাই। কালজয়ী ক্লাসিক্স্-এর স্বপ্নে অর্থের প্রয়োজন মিটবে না। অন্য সকলের মতো লেখকের কাছেও বর্তমানই সবচেয়ে বড। বর্তমানের সাফল্য যদি ভবিষ্যতের কোলে উপচে পড়ে তাহলে তো আনন্দের কথা! কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে বর্তমানকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

ক্লাসিক্স্-এর যুগ শেষ হয়েছে বলে সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে এমন কথা বলব না। বর্তমান কালের উপযোগী কোনো আঙ্গিক পূর্ণতা লাভ করে একালের পাঠকদের হয়ত তৃপ্তি দিতে সক্ষম হবে।

সাহিত্য ও রাজরোষ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য আমাদের দাবি বাড়ছে। কিন্তু দাবিটা সে-পরিমাণ পূরণ হচ্ছে না। অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা যে হ্রাস পেয়েছে সে-সম্বন্ধে ভুল নেই। মত ও চিন্তা প্রকাশের অবাধ অধিকার বর্তমান কালে অনেক সংকুচিত হয়েছে। আরো যে হবে না এমন আশ্বাসও দেখা যায় না। অনেকে হয়ত বলবেন, অবাধ অধিকারের এই সংকোচ সভ্যতার বিকাশ এবং সামাজিক বিবর্তনের জন্যই প্রয়োজন। হযত তা-ই। কিন্তু এর ফলে মানব-সংস্কৃতি যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

প্রাচীনকালে লেখক যখন খুশি তালগাছের পাতা এনে লিখতে বসতেন। লোহার কলম দিয়ে লিখতেন কাব্য, নাটক অথবা দর্শন। এই গ্রন্থ পাঠ করা হত রাজসভায় অথবা চণ্ডীমণ্ডপে। লোকের ভালো লাগলে পুঁথি নকল করে রাখত, আবৃত্তি করত মুখে মুখে। ভালো না লাগলে ভুলে যেত। কিন্তু লেখক তাঁর চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করতে কোনো বাধা পেতেন না।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পবে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি হল। বই-য়ের মাধ্যমে মত প্রকাশের জন্য অর্থের প্রযোজন দেখা দিল। এই প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রকাশকগোষ্ঠীব। আজকাল লেখক ও পাঠকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশক। সে যেমন যোগাযোগ ঘটায়, তেমনি বাধারও সৃষ্টি করে। প্রকাশক অর্থ চায়। সুতরাং পাণ্ডুলিপি প্রকাশযোগ্য কি-না এই প্রশ্ন বিচার করবার সময় সে অর্থকরী দিকটাই দেখে। হামসুন-এর 'হাঙ্গার'-এর মতো অনেক পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের দপ্তর থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, এদের এক বৃহৎ অংশ চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। অনেক প্রতিভাবান লেখকের উদ্যম সফল হতে পারে না। কারণ প্রকাশক বণিকের মানদণ্ড দিয়ে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির বিচার করে। সে-বিচার নিছক রসের বিচার নয়। সুতরাং কত ভাবনা, কত অনুভূতির ঝলক অর্থকরী না হবার আশঙ্কায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। যাঁদের লেখা পাঠকদের হাতে পৌঁছবার সৌভাগ্য লাভ করে

তাঁরাও প্রাপ্তির লোভে এবং প্রকাশকের মুখ চেয়ে নিজের রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং বর্তমান পরিবেশে লেখক ও পাঠকের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ আশা করা যায় না।

প্রকাশকগোষ্ঠী আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই সরকার অনভিপ্রেত পুস্তকের প্রচার নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে সেন্সর বা বিবাচক প্রথার প্রবর্তন করেন। সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিরোধী মতামত প্রচারিত হয়ে রাষ্ট্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে-উদ্দেশ্যেই পুঁথিপত্র সেন্সর করা আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমশ সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রসারিত হয়। অশ্লীল রচনার অবাধ প্রচার দ্বারা জাতির নৈতিক স্বাস্থ্য যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার দায়িত্বও এসে পড়ল সেন্সরের উপর। রাষ্ট্রবিরোধী এবং অশ্লীল বলে চিহ্নিত পুঁথিপত্র ছাড়া দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব স্বষ্টিকারী অনেক গ্রন্থও লাঞ্ছিত হয়েছে। জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অশ্লীল পুস্তক সম্বন্ধে সেন্সরের কার্যকলাপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর Ann Veronica প্রকাশিত হবার পর কয়েক জন প্রভাবশালী সম্পাদক সেন্সরের দৃষ্টি গ্রন্থের তথাকথিত অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ করেন। আমাদের দেশে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে দেখা যায় যে, নীতিবাগীশ জনসাধারণের একাংশের আন্দোলনের ফলে সরকারী সেন্সর সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

জনসাধারণের আলোচনা সেন্সরকে যেমন সচেতন করে, তেমনি সেন্সরের কার্যকলাপ প্রকাশকদের ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকাশক পুঁজিপতি, ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করাই তার উদ্দেশ্য। এমন বই সে প্রকাশ করবে না যা সেন্সরের কোপদৃষ্টিতে পড়বার আশঙ্কা আছে। ঝুঁকি নিতে চায় না বলেই প্রকাশক বেসরকারী সেন্সরের কাজ করে। প্রকাশকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা অনেক সময় সেন্সরের পরীক্ষার চেয়ে কঠোর হয়। আর সে-পরীক্ষা শুধু প্রচলিত আইনকে লক্ষ্য করেই হয় না, সমাজের রুচিকে আঘাত করবে কি-না সেটাও প্রকাশকের বিবেচ্য। এর ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা প্রকাশকদের ভুল বিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত শুধু জানতে পারি। যে-সব পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হবার পর একেবারেই হারিয়ে গেছে তাদের প্রকৃত মূল্য যাচাই করবার কোনো উপায় নেই।

বায়রন-এর স্বরচিত স্মৃতিকথা তাঁর প্রকাশক মারে প্রায় ছাব্বিশ হাজার

টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। শর্ত ছিল লেখকের মৃত্যুর তিন মাস পরে বই প্রকাশ করা হবে। কিন্তু বায়রন-এর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি বিচার করে দেখা গেল যে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চিত্র অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া অনেক অভিজাত পরিবারের উল্লেখ থাকায় মানহানির দায়ে পড়বার সম্ভাবনাও কম নয়। প্রকাশকের মনে হল জেল, জরিমানা এবং কারবার গুটানোর বিপদ বরণ করবার চেয়ে পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করাই ভালো; ঝক্কিটা না হয় ছাব্বিশ হাজার টাকার উপর দিয়েই যাবে! সুতরাং বায়রন-এর নিজের হাতে লেখা সাহিত্যের সেই অমূল্য দলিলটি পুড়িয়ে ফেলা হল। এই সংবাদ জানবার পর স্কট-এর মতো রক্ষণশীল লেখকও ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। ১৮৭৭ সালে বিখ্যাত প্রকাশক চার্লস স্ক্রিবনার মার্কস-এর 'ক্যাপিট্যাল'-এর অনুবাদ প্রকাশ করতে সম্মত হননি। কারণ প্রকাশকের আশঙ্কা ছিল যে, পুঁজিপতির দেশ আমেরিকা হয়ত এ-বইকে অভিনন্দন জানাবে না। এই কারণেই আপ্টন সিনক্লেয়ার-এর 'জাঙ্গল' পাঁচ জন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। লেখক সমাজতন্ত্রবাদ সমর্থন করার ফলেই 'জাঙ্গল' লাঞ্ছিত হয়েছে। থিওডোর ড্রেইজার এক সময় আমেরিকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের কীর্তিগুলি উপন্যাসের আকারে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেন। ১৯১৪ সালে তাঁর লেখা The Titan এমনি একটি রচনা। প্রকাশক একজন ধনী ব্যবসায়ীর ইঙ্গিতে পাণ্ডুলিপি কিনে তা আর প্রকাশ করল না। আর্নল্ড বেনেট-এর শ্রেষ্ঠ রচনা The Old Wives' Tale অনেক আমেরিকান প্রকাশক 'unpleasant and sordid details'-এর অজুহাতে প্রকাশ করতে রাজী হয়নি। এমনি আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বিবাচক প্রথা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রয়োগ হয়েছে। মধ্যযুগে ছিল চার্চের আধিপত্য। তখন ধর্মদ্রোহিতা দমন করতে সেন্সরের শক্তি প্রয়োগ করা হত। পরবর্তী যুগে এল রাষ্ট্রের প্রাধান্য। রাষ্ট্র ধর্মরক্ষার চেয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বেশি আগ্রহান্বিত। সুতরাং দমননীতির রক্তচক্ষু পড়ল রাজদ্রোহিতার উপর। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হবার পর রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধারগণ উপলব্ধি করলেন যে, যৌনানুভূতির প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ না করলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

এবং ব্যাপক শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হবে। সুতরাং ভিক্টোরীয় যুগ থেকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন মতবাদের যুগে বাস করছি। যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক মতবাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নেই তার বিরুদ্ধাচরণ করা এখনকার বৈশিষ্ট্য। আমেরিকায় ম্যাক আর্‌থার-এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে-অভিযান চলেছিল, পরমত-অসহিষ্ণুতাই তার প্রধান কারণ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এর প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন সময়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নানা কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, একই সময়ে সবগুলি কারণ উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি বিশেষ কারণ প্রধান হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশে এবং যুদ্ধের সময় রাজদ্রোহিতাই সেন্সরের প্রধান বিবেচ্য, তাই দেখা যায়, যুদ্ধের সময় অশ্লীল পুস্তক প্রায় অবাধ প্রচারের সুযোগ পায়।

বর্তমান অর্থে বিবাচক প্রথার প্রথম প্রবর্তন হয় ইতালীতে। সম্রাট্ অগাস্টাস সর্বপ্রথম পুস্তকে লিখিত মতামতের জন্য লেখককে শাস্তি দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ল্যাবিয়েনাস সরকারের বিরূপ সমালোচনা করায় অগাস্টাস্-এর আদেশে তাঁর বইগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু ক্রমশ বিরুদ্ধ মত প্রকাশের জন্য শাস্তি কঠোরতর হয়। শুধু বই ধ্বংস করেই শাস্তির শেষ হল না। লেখকের কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করলেন সরকার। রোমের সম্রাট টাইবেরিয়াস্ তাঁর কাজের সমালোচনা করার জন্য ঐতিহাসিক করডাস্‌কে বন্দীদশায় না খেতে দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেছেন।

১৪৭৬ সালে ক্যাক্সটন-এর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বিপ্লব এল। চার্চ ও রাষ্ট্র দুই-ই মুদ্রাযন্ত্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। মুদ্রাযন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তাই সম্রাটের সনদ এবং সরকারের তত্ত্বাবধান ছাড়া কোনো ছাপাখানাকে কাজ করতে দেওয়া হত না। ১৫৫৭ সালে লণ্ডনের ৯৭ জন স্টেশনার্স-এর সমিতি স্টেশনার্স কোম্পানীকে ব্রিটেনের সকল ছাপার কাজ করবার সনদ দেওয়া হয়। দেশের সর্বত্র ছাপাখানা ছড়িয়ে থাকলে তাদের উপর দৃষ্টি রাখা কঠিন। এই ব্যবস্থায় একটি সমিতিকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ সফল হল না। রানী এলিজাবেথ আদেশ দিলেন যে আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবারী অথবা লণ্ডনের বিশপ পাণ্ডুলিপি দেখে অনুমোদন না করা পর্যন্ত কিছু ছাপা হতে পারবে না। এই আদেশ অমান্য করলে শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর নাক কান কেটে নেওয়া হবে, অথবা কপালে তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে দেওয়া হবে। ১৬২২ সালে উইলিয়াম্ প্রিন Histriomastix নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থে প্রথম জেমস্-এর রানী সম্বন্ধে অশোভন ইঙ্গিত থাকার অভিযোগে প্রিনকে একটি কান হারাতে হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য ভাবেও কম ক্ষতি সহ্য করতে হয়নি।

১৬৪৪ সালের ২৪শে আগস্ট মিলটন 'scandalous and seditious' পুস্তিকা প্রকাশের অভিযোগে সেন্সর কর্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযুক্ত হন। এই অভিযোগের উত্তরে মিলটন যে পুস্তিকা লিখলেন সেটি তাঁর প্রসিদ্ধ Areopagitica. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সমর্থনে এমন জোরালো লেখা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। মিলটন বলেছেন, একজন লোক হত্যা করায় যে পাপ, একটি ভালো বই বাজেয়াপ্ত করাতেও সেই পাপ। মিলটনের সেই অতি পুরাতন কথাটি বর্তমান কালেও সত্য, তিনি বলেছেন: "Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. Many a man lives a burden to the earth; but a good book is the precious life-blood of a master spirit, embalmed and treasured upon purpose to a life beyond life."

নতুন নতুন পুঁথিপত্রের মুদ্রণ সরকারী বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও কিন্তু বৃদ্ধি পেতে লাগল। মুদ্রাযন্ত্রের অসামান্য শক্তি উপলব্ধি করে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার অর্জন করবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল তেমনি আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিও বাড়ল। কারো হল প্রাণদণ্ড, কারো হল অঙ্গহানি। নাক, কান, হাত প্রভৃতি শাস্তি হিসাবে কেটে দেওয়া হত। এত শাস্তি দিয়েও মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার এবং প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা দাবিয়ে রাখা গেল না।

কিছু ছাপবার পূর্বে পাণ্ডুলিপি সেন্সর করবার রীতি ১৬৯৫ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে বলবৎ ছিল।

প্রাচীনকালে সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠত না। হোমার, কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতির রচনা তাঁদের যুগেও লাঞ্ছিত হয়নি, এবং আজও আমরা অশ্লীলতার অপবাদে তাদের দূর করে রাখিনি। যদিও প্লেটো উপদেশ দিয়েছেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের হোমার পড়তে দেওয়া উচিত নয়; প্লুটার্ক ও অ্যারিস্টোফেনিস্-এর কমেডিগুলি কুরুচিপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন, তথাপি অশ্লীলতার জন্য কোনো বইয়ের প্রচার বন্ধ করা হয়নি। সেন্সরের দৃষ্টি প্রথম ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার উপরে। বহু শতাব্দী পরে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন সেন্সরের বিচার্য বিষয় হয়েছে। চসার, ফীল্ডিং, স্মলেট, স্টার্ন, সুইফ্ট প্রভৃতির গ্রন্থে যৌনানুভূতির কথা অনেক জায়গায় খোলাখুলি ভাবেই বলা হয়েছে। তবু তাদের উপর রাজরোষ পড়েনি। এমনকি সাহিত্য-গুণহীন নিছক অশ্লীল পুঁথিপত্র সম্বন্ধেও সেন্সর দীর্ঘকাল উদাসীন ছিল। ১৭০৮ সালে এমনি একটি বইয়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আদালতে প্রথম অভিযোগ আনা হয়, কিন্তু বিচারক আসামীকে মুক্তি দেন।

ইংলণ্ডের দুর্নীতিদমন সমিতি স্থাপিত হয় ১৮০২ সালে। এই সমিতির প্রচারের ফলেই অশ্লীলতা সম্বন্ধে বর্তমান ধারণার গোড়াপত্তন হয়। ১৮৩৭ সালে ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করে সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। এর পূর্বেই দুর্নীতিদমন সমিতির উদ্যোগে শেলীর Alastor-এর উপর তীব্র আক্রমণ হয়েছে এবং সেক্সপীয়রের রচনাবলী থেকে আপত্তিকর (?) অংশগুলি বাদ দেবার কাজ শুরু হয়েছে। এরূপ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড ক্যাম্বেল অশ্লীল পুস্তক নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেণ্টে একটি বিল উত্থাপন করেন। বিরোধী পক্ষ থেকে বিলের তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় লর্ড ক্যাম্বেল আশ্বাস দেন যে, এই আইন নিছক অশ্লীল পুঁথিপত্রের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হবে, সাহিত্যপদবাচ্য কোনো রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করা আইনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এগারো বছর পরে বিচারপতি ককবার্ন সম্রাজ্ঞী বনাম হিকলিন মোকদ্দমায় যে রায় দেন তাতে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়। ককবার্ন আইনের এমন ব্যাপক ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ-আইন সাহিত্য-নিয়ন্ত্রণের মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। ক্যাম্বেল-আইন অশ্লীলতা তথা সাহিত্য নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রচেষ্টা। ইংলণ্ড,

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অশ্লীলতা-বিরোধী ব্যবস্থা এই আইনের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

এর পর থেকে আইনের সহায়তায় সাহিত্যের বিরুদ্ধে শুরু হল নিরঙ্কুশ অভিযান। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর Aurora Leigh একটি স্বাধীনা তরুণীর কাহিনী। ভিক্টোরীয় যুগে স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালো চোখে দেখা হত না বলেই বোধ হয় বইটি 'hysterical indecencies of an erotic mind' বলে অভিযুক্ত করা হল। জোলার Le Terre-এর প্রকাশক জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেল ; তাঁর 'নানা' হল বাজেয়াপ্ত। হার্ডির Jude the Obscure এবং Tess of the D' Urbervilles-এর মতো বইও লাঞ্ছিত হয়েছে। লরেন্স-এর Women in Love প্রভৃতি অনেকগুলি বই পর পর রাজরোষে পড়ায় তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। টলস্টয় মোপাসাঁর Une Vie-কে 'লে মিজারেবল'-এর পরে ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন। এ-উপন্যাসটিও সেন্সরের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। হুইটম্যান ১৮৫৫ সালে Leaves of Grass প্রকাশিত করেন। প্রথমে এ-বই কারো চোখে পড়েনি। এমার্সনই প্রথম হুইটম্যান-এর কবি-প্রতিভা স্বীকার করলেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন : 'unnecessary inclusion of sex element.' হুইটম্যান যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টিরিয়ার-এর ইণ্ডিয়ান ব্যুরোতে কেরানীর চাকরি করতেন। এই ব্যুরোর সেক্রেটারী এমার্সন-এর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন। এমন অশ্লীল কবিতা যে লিখতে পারে সরকারী চাকরিতে থাকবার যোগ্যতা তার নেই। সুতরাং কোনো নোটিশ পর্যন্ত না দিয়ে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

বিশ্ব-সাহিত্যের যে-সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাজরোষে পড়ে লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের তালিকা বৃহৎ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি : ওডিসি ; ডন কুইক্সট ; রবিনসন ক্রুসো ; গালিভার্স ট্রাভেলস ; ফাউস্ট, অ্যাণ্ডার্সন-এর 'রূপকথা' ; ব্যালজাক-এর 'ড্রল স্টরিস' ; ফ্লোবেয়ার-এর 'মাদাম বোভারি' ; 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' ; আপ্টন সিনক্লেয়ার-এর 'অয়েল' ; লরেন্স-এর 'উইমেন ইন লভ' ; রেমার্ক-এর 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট' ; দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া' ; শেলীর 'কুইন ম্যাব' ; রসেটির 'কবিতাবলী' ; সুইনবার্ন-এর 'পয়েমস্ অ্যাণ্ড ব্যালাডস্' ; রুশোর 'কনফেশানস' প্রভৃতি।

কয়েক বছর পুর্বেও সুইনডন-এর (ইংলণ্ড) ম্যাজিস্ট্রেট বোকাসিওর 'ডেকামেরন'-এর একটি নতুন সংস্করণ অশ্লীল সিদ্ধান্ত করে সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নিয়ে য়ুরোপের সাহিত্যিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অশ্লীলতার অভিযোগ ছাড়া আরো কত বিচিত্র কারণে যে সাহিত্যগ্রন্থ লাঞ্ছিত হয় তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান রাষ্ট্র 'রবিন হুড' নিষিদ্ধ করবার উদ্যোগ করেছিল। দস্যু রবিন হুড বড়লোকের টাকা লুণ্ঠন করে দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দেয়; সুতরাং কম্যুনিজমের মূল কথাটি এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রচার হবার আশঙ্কা আছে। ১৯২৯ সালে রাশিয়া The Adventures of Sherlock Holmes নিষিদ্ধ করেছিল পুস্তকে লেখকের 'স্পিরিচুয়ালিজম'-এর প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়ায়। ১৯৩১ সালে চীনের হুনান প্রদেশের গভর্নর Alice in Wonderland নিষিদ্ধ করেন এই কারণে যে, গল্পের পশুচরিত্রগুলি মানুষের ভাষা ব্যবহার করেছে।

নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির হাতে শুধু সাহিত্যকেই লাঞ্ছিত হতে হয়নি, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থগুলি প্রচলিত মতের বিরোধী, নতুন কথা প্রচার করে তাদেরও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। এক ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অন্য ধর্মসম্প্রদায় পুড়িয়েছে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্তে পৃথিবীর ইতিহাস কলঙ্কিত। গ্যালিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে কোপার্নিকাস-এর মত সমর্থন ও প্রচার করতেন। ১৬১৬ সালে তাঁকে রোমে ডাকিয়ে নিয়ে সাবধান করে দেওয়া হল তিনি যেন এই মত প্রচার না করেন, কারণ এটা খ্রীষ্টধর্মের পরিপন্থী। গ্যালিলিও এতে না দমে সত্য প্রচার করবার উদ্দেশ্যে ১৬৩২ সালে Dialogue on the Two Chief Systems of the World প্রকাশিত করেন। সূর্যের চার পাশে যে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না—গ্যালিলিও এই তত্ত্বটি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই চমকপ্রদ তথ্য ধর্মান্ধ কর্তৃপক্ষকে এমনি বিচলিত করল যে, তাঁরা গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করলেন। রোজার বেকনকেও নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য দশ বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল। ডারুইন-এর Origin of Species, দেকার্ত-এর Meditations, ম্যাকিয়াভেলির The Prince, এবং ক্যাণ্ট, মিল, ইর্যাসমাস, লুথার প্রভৃতির গ্রন্থাবলী লাঞ্ছিত হয়েছে। চার্চের কর্তৃপক্ষ মলিয়েরকে তো 'মনুষ্যাকৃতি দানব' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

অশ্লীলতার ধারণা যুগে যুগে, দেশে দেশে পরিবর্তিত হয়। এক যুগে যা অশ্লীল, অন্য যুগে তা স্বাভাবিক। এক দেশে যে-বই প্রচারের অযোগ্য, অন্য দেশে তার অবাধ প্রচলন। এ থেকে দেখা যাবে যে, পুস্তক নিষিদ্ধ করবার ক্ষমতা যাঁদের হাতে রয়েছে অশ্লীলতার মাপকাঠি সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা তাঁদেরও নেই। এই জন্যই স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্তের অভাব হয় না।

এলিস-এর Psychology of Sex ইংলণ্ডে ছাপানো নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় ছাপাতে কোনো আপত্তি ওঠেনি। আজ তো কিনসে রিপোর্টের মতো বই অবাধে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রি হচ্ছে। ১৯২৮ সালে আমেরিকার কাস্টম্‌স্ কোর্ট জয়েস-এর 'ইউলিসিস'কে চূড়ান্তরূপে অশ্লীল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের মতে এ-উপন্যাস 'filled with obscenity of the rottenest and vilest character. কিন্তু ১৯৩৪ সালে বিচারপতি উলসী 'ইউলিসিস'কে সেন্সরের রাহুমুক্ত করে বলেছেন যে, আলাদা করে দেখলে আপত্তিকর কিছু কিছু অংশ হয়ত পাওয়া যাবে। তবে ঐ অংশগুলি চরিত্র-সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। 'ইউলিসিস' জয়েস-এর সাহিত্যগুণসম্পন্ন শিল্পকীর্তি। ডি. এইচ. লরেন্স-এর অন্যান্য উপন্যাসগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও তাঁর Lady Chatterley's Lover-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ দীর্ঘকাল ইংলণ্ড-আমেরিকায় নিষিদ্ধ ছিল। এতদিন বাজারে যে বই পাওয়া যেত সেটা তথাকথিত আপত্তিকর অংশবর্জিত। অথচ এ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ য়ুরোপের অনেক দেশ থেকেই প্রকাশিত হয়ে বিক্রি হয়ে আসছিল। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 'লেডি চ্যাটার্লিস লাভার'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রচারের বাধা দূর হয়েছে। ভারতে এখনো তা বলবৎ আছে। থিওডোর রুজভেল্ট টলস্টয়কে 'a sexual and moral pervert' বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং ১৮৯০ সালে আমেরিকার ডাকবিভাগ টলস্টয়ের Kreutzer Sonata নিষিদ্ধ করে। কিন্তু আজ এ বই আমেরিকার ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারেই পাওয়া যাবে।

প্রাচীন ভারতে পুস্তক দমনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে কখনো কখনো ধর্মগ্রন্থ অবশ্য লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু এই বিদ্বেষের তীব্রতা মধ্যযুগীয় য়ুরোপের ধর্মোন্মত্ততার মতো নয়। ভারতের আশ্চর্য পরমতসহিষ্ণুতাই এর কারণ। আর্যভট্ট গ্যালিলিওর প্রায়

বারো শ' বছর আগে সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচার করাতেও কেউ তাঁর বিরোধিতা করেনি, অথবা গ্যালিলিওর মতো তাঁকে জেলে যেতে হয়নি। যৌন বিষয়েও ভারত যে কত উদার ছিল তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্য থেকেই দেখা যায়। ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে; ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে নিয়মিত ভাবে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যগ্রন্থগুলি রাজসভায় অথবা চণ্ডীমণ্ডপে পাঠ করা হত। সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে নারী, পুরুষ, গুরুজন এবং বয়স্য সকলেই থাকতেন। সুতরাং সমাজবিরোধী অশ্লীল কথা বা মত পাঠ করা সম্ভব ছিল না। আজ আমাদের কাছে যা অনুচিত মনে হয়, সেদিন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তা স্বাভাবিক ছিল। লেখকের বক্তব্য সমাজের অনুমোদন না পেলে প্রকাশ্যে পাঠ করা সম্ভব হত না। ভারতীয় সাহিত্যের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এক লেখকের রচনা পরবর্তীকালে অন্য লেখক প্রায়ই একটু অদলবদল করতেন। তা করবার সময় যুগ-পরিবর্তনের ফলে কোন অংশ আপত্তিকর মনে হলে সে অংশ পরিবর্তন করে দেওয়া হত।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেব জন্ম হয়েছে ভিক্টোরীয় যুগের "শুচিশুদ্ধ" ঐতিহ্যের পটভূমিকায়। সুতরাং দীর্ঘকাল আমাদের সাহিত্য যৌনসম্বন্ধীয় সকল আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। আধুনিক কালে সাহিত্যে যৌনানুভূতির যে আলোচনা দেখা যায় তার উগ্রতা য়ুরোপ আমেরিকার সাহিত্যের তুলনায় নগণ্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদেব রুচি সম্বন্ধে সমালোচনাব ঝড় উঠেছিল, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কারো কারো উদ্বেগের অন্ত ছিল না। দু' একখানি বই বাজেয়াপ্ত করা ছাড়া বিদেশী সরকাব এ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার উপর।

ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সেন্সরের সকল শক্তি নিযুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রবিরোধী মতামত দমন করতে। উইলিয়াম বোল্ট-এর নির্বাসন থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী ভারতের কণ্ঠরোধ করবার জন্য বহু আইন পাশ করা হয়েছে। সে-সব নাগপাশের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই কিছু কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং নতুন করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন হবে না। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৬৭ সালের 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুকস্ অ্যাক্ট'।

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারত সরকারের মনে প্রশ্ন জাগে যে, যারা একদিন ডেকে এনে ইংরেজদের হাতে দেশ তুলে দিয়েছে তারাই হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করল কেন? সন্দেহ হল যে, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বই ও পত্রিকা হয়ত রাজদ্রোহ প্রচার করে। দেশীয় সাহিত্যের প্রতি আগে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এবার তাঁরা সচেতন হয়ে রেভারেণ্ড লঙকে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করলেন। লঙ রিপোর্ট দাখিল করে বললেন যে, বাঙলা পুঁথি-পত্রে রাজদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সরকার তবু স্থির করলেন, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুঁথি-পত্রের উপর দৃষ্টি রাখা ভালো। তাই ১৮৬৭ সালের আইনের সাহায্যে যা-কিছু ছাপা হয় তার অন্ততঃ এক কপি করে পাবার ব্যবস্থা করলেন গভর্ণমেণ্ট। এ সকল পুঁথি-পত্র রাষ্ট্রদ্রোহ এবং অশ্লীলতার জন্য বিচার করা হয়। অবশ্য প্রথম উদ্দেশ্যটাই বরাবর প্রাধান্য লাভ করেছে।

১৮৫৭ সালে সাহিত্যে অশ্লীলতা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হয়। আমেরিকায় এই উদ্দেশ্যে আইন পাশ হয় আরো পরে। এ বিষয়ে ভারত অগ্রগামী, এই দাবি করতে পারে। ১৮৫৬ সালে Obscene Books and Pictures Act ভারত সরকার পাশ করেন। এই আইন অনুসারে যে-সব অশ্লীল পুস্তক, ছবি, গান, আবৃত্তি, কথা ইত্যাদি অন্যের বিরক্তি জাগাবে তারাই দণ্ডনীয় বলে গণ্য হত। অপরাধীর একশ' টাকার অনধিক জরিমানা, অথবা তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড হতে পারত। এই আইন দ্বারা কিছু ফল পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের বাঙলা সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে লঙ সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর মোট তেরখানি অশ্লীল পুস্তকের চৌদ্দ হাজার কপিরও বেশী ছাপা হয়েছিল। পূর্বের কয়েক বৎসর এ জাতীয় পুস্তকের প্রচারসংখ্যা আরো অনেক বেশী ছিল। ভারতে বর্তমানে প্রচলিত অশ্লীলতা-বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৯২৫ সালে, আন্তর্জাতিক অশ্লীলতা নিবারণী সংস্থার অনুরোধে। এই আইনের মূল ভিত্তি সম্রাজ্ঞী বনাম হিক্‌লিন্ মোকদ্দমায় বিচারপতি ককবার্ণের রায়। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতে বিভিন্ন কারণে তিন হাজারেরও অধিক পত্রিকা, পুস্তিকা ও বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে বাঙলা ভাষায় লেখা পুঁথি-পত্রের সংখ্যা প্রায় সওয়া তিনশ'। এদের অধিকাংশই

রাজনৈতিক পুঁথিপত্র। সাহিত্যগুণসম্পন্ন যে-সব বই নিষিদ্ধ হয়েছে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

এ কালের সাহিত্য বাস্তব জীবনকে নিয়ে রচিত। সুতরাং জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ যৌনানুভূতিকে বাদ দিয়ে বাস্তবপন্থী সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যৌনতার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। সিনেমা, থিয়েটার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি এর প্রমাণ দেবে। আধুনিক লেখক বর্তমান জীবনের এই প্রবল অনুভূতিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। জীবন থেকে যৌনতাকে বাদ দিতে পারলেই সাহিত্য 'শুচিশুদ্ধ' হবে, একমাত্র সাহিত্যের উপর রোষদৃষ্টি পড়লে সাহিত্যসৃষ্টি বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু সমাজ থেকে তথাকথিত অশ্লীলতাকে দূর করা যাবে না।

একটা কাজের প্রতিক্রিয়া কি হয় তার উপরেই শাস্তির পরিমাণ নির্ভর করে। ভেজাল খাদ্য খেলে দেহের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তার প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। কিন্তু সাহিত্যে যৌনচিত্র পাঠ করে কোন পাঠকের মনে কি প্রতি-ক্রিয়া দেখা দিল, তা নির্ধারণ করবার উপায় নেই। নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের মূল্যবান শিল্পকীর্তিও লাঞ্ছিত হয়। লাঞ্ছনার আর একটি বড় কারণ এই যে অশ্লীলতার অভিযোগ এখনো বিচারপতি ককবার্ণের ভিক্টোরীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই প্রধানত বিচার করা হয়। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শ্লীলতা-অশ্লীলতার আদর্শ বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে।

অশ্লীল পুস্তকের বিরুদ্ধে মামলার দু'টি রায় সাহিত্য-রসিকদের মনে আশার সঞ্চার করবে। বিচারপতি Curtis Bok (আমেরিকা) এবং বিচারপতি Stable (ইংলণ্ড) অভিযুক্ত আসামীদের মুক্তি দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার লেখকের আছে। জীবনকে স্বীকার করলে যৌনানুভূতিকে অস্বীকার করে দূরে রাখা যায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করলে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক তাই কুৎসিত রূপ ধারণ করে। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন ও গভর্ণমেণ্টের মনোভাবেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাগীশরা টেবিলের উন্মুক্ত পায়া দেখলে পর্যন্ত শিউরে উঠতেন; তাই অনেক বাড়িতে টেবিলের পায়াগুলিকে

প্যাণ্ট পরিয়ে রাখা হত। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আজকের সাহিত্য বিচার করতে যাওয়া হাস্যকর।

বিচারপতি ককবার্ণ ১৮৬৮ সালে অশ্লীলতা নির্ধারণের মাপকাঠি স্থির করেছিলেন এই : Whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. অর্থাৎ, অপরিণতবয়স্ক কিশোর-কিশোরী বইটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে কি-না সেটাই হল অশ্লীলতার পরীক্ষা। বিচারপতি স্টেবল বলেছেন যে, সর্বদা কিশোরদের মুখ চেয়ে সাহিত্য রচনা করলে সে সাহিত্য কখনও সাবালকত্ব লাভ করে পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। সাহিত্যিকের পরিণত সজাগ মনকে কিশোরের অপরিণত কাঁচা মনের সঙ্গে বেঁধে রাখবার চেষ্টা হাস্যকর। শুধু হাস্যকর নয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। লেখক ও সাহিত্য-রসিকদের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের অশ্লীলতা-বিরোধী কঠোর আইন বাতিল করে, ব্রিটিশ সরকার ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'দি অবসীন পাব্লিকেশান্স্ অ্যাক্ট' নামে একটি নতুন আইন করেছেন। আমেরিকায় এ বিষয়ে আগে থেকেই অধিকতর উদারতা ছিল। তাই 'লেডি চ্যাটার্লিস্ লাভার' এবং হেনরি মিলারের 'দি ট্রপিক অব ক্যানসার' আমেরিকাতেই আবার নতুন করে প্রথম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ইংলণ্ডের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন যে সরকারের উদার মনোভাবের পরিচায়ক তার প্রমাণ এর মধ্যেই পাওয়া গেছে। এই নতুন আইন বিধিবদ্ধ না হলে ভ্লাডিমির নবোকভ-এর 'লোলিতা' এবং লরেন্স-এর 'লেডি চ্যাটার্লিস্ লাভার'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ব্রিটেনে প্রকাশ ও অবাধে বিক্রয় করা সম্ভব হত না। পুরানো আইন যতদিন বলবৎ ছিল ততদিন বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্র' ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়নি! অবশ্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সাতটি খণ্ডে 'কামশাস্ত্র' লণ্ডনে ছাপা হয়েছিল গোপনে প্রচারের জন্য। লণ্ডন ও বারাণসীর কামশাস্ত্র সোসাইটি এ বই ছাপার ব্যবস্থা করেছে। সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন আরব্য উপন্যাসের খ্যাতনামা সংকলক রিচার্ড বার্টন। বার্টনের অনুবাদ আশী বছর পরে ১৯৬৩ সালে প্রকাশ্যে বিক্রির জন্য বোধ হয় এই প্রথম ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

জেমস্ জয়েস-এর 'ইউলিসিস'-এর বিচারপ্রসঙ্গে বিচারপতি উলসী যে-সব

পুঁথিপত্র 'dirt for dirt's sake' রচিত তাই অশ্লীল বলে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। সাহিত্যগুণহীন নিছক যৌনচর্চা নিশ্চয়ই অশ্লীল এবং তার প্রচার বন্ধ হওয়া একান্তরূপেই বাঞ্ছনীয়। অশ্লীল পুঁথিপত্র বিচারের ভার থাক সচেতন সমাজের উপরে। সমাজের বিচার যে ভ্রান্ত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই থেকে যে, একটি নিছক অশ্লীল বইও কালজয়ী হতে পারেনি। সমাজবোধশূন্য সেন্সরের হাতে বিচারের ভার থাকলে অনেক মূল্যবান সাহিত্যগ্রন্থ যে লাঞ্ছিত হয় তার দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি। একটি ভালো বইয়ের প্রচার বন্ধ করা নরহত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ, মিল্টনের এই সাবধানবাণী মনে রেখে সাহিত্যগ্রন্থের বিচার করা উচিত।

একরূপতার অভিশাপ

বর্তমানে যে-সব বই বার হয়, তাদের পড়ে মন ভরে না। একালের ছবি দেখে চোখ ভরে না। এ শুধু আমাদের কথা নয়। সকল দেশের শিল্প ও সাহিত্য রসিকের মুখেই শোনা যায় এই আক্ষেপ। আধুনিক শিল্পকলার মন পূর্ণ করবার এই অক্ষমতা একটি সাধারণ লক্ষণ। এর অনেক কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে শিল্পকলা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যহীনতা শিল্পকর্মেও এনেছে বৈচিত্র্যের অভাব। বৈচিত্র্য মন আকৃষ্ট করে, বৈচিত্র্যহীনতা মন বিমুখ করে। মন পূর্ণ করবার প্রথম শর্তই হল যা পরিচিত, যা দৈনন্দিন, তা থেকে একটু পৃথক এবং নতুন কিছু উপস্থিত করা। কিন্তু শিল্পী ও লেখক তো জীবনকেই তাঁদের কীর্তির মধ্যে প্রতিফলিত করেন। জীবনে যদি বৈচিত্র্যের আভাস না থাকে, তাহলে শিল্প ও সাহিত্যে নতুনত্ব আসবে কোথা থেকে? যাঁরা নিছক কল্পনাশ্রয়ী শিল্পী, তাঁরা হয়ত কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন।

কিন্তু একালের শিল্প ও সাহিত্য প্রধানত বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাস্তবতার পরিমাণ নিয়ে মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে। তবে বাস্তব জীবনকে বাদ দিয়ে শিল্প বা সাহিত্য রচনা এখন আর সম্ভব নয়। শিল্পসৃষ্টির দু'টি প্রধান দিক আছে। এক শিল্পীর মানসলোক, আর হল বাইরের জগৎ। বাইরের জগৎ, তার ছবি ও ঘটনা, শিল্পীর কাঁচা মাল। এই জগৎ থেকে বৈচিত্র্য যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্পী ও লেখক সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনে যে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিয়েছে তার প্রভাব থেকে এঁরাও মুক্ত হতে পারেন না। মানসলোকের পরিমণ্ডলে পারিপার্শ্বিক জীবনের ছায়া পড়ে। শিল্পী ও লেখকের চিন্তা এবং ভাবনায় মৌলিকতা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁদের সৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট ছাপটুকু যেন পূর্বের মতো উজ্জ্বল নেই।

একদা শিল্পী ও লেখক সমাজের বাইরে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। সমাজের সাধারণ রীতিনীতির দ্বারা তাঁদের জীবন বাঁধা ছিল না। এইজন্যই বলছি, তাঁরা সমাজের বাইরে ছিলেন। সমাজ অথবা সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁদের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করে দিতেন বলে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অনেক সামাজিক দায় থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রীতি বজায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই লেখক ও শিল্পী পুরোপুরি সামাজিক জীব হয়ে উঠলেন। তাঁদের যে বিশেষ সুবিধা ছিল তা আর রইল না। এখন শিল্পীকে তাঁর সৃষ্টি আর পাঁচ রকম পণ্যের মতো বাজারে উপস্থিত করতে হয়, জীবিকার্জনের জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং শিল্পীও অন্যান্যের মতো সামাজিক হয়ে উঠেছেন, তাঁর বিশিষ্ট আসনের দূরত্ব থেকে জীবনকে দেখবার সুযোগ আর নেই। সমাজ-জীবনের যে-কোনো পরিবর্তন: শিল্পী ও লেখককে গভীরতররূপে প্রভাবান্বিত করে। তাই জীবনে বৈচিত্র্যহীনতার অভিশাপ শিল্পীর সৃষ্টিকে এখন যতটা স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে, পূর্বে হলে ততটা সম্ভব হত না।

লুইস মাম্‌ফোর্ড তাঁর 'টেকনিক্‌স্ অ্যাণ্ড সিভিলিজেশান' গ্রন্থে বলেছেন: "Printing was from the beginning a completely mechanical achievement. Not merely that : it was the type for all future instruments of reproduction : for the printed sheet, even before the military uniform, was the first completely standardised product, manufactured in series, and the movable types themselves were the first example of completely standardised and interchangeable parts. Truly a revolutionary in every department."

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে গুটেনবার্গ কর্তৃক মুভেবল্ টাইপ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে জীবনে একরূপতা বা কনফরমিটির অভিশাপ শুরু হয় বলা যেতে পারে। প্রত্যেকের হাতের লেখার ছাঁদ ছিল আলাদা। হস্তাক্ষরের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। কিন্তু ধাতু- (তার আগে কাষ্ঠ) -নির্মিত টাইপের মধ্যে সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর রইল না। একই ছাঁদের টাইপ দিয়ে শত শত বই ছাপানো হতে লাগল। শুধু যে অক্ষরগুলি দেখতে

একরকম, তা নয়! বইয়ের আকার, কাগজ বাঁধাই প্রভৃতিও একরকম হল। ছাপাখানাকে কেন্দ্র করেই প্রথম একরূপতা আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে।

তারপর এল শিল্প-বিপ্লবের যুগ। বহুলপরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রস্তুতের জন্য মেশিনের সহায়তা অপরিহার্য হয়ে উঠল। মেশিনে তৈরী মালের মধ্যে একরূপতা অনিবার্য। কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রত্যেকটি একটু আলাদা। তাদের মধ্যে নির্মাতার হাতের বিশিষ্টতা অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপভোগ করবার মতো সময় নেই আমাদের; আর অনেক সময় অতিরিক্ত দাম দিতেও আমরা অনিচ্ছুক। মেশিনে-তৈরী জিনিস দামে সস্তা। সব এক আকৃতির এবং দ্রুত প্রচুর উৎপাদন করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের জন্য এগুলি প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক রীতিতেই জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একরূপতা এসেছে। একই সঙ্গে এক ধরনের জিনিস প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করবার জন্যই তো মেশিন। তা না হলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যন্ত্রবিদ্যার কোনো মূল্য থাকত না। ছোটখাটো ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করেই এ যুগের যন্ত্রবিদরা নিবৃত্ত হননি। বাড়ি পর্যন্ত আগে থাকতেই তৈরী করা থাকে। কিনে এনে বিভিন্ন অংশগুলি জুড়ে দিলেই হল। মালিকের নিজস্ব রুচির দাবি তুললে দাম বেশী পড়বে। হয়ত কয়েক দশক পরে দেখা যাবে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বাডি দিয়ে শহর গড়ে উঠেছে।

যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আমাদের যে জীবন, তার মধ্যেও একরূপতা এসে গেছে। ফ্যাক্টরি ও আপিসে প্রায় একই ধরনের জীবনযাত্রা; কলকাতা ও বোম্বাইতে বিশেষ প্রভেদ নেই। আপিসের সময়, চাকরির শর্ত, কাজের ধরন একজাতীয় শিল্পে প্রায় একই রকম। শ্রমিকদের পোশাক, থাকবার বাড়ি ইত্যাদির মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ এখন যন্ত্রের প্রভু নয়; সে যন্ত্রের একটা অংশ,—নাট-বলটুর মতো। তার জীবনযাত্রায় শুধু একরূপতা নয়, যান্ত্রিকতা এসে গেছে। চরিত্রের বিচিত্ররূপতা সাহিত্যের প্রধান উপাদান। সব মানুষ যদি পোশাকে, আচারে, ব্যবহারে এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে এক হয়ে পড়ে তাহলে শিল্পী কিংবা লেখক কাকে অবলম্বন করে শিল্পভাবনাকে রূপায়িত করবেন? এখন পর্যন্ত তেমন অবস্থা না এলেও জীবন যেরূপ দ্রুত যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয় না তার অনেক বিলম্ব আছে।

ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারেও একরূপতা এসে হানা দিয়েছে। ধরা যাক খাওয়ার কথা। ব্যক্তিবিশেষের ভালো লাগার দিকে লক্ষ্য রেখে সযত্নে বাড়িতে আহার্য তৈরী হত। এখন হোটেল রেস্তোরাঁ এবং ক্যান্টিনে একজনের রুচি উপেক্ষিত। ব্যক্তি হোটেলের রুচির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এছাড়া একালের কর্মী-মানুষের জীবনযাত্রা সম্ভব নয়।

আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির রুচিকে আজকাল গ্রাহ্য করা চলে না। সিনেমা থিয়েটার ও রেডিওর মারফত একই ধরনের আনন্দ বহুজনের জন্য পরিবেশন করা হয়। রেডিওর একটি গান, সিনেমার একটি কাহিনী, থিয়েটারের একটি নাটক—একই সঙ্গে বহুলোকের নিকট উপস্থিত করা হয়ে থাকে। রেডিও ও সিনেমার আনন্দ পরিবেশিত হয় যন্ত্রের মাধ্যমে। থিয়েটাব এখনো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি, তবে যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গান, বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয়—কিছুই এখন স্বাভাবিক কণ্ঠে শোনা যায় না। মাইকের মধ্য দিয়ে অনেকটা বিকৃত হয়ে আমাদের নিকটে এসে পৌঁছে।

আমাদের মানসিক একরূপতা এনেছে পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। প্রাচীন কালে গুরু তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার বিষয় ও পুস্তক-নির্বাচন নির্ভর করত তাঁর উপর। প্রত্যেক গুরুর দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিব পার্থক্য অনুযায়ী পড়াবার ব্যবস্থা পৃথক হত। কিন্তু এখন তা হবার জো নেই। দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে শিক্ষালাভ করে। পাঠ্য-পুস্তকও লেখা হয় সিলেবাসের নির্দেশ মান্য করে। শিক্ষক যত যোগ্য হোন্, বিদ্বান হোন্, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাত্রদের উপর পড়বার সুযোগ কম। একই সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীব মন বেঁধে রাখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ও পাঠগ্রহণের ক্ষমতা বিচার করে পাঠক্রম রচনা করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। যে পাঠক্রম তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাত্রদের কর্তব্য। মনের স্বাভাবিক বিকাশ ছেলেবেলা থেকেই এমনি করে ব্যাহত হয়।

রাষ্ট্রজীবনেও ব্যক্তির মূল্য কমে গেছে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার এক। ব্যক্তিগত বিশেষ যোগ্যতার মূল্য দেওয়া হয় না। নেহরু এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক দিনমজুরের একটি করেই ভোট। গণতন্ত্রে

সংখ্যারই মূল্য, ব্যক্তির মূল্য গৌণ। ব্যক্তি সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করে বলেই তার মূল্য। শুধু যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের প্রভাব পড়েছে তা নয়। জীবনের সকল বিভাগেই গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা হয়। তার ফলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষাবিদ কিংবা শিল্পী যা সংগত মনে করেন, সেভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন না। কমিটির সদস্যদের অধিকাংশের মত অনুসারে কাজ করতে হয়। এঁরা হয়ত শিক্ষাবিদ বা শিল্পী নন। গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখবার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নিয়মকানুন একরকম করা হয়েছে। সকলের অধিকার ও মর্যাদা এক। ব্যক্তির বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনা করে তাকে বিশেষ অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়।

যদিও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, তথাপি সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। সফল হবে কি-না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যন্ত্রযুগের প্রভাবে দেশের লোকের মধ্যে নানা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে—নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা এক হয়েছে। পাটশিল্প, বয়নশিল্প কিংবা রেলওয়ে-কর্মীরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সংঘবদ্ধ হয়েছে। তারা যখন বেতনবৃদ্ধির দাবি তোলে, ধর্মঘট করে, তখন তারা নিজেদের কথাই ভাবে। অন্য শিল্পের কর্মীদের অবস্থার কথা নিয়ে চিন্তা করবার সময় বা উদারতা নেই। সুতরাং জীবনযাত্রার একরূপতার সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং গোষ্ঠীপ্রিয়তা এসেছে।

এটা বিশেষজ্ঞের যুগ। জীবনের যে-কোনো বিভাগ নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা সমগ্র জীবনকে উপেক্ষা করে একটি অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ব্যবহারিক প্রয়োজনে জীবনকে এরূপ করে খণ্ডিত করে দেখবার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে এই খণ্ডজীবনের ছবি অনুকূল নয়।

একরূপতা এবং খণ্ডদৃষ্টি মহৎ সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ নয়। জীবনের বিচিত্র প্রবাহ নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রতিফলিত হয় বলেই সাহিত্য আমাদের আকৃষ্ট করে। বৈচিত্র্যের ধারা রুদ্ধ হয়ে গেলে সেই আকর্ষণ থাকা সম্ভব নয়। এইজন্যই একালের সাহিত্য আমাদের মন পূর্ণ করতে পারে না। যন্ত্রের যত নিকটে আমরা এগিয়ে চলেছি, ততই আমাদের জীবন থেকে

আদর্শবাদ দূরে সরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনার বিচিত্র আকাশ। আদর্শবাদ ও কল্পনার মিশ্রণ ছাড়া মন অভিভূত করবার মতো সাহিত্য সৃষ্টি করা সহজ নয়।

এই একরূপতার অভিশাপ এড়াবার জন্য একদল শিল্পী অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট আর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এমন ছবি তাঁরা আঁকছেন যার প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে নেই। তাঁদের সৃষ্টি একরূপতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ।

লেখকরা অনেকে এখন মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে প্রবেশ করেছেন। বাইরের জীবনের একরূপতা যে বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করেছে, মনের অন্ধকারে তা রূপান্তরিত হয়ে আত্মগোপন করে আছে। তাকে আবিষ্কার করে প্রকাশ করবার ভার নিয়েছেন একদল লেখক। আবার কেউ কেউ গোয়েন্দা এবং যৌনানুভূতিমূলক কাহিনী দিয়ে পাঠকদের আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সামগ্রিক জীবনের বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ করতে এজাতীয় রচনা সক্ষম নয়।

সমালোচনার মান

যোগ্য সমালোচকের অভাব সম্বন্ধে আজকাল প্রায়ই আক্ষেপ শোনা যায়। বাঙলা সাহিত্য যে ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছে না তার প্রধান কারণ উপযুক্ত সমালোচনার অভাব, এ সম্বন্ধে কারো ভিন্ন মত নেই। অন্তত সভাসমিতির:বিবরণ থেকে তাই দেখেছি। নির্ভরযোগ্য সমালোচনার অভাব মোটামুটি নিম্নলিখিত তিনটি প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী : প্রথমত, সত্যিকারের ভালো বই প্রচার লাভ করে না। সৎ সমালোচক লেখক বা প্রকাশকের নাম না দেখে যে-সব বই প্রকৃতই সাহিত্যগুণসম্পন্ন তাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সমালোচক এই দায়িত্ব পালন না করলে ভালো লেখকরা উৎসাহ পাবে না। দ্বিতীয়ত, সমালোচক যদি অনবধানতাবশত কিংবা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে নির্গুণ বইকেও ভালো বলেন, তাহলে পাঠক সমালোচনার মূল্য-সম্বন্ধে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠবে এবং নিম্নস্তরের পুস্তকের সমাদর দেখে অন্য লেখকরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত, সাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বিচার করে সমালোচক পথ নির্দেশ করবেন। সমালোচকের যোগ্যতা না থাকলে উপরোক্ত দায়িত্বগুলির একটিও যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব হবে না।

সমালোচকের উপরে সাহিত্য প্রকৃতই এতটা নির্ভরশীল কি-না তা বিচার করে দেখা উচিত।

সমালোচনার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জন্মগত। শুধু সাহিত্য নয়, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে ভালোবাসি। আজকাল সেই মতামতকে ছাপিয়ে প্রচার করা যত সহজ হয়েছে পূর্বে তা ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে সমালোচনার শাখা খুবই দুর্বল। এটা স্বাভাবিক। কারণ আগে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সমালোচকের আবির্ভাব হয় পরে। সমালোচক কখনো স্রষ্টার পথ নির্দেশ করে দিতে পারেন না। তিনি নিজের পথ নিজেই সৃষ্টি করেন। সাহিত্যের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ক'টি ক্লাসিক গ্রন্থ আছে তাদের রচনা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হবার পর হয়েছে। প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকরা সৃষ্টির কোন্ পথ অবলম্বন করেছেন তা বিশ্লেষণ করে

সাহিত্যের ভাষ্যকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে অন্য লেখকরা এর দ্বারা অনেকটা উপকৃত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভাবান লেখকরা পুর্বসূরীর ঋণ স্বীকার করেও মুলত নিজেদের পথে চলেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকের সৃষ্টির মধ্যে মৌলিকতা না থাকলে তা কখনো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

মধ্যযুগে টীকা-টিপ্পনীর প্রাধান্য ছিল। ভাষ্যকারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দর্শন ও ধর্মগ্রন্থ। একটি শব্দ বা বাক্যের কত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনাটাই ছিল টীকাকারদের আনন্দের বিষয়। সমালোচনা বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে শুরু হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর আরো প্রায় চার শতাব্দী প্রয়োজন হল মুদ্রণপদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের জন্য। পুঁথিপত্র ছাপানো যখন সস্তা ও দ্রুত হল তখন থেকেই সমালোচকের প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। সমালোচকের মর্যাদা বেড়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। হঠাৎ অনেক বই ছাপা হতে লাগল। এত বই যে, সব পড়া পাঠকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমস্যাটা পুর্বে ছিল না। বইয়ের সংখ্যা তখন কম ছিল ; নতুন নতুন বই পড়তে চাইলেও পাওয়া যেত না। তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বার বার পড়ে মুখস্থ হয়ে যেত। শত শত নতুন বইয়ের সম্মুখীন হয়ে পাঠক বেশ সমস্যায় পড়ে গেল। তার সময় এবং সামর্থ্য দুই-ই সীমিত। সুতরাং তার রুচির সঙ্গে যে বইয়ের সুর মিলবে সে বইটি বেছে নিতে পারলে শক্তি, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটবে না। শুধু তাই নয়। বিষয়বস্তু পাঠকের উপযোগী হলেও রচনা হয়ত নিকৃষ্ট। পাঠককে এসব বিষয়ে আগে থেকে সাহায্য করতে পারে সমালোচক। পাঠক সমালোচনা পড়ে জানতে পারবে আলোচ্য বইয়ের বিষয়বস্তু কি, এবং লেখক তা সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করতে পেরেছন কি-না। এর উপরে নিভর করে বইটি সম্বন্ধে পাঠক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সুতরাং আমরা দেখছি আধুনিক সমালোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকদের পুস্তকের মূল্য নিরূপণ করতে সহায়তা করা। কিন্তু এ কাজ সমালোচকদের পক্ষে করা সম্ভব হত না যদি এই সময় সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব না ঘটত। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার একটি নিয়মিত বিভাগ হয়ে দাঁড়াল পুস্তক-সমালোচনা। যদিও পূর্বেও পত্রিকা ছিল, তবু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সংখ্যায়, গুণে ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে সাময়িক পত্রিকাগুলি পাঠকদের

দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করল। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমালোচক জানেন, একটি জনপ্রিয় দৈনিক বা সাময়িক পত্রিকায় তাঁর মন্তব্য প্রকাশিত হলে তা হয়ত লক্ষ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁর মতামতের দ্বারা পাঠক প্রভাবান্বিত হবে। সুতরাং দেখছি, প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সহায়তা পেয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

উপরোক্ত দু'টি কারণের জন্যই সমালোচনার মান ক্রমশ নিচু হয়ে চলেছে। প্রত্যক্ষ কারণ না হলেও পরোক্ষে এই কারণ দু'টি সাহিত্যের সমালোচনাকে প্রভাবান্বিত করে। এ বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করব। প্রথমে দেখা যাক, সমালোচকের যে প্রতিষ্ঠা তা কতটা তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

পেশাদার সমালোচকের সাধারণত মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। অবশ্য অনেক লেখকও কখনো কখনো অন্য লেখকের বই সমালোচনা করে থাকেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ করতেন। লেখক-সমালোচকদের কথা আমরা বলছি না। সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বলেই সমালোচকরা অবচেতন মনের গভীরে লেখকদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা পোষণ করেন। হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এই ঈর্ষার জন্ম। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ঈর্ষা থেকে সঞ্জাত একটা অহেতুক কঠোরতা সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস থেকে এর স্বপক্ষে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমরা দু'টি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের The Excursion প্রকাশিত হয় ১৮১৪ সালে। 'এডিনবার্গ রিভিয়্যুর' সমালোচকের মতে: "The case of Mr. Wordsworth, we perceive, is now manifestly hopeless, and we give him up as altogether incurable and beyond the power of criticism"

শেলীর Prometheus Unbound সম্বন্ধে 'লিটারারি গেজেট'-এর সমালোচকের রায় এই: " the stupid trash of a delirious dreamer, maniacal raving."

পূর্বে সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বই সমালোচনা করতেন। এখনো

প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত সমালোচনার মূল্য বেশী। সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক আদর্শ সাধারণত সংরক্ষণশীল ; কারণ তাঁদের প্রতিষ্ঠা সমাজের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলেই অক্ষুণ্ণ থাকবে। পরিবর্তনের মধ্যেই অনিশ্চয়তা। তাই এঁরা কোনো লেখকের মধ্যে বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিচয় পেলে তাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট হন।

শিল্পী বা লেখকের মধ্যে যে তন্ময়তা আছে সমালোচকের মধ্যে তা নেই। অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী লেখক যখন লিখতে বসেন তখন তিনি একটি ভাব, চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন। সমসাময়িক জীবনে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা সেই মুহূর্তে অত্যাবশ্যক নয়। তন্ময়তা শিল্পসাধনার একটি প্রধান শর্ত। কিন্তু সমালোচকের পক্ষে তা নয়। সমালোচক লেখার সময় সাময়িক ঘটনা, ভাবাদর্শ এবং ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকেন। সুতরাং লেখক পুস্তক রচনার সময় যে পরিবেশ সম্বন্ধে মোটেই অবহিত ছিলেন না, সমালোচনা সেই অপরিচিত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। এর ফলে আলোচ্য পুস্তকের উপর প্রায়ই অবিচারের আশঙ্কা থাকে।

সাহিত্যের প্রধান আবেদন পাঠকের হৃদয়াবেগের কাছে। সমালোচক সাহিত্যকে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করবার পরিবর্তে বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চেষ্টা করেন। প্রফেশন্যাল সমালোচক বই পড়েন কর্তব্যের দায়ে, সুতরাং তার মধ্যে অনুভূতির অংশটা আরো কম থাকে। সাধারণ পাঠক যে বই পড়ে উপভোগ করে, সমালোচকের অভিমত অনুসারে তা অনেক সময় অপাঠ্য। এই পার্থক্যের কারণ এই যে একজন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, আর-একজন করে বুদ্ধি দিয়ে।

মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস তাঁদের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলেন। তাই তাঁদের বলা হয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের চেহারাটা আমাদের কাছে এতই অপরিচিত যে আমরা সেই শিল্পকর্মকে বুঝতে পারি না। সমালোচকরা দুর্বোধ ও অর্থহীন বলে একে বাতিল করে দেন। কিন্তু হয়ত পঞ্চাশ বছর পরে সমালোচকের রায় মিথ্যা প্রমাণিত করে সেই দুর্বোধ সাহিত্যাদর্শ অতি সহজ ও সাধারণ হয়ে পড়ে। শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর লেখক বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। অনুশীলনের দ্বারা সেই

প্রতিভা আয়ত্ত করা যায় না। সমালোচক ও লেখকের মধ্যে এই একটা বড় প্রভেদ। সমালোচক অনুশীলন দ্বারা লেখা আয়ত্ত করেছেন, সৃষ্টির প্রতিভা তাঁর মধ্যে নেই। একটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত হতে পেরেছেন, তাই তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। সমালোচকের দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকা চাই; তাঁর মন হবে উদার এবং অনুভূতি প্রখর। কিন্তু খুব কম পেশাদার সমালোচকেরই সবগুলি গুণ থাকে।

লেখক ও সমালোচকের মধ্যে উপরোক্ত প্রভেদগুলি বিগত দেড়শ কিংবা দু'শ বছর ধরে ভুল বোঝার ইতিহাস রচনা করেছে। সাহিত্যের উন্নতির জন্য সমালোচকদের উপর দু'শ বছর পূর্বে যে আশা করা হয়েছিল এখন সে আশা করতে দ্বিধা বোধ হয়। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সমালোচকদের মন্তব্য যদি বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে বিখ্যাত বই ও লেখকদের সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কীট্স, শেলী প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকদেরই যদি সমালোচকরা বুঝতে না পেরে থাকেন, তাহলে সাধারণ লেখকদের সম্বন্ধে এঁদের মতামত তো আরো নির্ভরযোগ্য নয়! সমালোচকদের বিচারের যাথার্থ্য নির্ধারণের সুযোগ আমরা এই প্রথম পেয়েছি। গত শ' দুই বছরে তাঁরা কি রকম ভ্রমাত্মক মন্তব্য করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের 'মান্থলি রিভিয়ু' কোলরিজের বিখ্যাত কাব্যের সমালোচনা করে বলেছেন: "The Rime of the Ancient Mariner .. is the strangest story of a cock and bull that we ever saw on paper..."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আজ সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ১৮০৭ সালে তিনি 'ক্রিটিক্যাল রিভিয়ু'র সমালোচকের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেননি। সে বছর দু'খণ্ডে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহে *The Daffodils, Ode to Duty, Ode on Intimations of Immortality* প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতা ছিল। তখনকার দিনের সমালোচনার রীতি কি ছিল তা দেখাবার জন্য একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হল:

"A silly book is a serious evil, but it becomes absolutely insupportable when written by a man of sense...We have, at

different times, employed ridicule with a view of making this gentleman ashamed of himself, and bringing him back to his senses. But, unfortunately, he is only one of a tribe who keep each other in countenance by mutual applause and flattery, who having dubbed themselves by the names of poets, imagine they have a right to direct the taste of the nation, and thus, infinitely to their own satisfaction, abuse the good sense and weary out the patience of mankind with their fantastical mummeries."

কীট্‌সের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শেলীর শোকগীতি Adonais সম্বন্ধে 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন'-এর (১৮২১) সমালোচনা এই : "Lock says that the most resolute liar cannot lie more than once in every three sentences. Folly is more engrossing ; for we could prove, from the present Elegy, that it is possible to write two sentences of pure nonsense out of every three."

ব্রাউনিঙ-এর Men and Women 'স্যাটারডে রিভিয়্যু'-র সমালোচককে উত্তেজিত করেছিল : "There is another book of madness and mysticism, another melancholy specimen of power wantonly wasted, and talent deliberately perverted."

কীট্‌স-এর কাব্যগ্রন্থের এরূপ কঠোর সমালোচনা হয়েছিল যে, বায়রন মনে করতেন তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ ছিল সমালোচকদের নিষ্ঠুরতা।

পল ক্লদেলের নাটক পড়ে একজন ফরাসী সমালোচক বলেছিলেন, "I was reading words and phrases in our language yet I could understand nothing of what I read."

টমাস হার্ডির Jude the Obscure-এর এমন ভুল ব্যাখ্যা ও বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল, যে হার্ডি ক্ষুব্ধ হয়ে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হার্ডির জার্নালে এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানা যাবে।

রবীন্দ্রনাথকে কিছুকাল যাবৎ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমাদের দেশে আর কোনো সাহিত্যিক এরূপ কঠোরভাবে সমালোচিত

হননি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিরূপতা রঙ্গমঞ্চ পযন্ত পৌছেছিল। একজন সমালোচক হিন্দুগৃহের শুচিশুদ্ধ অন্তঃপুরে বিজাতীয় প্রেমের খেলা প্রথম প্রবেশ করাবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করেছেন। 'নষ্টনীড'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য এই : "ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটির তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্মাণের পথ দেখাইয়াছেন।"

শুধু যে অজ্ঞাতনামা কিংবা স্বল্পখ্যাত সমালোচকদের বিচারই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তা নয়। বিখ্যাত লেখকরা অন্য লেখকের বই সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, কালের বিচারে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'এনশেণ্ট মেরিনার'-এর মধ্যে কোনো সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাননি। 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি 'এনশেণ্ট মেরিনার' বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কীট্স-এর Endymion এবং শেলীর Alastor তাঁর ভালো লাগেনি।

গ্যেটে বায়রন সম্বন্ধে একারমানকে বলেছিলেন : "What I call invention has never, in any man, seemed to me greater than in Byron If it were not for his hypochondrical and negative attitude, he would be as great as Shakespeare and the ancients." গ্যেটের অভিমত অনুসারে 'ডন জুয়ান' হচ্ছে "the work of a boundless genius." বিখ্যাত সমালোচক Taine দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, বায়রন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীট্স-এর উপরে বায়রন-এর স্থান দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে বায়রনের স্থান যে অন্যান্য কবিদের তুলনায় কত নীচে তা অভিজ্ঞ পাঠককে বলে দিতে হবে না। বায়রন-এর কাব্য এমনই অভূতপূর্ব মোহ বিস্তার করেছিল যে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেননি। এমন সৌভাগ্য অন্য কোনো লেখকের হয়েছে বলে জানি না।

বার্নার্ড শ' অস্কার ওয়াইল্ড-এর নিম্নমানের মেলোড্রামা An Ideal Husband-এর ভক্ত ছিলেন, অথচ হাস্যরসে প্রোজ্জ্বল The Importance of Being Earnest তাঁর ভালো লাগত না। সাধারণ পাঠকের কাছে শ'র এই ভালো লাগার মানদণ্ড একটু অদ্ভুত মনে হবে।

'হ্যামলেট' বিশ্বসাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে স্বীকৃত। কিন্তু টি. এস. এলিয়ট-এর মতে হ্যামলেট 'most certainly an artistic failure.'

তথাকথিত অশ্লীলতার অভিযোগে সমালোচকরা যে কত লেখকের অযৌক্তিক কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তার বিবরণ আমরা অন্যত্র দিয়েছি। এ সব সমালোচকরা অনেক বিখ্যাত বই বাজেয়াপ্ত করতে সরকারের সহায়তা করেছেন। কয়েক বছর পরে দেখা গেছে সমাজ অশ্লীলতার অপবাদ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে-সব বই সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে, এবং সরকারকেও বাধ্য হয়ে শিথিল করতে হয়েছে তাঁদের নিষেধাজ্ঞা।

উপরে আমরা সমালোচনার যে-সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, তা পরে ভুল প্রমাণিত হলেও সমালোচকদের আন্তরিকতায় সন্দেহের কারণ নেই। বই পড়ে সমালোচকের যা মনে হয়েছে তাই তিনি লিখেছেন। সাহিত্যের আবেদন আমাদের মনের কাছে, লেখকের মনের সঙ্গে-সমালোচকের মনের যদি যথার্থ যোগাযোগ ঘটে তাহলে সমালোচনা স্বভাবতঃই ভালো হবে। ব্যক্তিগত রুচিবোধ, দৃষ্টিকোণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো বই ভালো লাগে, কোনো বই লাগে না। সুতরাং সাহিত্যের সমালোচনা ব্যক্তিগত রুচিনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে বিভিন্ন সমালোচকের নিকট একই পুস্তকের মূল্যায়ন নানা ভাবে হয়েছে। তথ্যমূলক পুস্তকের সমালোচনায় এত বৈচিত্র্য হবার কথা নয়। কারণ তথ্যের যে কাঠামোর উপরে বইটি দাঁড়িয়ে আছে তার রূপভেদ সহজে হবে না, এবং তা সমালোচক ও পাঠক উভয়ের নিকটই প্রত্যক্ষ। হৃদয়ের জগৎ অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন; সেখানে তথ্যের দৃঢ় ভিত্তি নেই। অতএব মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক।

গত দেড়শ-দু'শ বছরের পুস্তক সমালোচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সাহিত্যবিচারে এই অনিয়ম দেখা যাবে। দেখা যাবে, এক জন যে বই খারাপ বলে, আর একজন তারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। আবার এ যুগের ভালো বই হয়ত পরবর্তী যুগে পাঠকরা মনেও রাখে না। খারাপ বই বলে এখন বাতিল করা হল, পঞ্চাশ বছর পরে সে বই হয়ত জনপ্রিয়তার শিখরে উঠবে। এরূপ অনির্দিষ্ট মানদণ্ড যাঁরা ব্যবহার করেন সেই সব সমালোচকদের উপর সাহিত্যের উন্নতির জন্য নির্ভর করা যায় না। সমালোচকদের পক্ষে কোন্ বই ভালো,

কোন্ বই ভালো নয়, তেমন ঘোষণা করা সংগত নয়। শুধু বলা চলে—এ বই আমার ভালো লেগেছে, এ বই ভালো লাগেনি।

সমালোচকের মতামত বারবার ব্যর্থ হতে দেখে সমালোচনার উপরে পাঠকের আস্থা অনেক কমেছে। কিন্তু সমালোচকের ক্ষমতা এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। তার কারণ, সাহিত্য শুধু আর আনন্দের উপকরণ নয়, বাজারের পণ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছে। লেখক কেবল পাঠকের প্রশংসা পেয়েই তৃপ্তি লাভ করেন না, নগদ প্রাপ্তি চান। প্রকাশকের তো অর্থপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। সাহিত্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ততই সমালোচনা নিছক গুণ-বিচারের আদর্শ ত্যাগ করে বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে। আজ যে মন্তব্য সমালোচনার পাতায়, কাল তা দেখব প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে। চিত্র-তারকার কেশতৈলের প্রশংসাবাণীর সঙ্গে যেন বিশেষ তফাত নেই।

অর্থের প্রভাব থেকে সমালোচকও আজকাল মুক্ত নয়। বিদেশে পুস্তক সমালোচনাই অনেকের উপার্জনের প্রধান পথ। বিবেকসম্পন্ন সমালোচকও অর্থ-সংক্রান্ত নানা জটিলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। একটি দৈনিক বা সাময়িক পত্রিকা হয়ত হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ পাঠক পড়ে। যে বই প্রকাশ করতে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে, যে বই বিক্রির রয়েলটি দিয়ে লেখকের সংসার চলবে, সে বইয়ের বিরূপ সমালোচনা একটি বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করতে সমালোচক দ্বিধা বোধ করবেন। প্রশংসা পাঠকরা হয়ত লক্ষ্য করবে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাঠকের নিকট বইটির নিন্দাবাদ পৌছলে বিক্রির আশা থাকবে না।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হবার পূর্বে বই পড়া উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং তখন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর সমালোচনা ছিল বরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও সমালোচনা করতে বসে মেকলে নিজেই আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রায় সম্পূর্ণ বই লিখতে দ্বিধা বোধ করেননি। এখন সাক্ষর লোকের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে; আধুনিক পাঠকগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ এই নব-সাক্ষরের দল। পুস্তক রচনা ও প্রকাশের সময় এদের কথা ভুলে থাকা যায় না। ব্যবসার খাতিরে এক বই দিয়ে বিভিন্ন মানের বহু লোকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচনার মান খর্ব করতে হয়; যন্ত্রযুগের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের সময় অল্প, গভীর কথা গ্রহণ করবার সময় ও ধৈর্য নেই। মনোরঞ্জনই তাদের কাছে

বই পড়বার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এই শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনে সাহিত্যে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন আসছে এবং সাহিত্যের মান নীচু হবার কারণ যে এর মধ্যেই রয়েছে, বাস্তব-সচেতন সমালোচক তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই শ্রেণীর পাঠকের প্রভাবে সমালোচনারও রূপান্তর ঘটেছে।

ইংরেজীতে সমালোচনার জন্য দু'টো কথা আছে, review এবং criticism. বাংলায় আছে শুধু সমালোচনা। সমালোচনা (সম্যক+আলোচনা) criticism-এর বাংলা বলে গ্রহণ করা যায়। Review-কে বলতে পারি পুস্তক-পরিচয়। দু'টি কারণে ক্রিটিসিজিমকে হঠিয়ে দিয়ে রিভিয়্যু প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথমত, সমালোচনার বিচার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিখ্যাত বই সম্বন্ধেও মতের কত পার্থক্য রয়েছে। আমাদের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হবে সমালোচকের মন্তব্যের উপর নির্ভর করে কোনো বই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং সমালোচকের বিচারের উপরে পাঠকের আস্থা বহুলাংশে শিথিল হয়েছে। তাছাড়া এখনকার ব্যস্ত পাঠকের সমালোচকের বিশ্লেষণ, সমশ্রেণীর পুস্তকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা, লেখকের ভাষার বৈশিষ্ট্য, চরিত্রচিত্রণের কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পড়বার সময় ও ধৈর্য নেই। এ ধরনের আলোচনা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী। যখন পাঠক ও বইয়ের সংখ্যা কম ছিল, যখন প্রত্যেকটি বই গভীর মনোযোগের সহিত পড়া হত, সমালোচনার তখন বিশেষ সমাদর ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যপত্রের একটি প্রধান বিভাগ ছিল পুস্তক-সমালোচনা। বিদগ্ধ পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র সাহিত্যপত্রের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়েছে। সমালোচনা প্রকাশের স্থান একান্তরূপে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

দৈনিক পত্রিকা কিংবা জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা সমালোচনা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নয়। পুস্তক-পরিচয় এদের উপযোগী। একালের পাঠকরা পুস্তক-পরিচয় পাঠ করেই সন্তুষ্ট, তার বেশী তারা চায় না। অন্যান্য পাঁচটা সংবাদের মতো নতুন কোনো পুস্তকের প্রকাশটাও একটা সংবাদ। পুস্তক-পরিচয় প্রধানত পাঠকের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দেয়। পুস্তকের আলোচ্য বিষয় কি, পাঠকদের তা অল্প কথায় সুন্দর করে জানিয়ে দেওয়া রিভিয়্যু লেখকের কর্তব্য। বইটি ভালো হলে সংক্ষিপ্তসার এমন ভাবে লিখবেন যে পাঠকের মনে বইটি পড়বার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হবে। সমালোচনার সঙ্গে পুস্তক-

পরিচয়ের প্রধান প্রভেদ এই যে, সমালোচক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বইয়ের দোষ-গুণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন; কিন্তু পরিচয়-লেখক তেমন কোনো সোচ্চার ঘোষণা করেন না; ব্যক্তিগত মতামত সজোরে প্রকাশ করবার দায়িত্বটা তিনি এড়িয়ে যেতে চান। বই সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিচয়-লেখক পাঠকের হাতে তুলে দিলেন; এর উপর নির্ভর করে পাঠক তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বই পড়ে সে রায় দেবে বইটি ভালো কি মন্দ। ব্যক্তিগত রুচির উপরে যদি ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নির্ভর করে তাহলে সমালোচকের রুচিকে পাঠকের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র পুস্তক-পরিচয় প্রাধান্য লাভ করেছে। সমালোচনা অল্প কয়েকটি সাহিত্যপত্রের পৃষ্ঠায় নির্বাসিত হয়ে আছে।

আমাদের দেশে পুস্তক-পরিচয়ের মান উন্নত করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিদেশে পুস্তক-পরিচয় লিখে অনেকে জীবিকা অর্জন করেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখে যেমন পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, পুস্তক-পরিচয়ের লেখককেও তেমনি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এর ফলে বিদেশী পত্রিকার রিভিয়্যুর মধ্যে একটা নিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট। আমাদের দেশে সাধারণত এক কপি বইয়ের বিনিময়ে রিভিয়্যু লিখতে হয়, তাই যোগ্য লোক রিভিয়্যু লেখার জন্য পাওয়া যায় না। টাকা নেই বটে, কিন্তু বন্ধুকৃত্য করবার সুযোগ আছে,– কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে করতে হয়।

শুধু বন্ধুর কথাই বা বলব কেন? সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো লেখকের তৃতীয় শ্রেণীর রচনাকেও স্পষ্ট কথায় বাতিল করে দিতে আমাদের দ্বিধা হয়। একালের ভদ্রতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, সত্য কথা যদি কঠোর হয় তাহলে সে কথা বলে কাউকে দুঃখ দেব না। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও আমাদের চরিত্রে এমন কোমলতার প্রভাব বিস্তার লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন যে, কোনো বই যদি ভালো না বলতে পারি, অন্তত নিন্দা করব না। লেখকরা উৎসাহ পাক। এটা যে শুধু আমাদের দেশেরই কথা, তা নয়। অক্ষম লেখকের প্রতি দেখছি আলডুস হাক্সলিরও গভীর মমতা: "A bad book is as much of a labour to write as a good one, it comes out as sincerely from the author's soul."

সমালোচনার মান এখন নীচু হয়ে গেছে, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে—এমন অভিযোগের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনার পৃষ্ঠাগুলি নতুন করে পড়লে দেখা যাবে—খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের বিচার এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই কত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে বই প্রকৃতই তৃতীয় শ্রেণীর সে বইয়ের বিচারে সাধারণত ভুল হয় না। সমালোচকের কৃতিত্ব মধ্যম শ্রেণীর পুস্তকের যথার্থ মূল্যায়নে। প্রথম শ্রেণীর বইয়ের বিরূপ সমালোচনা হলেও অল্পদিনের মধ্যেই পাঠকরা তাদের মূল্য আবিষ্কার করে; সাহিত্যের ইতিহাস থেকে দেখা গেছে শুধু সমালোচকের মন্তব্যের ফলে কোনো সত্যিকার ভালো বই বাতিল হয়ে যায়নি। যত সমস্যা মধ্যম শ্রেণীর বই নিয়ে। সমালোচকরা কখনো এদের প্রথম শ্রেণীর বলে রায় দেন; কখনো বা তৃতীয় শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করেন।

সমালোচনার মান সম্বন্ধে অভিযোগটা আজকের নয়। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছেন: "বাংলা ভাষায় ভাল গ্রন্থ বাহির হউক আর নাই হউক,—ভাল সমালোচনা কিন্তু অনেক গ্রন্থেরই আছে। কেবল ঐ সমালোচনগুলি একত্র করিয়া যদি কেহ পড়েন, তবে তিনি মনে করিতে পারেন, বাংলা ভাষায় না জানি দিন দিন কতই না উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে! বুঝি কেবল চিন্তাশীল লেখক দ্বারাই বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়াছে!" জন্মভূমি, পৌষ, ১২৯৮।

এ মন্তব্য বর্তমান সমালোচনা সম্বন্ধেও সত্য।

সাহিত্য ও রাজনীতি

সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব দেখতে পেলে অনেকে চমকে ওঠেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যরস উপভোগের পক্ষে রাজনীতি অন্তরায়-স্বরূপ। সাহিত্য রাজনীতির সম্পর্কশূন্য হবে—এমন দাবি যুক্তিসহ নয়। বাস্তব জীবনে যদি রাজনীতির প্রভাব থাকে তাহলে সাহিত্য থেকে তা বাদ দেওয়া যায় না। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন, সুতরাং রাজনীতি স্বাভাবিকরূপেই সাহিত্যে স্থান লাভ করে।

সাহিত্য-রসিকদের রাজনীতির প্রতি বিরূপতার একটি কারণ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে রাজনীতিক মতবাদের প্রভাব ছিল খুবই কম। সেই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল যাবৎ চলে এসেছে। সাহিত্যের পুরানো আদর্শ আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারিনি। তাই রাজনীতির প্রাধান্য দেখলে আমরা স্বস্তি বোধ করি না। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিক্‌সগুলির সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রায় নেই বলা চলে। অন্তত বর্তমানে আমরা রাজনীতি বলতে যা বুঝি তেমন রাজনীতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি।

প্রাচীন কালে রাজনীতির উপর তাত্ত্বিক আলোচনার বই ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' বা প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এ যে ধরনের আলোচনা আছে তা বর্তমান কালের রাজনীতি থেকে পৃথক। তখন রাজনীতি ছিল রাজসভার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে দেশ শাসন করতেন। সুতরাং অধিকাংশ নাগরিকের মনে রাজনৈতিক সমস্যা বলে কিছু ছিল না। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে তাঁর নির্দেশ এবং শাসন-ব্যবস্থা নির্বিচারে মেনে চলতে হত। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সর্বত্রই এই বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক শ' বছর পূর্বেও দিল্লীর সম্রাটকে জগদীশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেক্সপীয়র তাঁর 'কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকে বলেছেন :

> Not all the water in the rough rude sea
> Can wash the balm off from an anointed King,
> The breath of worldly men cannot depose
> The deputy elected by the Lord.

স্থতরাং রাজার উপর সকল রাজনৈতিক ভাবনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নাগরিকরা নিশ্চিন্ত ছিল। রেনেসাঁসের পর থেকে মানুষ আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্যে ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ। ব্যক্তির প্রাধান্য আরম্ভ হল রেনেসাঁসের পর থেকে। নাগরিকরা ক্রমে উপলব্ধি করল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রচারের ফলে রাজার ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের দাবি ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ল। ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়—এই উপলব্ধি থেকেই রাজনীতির চর্চা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছে।

ইংরেজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। টমাস হব্‌স্ (১৫৮৮—১৬৭৯) তাঁর The Leviathan গ্রন্থে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেবার তিনি পক্ষপাতী। টমাস হব্‌স্ প্রথম যুগের ইংরেজী গদ্যের একজন শক্তিশালী লেখক। জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) রচনায় তেমন সাহিত্যগুণ না থাকলেও তাঁর Two Treatises of Government গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থন হিসাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মিল্টনের (১৬০৮-'৭৪) Areopagitica একটি মৌলিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে মিল্টন যেসব জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে তার বহুল প্রচার এবং পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রাজনৈতিক মূল্য ছাড়াও রচনার উৎকর্ষের জন্য Areopagitica ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্যামুয়েল বাটলারের (১৬১২-'৮০) Hudibras , ডেভিড হিউমের (১৭১১-'৭৬) Political Discourses ও অন্যান্য রচনাবলী , অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-'৯০) The Wealth of Nations ; এডমাণ্ড বার্কের (১৭২৯-'৯৭) রচনাবলী ; টমাস পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) The Rights of Man , জেরিমি বেনথামের (১৭৪৮-১৮৩২) রচনাবলী , উইলিয়াম গডউইনের (১৭৫৬-১৮৩৬) Political Justice ; মেরি ওল্‌স্টনক্র্যাফটের (১৭৫৯-'৯৭) A Vindication of the Rights of Women ; ম্যালথাসের (১৭৬৬-১৮৩৪) Essay on the Principle of Population ; ডেভিড রিকার্ডোর (১৭৭২-১৮২৩) Principles of Political Economy ; মেকলের (১৮০০-'৫৯)

রচনাবলী এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-'৭৩) প্রভৃতির রচনাবলী ইংরেজী রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক্স্ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইংরেজী সাহিত্যে এ-সব গ্রন্থের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোঁতেস্কিয়োর (১৬৮৯-১৭৫৫) L' Esprit des Lois ; রুশোর (১৭১২-'৭৮) 'সামাজিক চুক্তি', ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ও দিদেরো (১৭১৩-'৮৪) প্রভৃতি চিন্তানায়কদের রচনা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে। ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) 'দি প্রিন্স' যুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজা প্রজাদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী—'দি প্রিন্স'-এ এই মতবাদ প্রচার করা হয়েছে। শাসন করবার জন্য রাজা ছল-চাতুরী, অত্যাচার, পীড়ন ইত্যাদি যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিবাদীরা ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক। কার্ল মার্কসের (১৮১৮-'৮৩) 'ক্যাপিট্যাল' পৃথিবীর প্রভাবশালী গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের জীবন ও চিন্তা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

উপরে আমরা রাজনৈতিক সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম করেছি। এ সব বইয়ে রাজনীতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোনো কোনো লেখক রাজনীতি আলোচনা করলেও তাঁদের রচনা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করতে এ সব গ্রন্থের দান অপরিসীম। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর অনেক লেখক উপরোক্ত এক বা একাধিক গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, এবং তাঁদের রচনার মধ্যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উইলিয়ম গডউইনের রাজনৈতিক ভাবনা শেলীর (১৭৯২-১৮২২) রচনাকে কত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তার ইতিহাস ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকের অজানা নেই।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়বার পর থেকে জীবনের সামগ্রিক ছবির অঙ্গ হিসাবে রাজনীতি সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক আবহাওয়ার আভাস দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রবন্ধ সাহিত্যেও রাজনীতির প্রভাব কম নয়। হুকার (১৫৫৪-১৬০০) থেকে বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) পর্যন্ত ইংরেজী প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর বহু নিদর্শন

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। যে-সব লেখক কোনো রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাবান নন, রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যাঁদের যোগ নেই, তাঁদের রচনায় রাজনীতির আবির্ভাব নৈর্ব্যক্তিক। রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সুতরাং পাত্র-পাত্রীর জীবনের পটভূমিকা হিসাবে রাজনীতির কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। লেখক কোনো বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলে শিল্পীসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতার মাত্রা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে।

ডিফো (১৬৫৯-১৭৩১), ফিল্ডিং (১৭০৯-'৫৪), ডিকেন্স (১৮১২-'৭০), থ্যাকারে (১৮১১-'৬৩), ওয়েলস্ (১৮৬৬-১৯৪৬), গল্সওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩) প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসকে রাজনৈতিক ও সামাজিক, এই দুই ভাগে সুস্পষ্টরূপে ভাগ করা চলে না। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেই রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। কোথাও রাজনীতি প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদ এঁদের কাহিনী ও পাত্র-পাত্রীকে আচ্ছন্ন করেনি। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ রাজনীতিবিদ এবং ঔপন্যাসিক বেন্‌জামিন ডিস্‌রায়েলির (১৮০৪-'৮১) কাহিনীগুলি এর ব্যতিক্রম। তিনি 'ইয়ং ইংলণ্ডে'র রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের জন্য উপন্যাস লিখেছেন বলে ধারণা হয়।

স্তাঁদল (১৭৮৩-১৮৪২) আধুনিক মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। রাজনৈতিক পটভূমিকায় শিল্পসমৃদ্ধ উপন্যাস রচনা যে সম্ভব তা-ও তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তাঁর "লাল-কালো" উপন্যাসটি প্রচারধর্মী না হয়েও ফ্রান্সের রাজনৈতিক আবর্তের সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। সামরিক শক্তির সহায়তায় নেপোলিয়নের উচ্চাশা পূরণের অভিপ্রায়ের প্রতীক হল লাল রঙ্। কালো হল চার্চের প্রতীক, যে শক্তির প্রতি লেখকের ছিল অপরিসীম অবজ্ঞা। রাষ্ট্রের কাঠামো এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যক্তির জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকলাপ কত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে, নায়ক জুলিয়েন সোরেলের কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তাঁদলের পূর্বে এ জাতীয় উপন্যাস লেখা হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উপন্যাসে রাজনৈতিক পরিবেশের

আবির্ভাব প্রায় সাধারণ লক্ষণে পরিণত হয়। সুতরাং পৃথকভাবে কোনো লেখকের রচনার আলোচনার চেষ্টা নিষ্ফল।

ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও রাজনৈতিক অনুভূতিকে যাঁরা স্থান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মিল্টন (১৬০৮-'৭৪), পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪), ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০), বার্নস (১৭৫৯-'৯৬), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), শেলী (১৭৯২-১৮২২), হুইটম্যান (১৮১৯-'৯২) প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। বার্নস ইংরেজী সাহিত্যের ভাণ্ডার দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন ও শেলীর রচনায় আমরা ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখতে পাই। এঁরা তিনজনেই স্বাধীনতার পূজারী। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভেনিসের পতনের কথা স্মরণ করে শোক প্রকাশ করেছেন, বায়রন গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন; শেলী বন্দী প্রমিথিয়ুসের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, এঁরা কেউ ভারতের স্বাধীনতা হরণের বেদনা অনুভব করেননি। অন্তত তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ত তাঁদের কবিমানস স্বদেশের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাই হয়ত যেখানে জাতির স্বার্থ জড়িত নেই সেখানেই এঁদের স্বাধীনতাপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এঁরা কেউ ভারতের পরাধীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেননি।

নাটকেও আমরা রাজনীতির প্রভাব দেখতে পাই। সফোক্লিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪০৬), অ্যারিস্টোফেনিস (আঃ ৪৫০-৩৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ), সেক্সপীয়র (১৫৬৪-১৬১৬), বার্নার্ড শ' এবং তাঁর পরবর্তীকালের নাট্যকাররা রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এবং রাজনৈতিক মতবাদ নাটকে প্রয়োগ করেছেন। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ জনসাধারণের নিকট প্রচার করতে নাটকই সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে।

উপরে আমরা প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলেছি। বর্তমান শতকে আমাদের জীবনে, এবং তার ফলে সাহিত্যে, রাজনীতির প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত আমরা ছিলাম মূলত সামাজিক জীব। ব্যক্তি ও পরিবার ছিল সেই সমাজের ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সে পরিবর্তনটা সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পর থেকে। ছিলাম সামাজিক, হয়ে উঠেছি রাজনৈতিক জীব; না হয়ে উপায় কি? গণতন্ত্রের প্রসার ও সাফল্য প্রত্যেক নাগরিকের রাজনীতি-সচেতনতার উপর নির্ভর করে। সংবাদপত্র ও রেডিও ঘরে ঘরে রাজনীতির কথা পৌঁছে দেয়। শুধু রাজনীতি নয়, গোষ্ঠীগত রাজনীতি। এক রাষ্ট্রের মধ্যে নানা রাজনৈতিক দল; গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পৃথক পৃথক দল ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচীর প্রয়োজন। সে প্রয়োজন একটি নির্বাচনে শেষ হয়ে যায় না; তাকে জিইয়ে রাখতে হয় পরবর্তী নির্বাচনের জন্যও। সুতরাং রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রভাব এড়িয়ে থাকা যায় না।

শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেশের অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সাংস্কৃতিক জীবনেও তাদের প্রভাব অপ্রতিহত। সাহিত্য ও শিল্পের স্বীকৃতি এবং পুরস্কার বহুক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিস্তার অনুসারেই হয়ে থাকে। পাস্তেরনাক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং পুরস্কার পেয়েও তা গ্রহণ করতে পারেননি রাজনৈতিক কারণে। পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করা এবং পাস্তেরনাকের তা গ্রহণ করতে না পারবার রাজনৈতিক কারণ দুটি অবশ্য পরস্পরবিরোধী।

দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্তত•রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যে সে সম্পর্ক প্রভাবান্বিত করে সে বিষয়ে ভুল নেই। পৃথিবীর মানচিত্র কার্যত রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা বিভক্ত। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ যদি এক না হয় তাহলে সাংস্কৃতিক মিলনের পথটাও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পূর্বে কিন্তু এমন ছিল না। যুদ্ধের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা চরমে উঠত। যুদ্ধ থেমে গেলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব স্থাপিত হত। এখন বিরোধটা রাজনৈতিক আদর্শ কেন্দ্র করে হয় বলে সর্বদাই তা বেঁচে থাকে। সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে করতে মানুষ এক দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই লড়াই থামে। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বের তো শেষ নেই। নিছক রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত সাধারণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক শিথিল করে। যুদ্ধের সঙ্গে যাদের যোগ নেই, সরকারের নীতি নির্ধারণে যাদের হাত নেই, সংবাদপত্র ও রেডিওর মাধ্যমে এই সংঘর্ষ তাদের মনও বিষিয়ে তোলে।

রাজনীতির এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে সমকালীন সাহিত্য মুক্ত থাকবে এমন আশা করা যায় না। এবং তা থাকেওনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর

বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ পরস্পরের যত নিকটে এসেছে, এবং তাদের মধ্যে যেমন প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধেছে, পুর্বে তার সুযোগ কখনো হয়নি। তাই সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাবটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এমন বেশী করে প্রকট হয়ে উঠেছে। এখনকার সাহিত্যে মানুষের মৌলিক সম্পর্ক ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ছে ; মানবতার উদার আকাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে কথাসাহিত্যের পাত্র-পাত্রী এবং কবির হৃদয়ানুভূতি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

উনিশ শতকের সাহিত্যে রাজনীতি ছিল পশ্চাৎ পটে, এখন রাজনীতি এসেছে সামনে। রাজনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষ উপন্যাস-সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশে প্রাধান্য লাভ করেছে। এর ফলে উপন্যাসে জীবনের বিস্তারকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। সাহিত্যে রাজনীতি আমদানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে হয়ত এই জন্যই।

রাজনীতির প্রাধান্য সাহিত্যের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্তিত করতে পারে তার অনন্য উদাহরণ আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য। রাজনীতির সঙ্গে রাশিয়ান সাহিত্যের সম্পর্ক আজকের নয়। যে প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার জন্ম তাতে রাজনীতির সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে সে দেশের নাগরিকদের মুক্ত হওয়া কঠিন। অন্তত দীর্ঘকাল পার না হলে রাজনীতির প্রভাব হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। তার পুর্বে, উনিশ শতকেও, রাশিয়ার লেখক ও পাঠক রাজনীতি ভুলে থাকবার সুযোগ পায়নি। জারের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল সংঘর্ষের বীজ। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপনের সুযোগ জারের আমলে পাওয়া যায়নি। সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গগোল (১৮০৯-'৫২), টুর্গেনিভ (১৮১৮-'৮৩), টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) দস্টয়েভস্কি (১৮২১-'৮১) প্রভৃতি লেখকের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েট সাহিত্য বহুলাংশে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছে। অন্তত সরকারী দৃষ্টিকোণকে অগ্রাহ্য করা সহজ নয় আধুনিক লেখকদের। 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' নীতি সোভিয়েট রাশিয়া ত্যাগ করেছে। বিপ্লবের আদর্শ সম্বন্ধে পাঠকদের সচেতন করে তোলাই লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য। গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), ব্লক (১৮৮০-১৯২১), মায়াকোভস্কি (১৮৯৪-১৯৩০), শলোকভ (১৯০৫-), ইলিয়া এরেনবুর্গ (১৮৯১-) ও অন্যান্য লেখকরা প্রধানত এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই লিখেছেন। এমন ধারণা করা অবশ্য ভুল হবে যে সোভিয়েট লেখকরা শুধু প্রচার সাহিত্যেরই সৃষ্টি করেছেন।

প্রচারের ঊর্ধ্বে শিল্পমণ্ডিত রচনাও আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। তবে তার সংখ্যা কম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া এক সম্পূর্ণ নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করেছে।

এই পরীক্ষা রাশিয়ার বাইরেও শুরু হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠিত হবার পর মার্কসবাদ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দেয়। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের গোড়া থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা আরম্ভ হওয়ায় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকেই মার্কস্‌বাদের সমর্থক হয়ে পড়েন। য়ুরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে তরুণ লেখকরা মার্কস্‌বাদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। মার্কস্‌বাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে লেখকদের দৃষ্টি পড়েছে সমাজের নীচু তলার মানুষের উপর। অবশ্য মার্কস্‌বাদের প্রসারের পূর্বে ঊনবিংশ শতকেও দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি অনেক লেখকেরই গভীর সহানুভূতি ছিল। শ্রীমতী গ্যাসকেল, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, ভিক্টর হিউগো, হ্যারিয়েট বীচার স্টো প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান শতকে যাঁরা প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ম্যাক্সিম গোর্কি, সিয়ান ও'কেসি, লিয়াম ও'ফ্লাহার্টি, আলেকজান্দার নেক্সো, জন দ্যসপ্যাসাস্‌, বারবুস্‌, আঁদ্রে মালরো, আরউইন শ', স্টীফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতি। মালরোর Mans' Fate, ক্লিফোড ওদেতের Waiting for Lefty, স্টেইনবেকের In Dubious Battle ও The Grapes of Wrath, গোর্কির Lower Depths প্রভৃতি নাটক ও উপন্যাস এ যুগের প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

গণতন্ত্রের প্রসার অপ্রত্যক্ষরূপে সাহিত্যকে অন্য এক দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। গণতন্ত্র যেমন রাজনৈতিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করে, তেমনি প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলাও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। গোষ্ঠীর সীমার মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করবে, তার সুখ-দুঃখের কথা অন্য সবাইকে শোনাবে। এ জন্যই আজকাল রম্যরচনা ও জীবনী-সাহিত্যের এত প্রাচুর্য। সাহিত্যের এ দু'টি শাখার বিকাশ বিশেষ করে গণতন্ত্রের দান জীবনী পূর্বেও লেখা হত। তা ছিল ধর্মগুরু, সম্রাট, বীর যোদ্ধা প্রভৃতির জীবনী। সাধারণ লোকের জীবনের তুচ্ছ ঘটনা পড়বার আগ্রহ কারো ছিল না। য়ুরোপ আমেরিকার বর্তমান জীবনী-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে কত অখ্যাত লোকের

আত্মকথা প্রকাশিত হচ্ছে। যার জীবনী তার সামাজিক মর্যাদা পাঠক বিচার করে না। বিচার করে রচনার সাহিত্য-মূল্য। সাহিত্যগুণ থাকলে জীবনীর কাটতি হবে,—কেরানী, নার্স, মজুর, যার জীবনের কথাই হোক না কেন। রম্যরচনার বেলাতেও ঠিক তেমনি। মানুষের মনে সাধারণ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যে অনুভূতির ঝলক দেখা দেয় তাকেই আজ সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, এবং পাঠকরা যে তা আগ্রহ করে পড়বে, একথা আগে কে ভাবতে পারত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার মনের সাধাবণ অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনাগুলিও মর্যাদা পেয়েছে।

বর্তমান শতকের যে-সব লেখক বাশিয়ার বাইরে রাজনীতিকে তাঁদের রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে লুই আরাগঁ (১৮৯৭-), পাবলো নেরুদা (১৯০৪-), মালরো (১৮৯৫-), লরকা (১৮৯৯-১৯৩৬), কোয়েস্‌লার (১৯০৫-), সিলোনে (১৯০০-) হাওয়ার্ড ফাস্ট (১৯১৪-) জঁা-পল সারত্‌র্ (১৯০৫-), প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের রচনার ধারা অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে। যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের রচনার ধারা বিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বে সে বিবর্তন হত শিল্পের ধারা অনুসবণ করে, এখন হয় রাজনীতির পথ চেয়ে। লেখকেব রাজনৈতিক মতবাদ পরিবর্তিত হলে লেখাও বদলে যায়।

বা লা সাহিত্যেও রাজনীতির প্রভাব পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় রাজনীতির প্রভাব কম নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে ও রাজনৈতিক আলোচনা যথেষ্ট দেখতে পাই। তবে আমাদের সাহিত্যের যে রাজনীতি তা সাধারণত গোষ্ঠীগত নয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোনো গোষ্ঠীব নয়, এ আকাঙ্ক্ষা সকলের। তাই রাজনীতি সাহিত্যে যে গোষ্ঠী-প্রীতির জন্য দায়ী বাংলা সাহিত্যে এখনো তা প্রকট হয়ে ওঠেনি।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের জন্য জীবনের খণ্ডিত ছবি সাহিত্যে পরিবেশন করলে পাঠক ক্ষুব্ধ হয়। রাজনীতির বিরুদ্ধে সেই কারণেই অভিযোগ উঠেছে। জীবনের পটভূমি হিসাবে যদি রাজনীতি সাহিত্যে স্থান লাভ করে তাহলে পাঠকের রসোপলব্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে না এবং রাজনীতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া সহজ হবে।

সমকালীন সাহিত্যে ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠী

সাহিত্যের ধারা এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলে। মূল ধারা ছিন্ন না হলেও প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। বর্তমান শতকের সাহিত্যেরও আছে। তা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দীর প্রভাব থেকে সমকালীন সাহিত্য মুক্ত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বাস্তবতা। ঐ শতকেই রোমান্টিসিজমের পাশাপাশি জীবনের বাস্তব চিত্র সাহিত্যে স্থান লাভ করে। জীবনের বাস্তব চিত্র প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব খণ্ড-চিত্র। বাস্তব জীবনকে উপন্যাসে প্রথম শিল্পরূপ দেবার কৃতিত্ব স্তাঁদলের (১৭৮৩-১৮৪২)। তারপর বালজাক, ফ্লোবেয়ার, ডিকেন্স, থ্যাকারে, দস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ প্রভৃতি লেখকরা বাস্তববাদী সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। জোলা ও তার অনুগামীরা বাস্তববাদকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিলেন। এঁদের বলা হত ন্যাচারালিস্ট।

প্রতীকীবাদ বিগত শতকের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ফরাসী পার্নাসিয়ান কবিদের রচনায় প্রতীকের ব্যবহার উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রতীক প্রয়োগের প্রাধান্য দেখতে পাই স্তেফান মালার্মে, পল ভার্লেন ও অন্যান্য কবির কাব্যে। অবক্ষয়ধর্মী সাহিত্যের আবির্ভাবও উনবিংশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করেছে। এডগার অ্যালান পো, বোদলেয়ার, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আরো অনেক শক্তিশালী লেখক জীবনে অবক্ষয়ের দিকটা উপস্থিত করেছেন তাঁদের রচনায়।

বর্তমান শতাব্দীর সাহিত্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত আরো দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একটি কার্ল মার্কসের প্রভাব, আর একটি ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের সূত্র ধরে উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর হৃদয়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশকে উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস। কার্ল মার্কসের জন্ম ও মৃত্যু যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে, সাহিত্যে সাম্যবাদের প্রভাব বর্তমান শতকেই শুরু হয়েছে। তৃতীয় দশকে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ায় সকল দেশেই সাম্যবাদ প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। রাশিয়ার বাইরে অন্য দেশের সাহিত্যে কম্যুনিজমের প্রভাব তখন থেকেই ক্রমশ বাড়বার সুযোগ এসে যায়।

আমাদের মনের জগৎ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের আবিষ্কার সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন

প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাকাব্যের যুগ থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ বাইরের ঘটনারই প্রাধান্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো লেখক মনোবিজ্ঞানমূলক কাহিনী রচনা করলেও মনের জগৎ যে কত জটিলতাপূর্ণ এবং তার প্রভাব ব্যক্তির জীবনের উপর যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী সে সম্বন্ধে পূর্বে ধারণা ছিল না। ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমকালীন সাহিত্যে এনেছে অন্তর্মুখীনতা। বাইরের জগতের পরিবর্তে মনের জগৎ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাবতাত্ত্বিক (ideological) রচনার প্রাচুর্য সমকালীন সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। পূর্বে সাহিত্য রচিত হত প্রধানত আনন্দের জন্য। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'ই ছিল লক্ষ্য। জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চিন্তাকে সাহিত্যে রূপ দেবার তাগিদ লেখকরা অনুভব করেননি। জীবনে তখন জটিলতা ছিল না। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে ভাবনার সংঘাত দেখা দেবার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। সমাজের উপরতলার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় ভাবনার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

এখন এই গণতন্ত্রের যুগে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের ভালো মন্দ সম্বন্ধে ভাবনার দায়িত্ব সকল নাগরিকের। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পার্টি সিস্টেম অপরিহার্য। আর প্রত্যেক পার্টিরই থাকে একটি ভাবাদর্শ, যা দলবৃদ্ধিতে এবং কর্মপন্থা সফল করতে সহায়ক হবে। যাতায়াত সহজ হওয়ায় এবং সংবাদ পত্র ও রেডিওর মারফত পৃথিবীর সকল দেশের চিন্তা-ভাবনা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সে বিতর্ক ও বিরোধ থেকে মননশীল ব্যক্তি দূরে থাকতে পারেন না। সুতরাং ভাবতন্ত্রের কাঠামো অবলম্বনে সাহিত্য রচনা যুগজীবনের সঙ্গে তাল রেখেই চলছে। আমাদের জীবন যখন নানা আদর্শের গণ্ডিতে খণ্ডিত হয়ে পড়েছে তখন সাহিত্যে যে তার প্রতিফলন দেখতে পাব তাতে আর বিচিত্র কী!

সমকালীন সাহিত্যে যে কটি ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠী দেখা যায় তাদের মধ্যে ক্যাথলিক আদর্শের পুনরুজ্জীবনে আস্থাশীল লেখকদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। কারণ বর্তমান জীবনের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের উপর মানুষের যে আস্থা ছিল সেই বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা এই গোষ্ঠীর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুবাদী সভ্যতা যখন আমাদের হতাশ

করেছে তখন ধর্মের পথে হয়ত শান্তি ও সফলতা আসবে। এঁরা বর্তমান শতকের মূল বৈশিষ্ট্যকে আক্রমণ করে তার সমালোচনা করেছেন।

ক্যাথলিক রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত বিংশ শতকের প্রথম থেকে হলেও প্রকৃত শক্তি অর্জন করেছে ১৯১৪ সাল নাগাদ। ক্যাথলিক আদর্শের পুনরুজ্জীবনের তাগিদ প্রথম আসে ফ্রান্স থেকে। ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক ও পল ক্লদেল—এই দু'জন ফরাসী লেখক—ক্যাথলিক আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেছেন। অনেকের অভিমত এই যে, মোরিয়াক বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক। মোরিয়াক নিপুণ কাহিনীকার; মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসই বোর্দো অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। বোর্দো তাঁর জন্মস্থান। মোরিয়াকের চোখ দিয়ে বোর্দোতে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক লোক দেখা যায় না। সেখানে এমন সব মানুষের বাস যাদের আত্মার 'পতন' হয়েছে, যারা জীবনের মহৎ আদর্শ ত্যাগ করে পাপের ঘৃণ্য পরিবেশের মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে বাস করছে। মোরিয়াকের উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি জীবনে পাপের দিকটা বড করে দেখেছেন। তাঁর নায়করা সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই জীবন আরম্ভ করে। তীব্র তাদের হৃদয়ানুভূতি। তারপরে একদিন দেখা হল নায়িকার সঙ্গে। মনে হয় একে না পেলে জীবন ব্যর্থ হবে। অথচ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ বিবাহ অর্থ ই হল দেহের সম্পর্ক। দেহজ প্রেমের প্রতি মোরিয়াকের নায়কদেব তীব্র আকর্ষণ থাকলেও বিবেক বলে·এটা পাপ। এই পাপবোধেব জ্বালা থেকে সে মুক্তি পায় না। দেহের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণেব দ্বন্দ্বে নায়কের জীবন বিক্ষুব্ধ হয়। পরিণামটা দেখা দেয় দু'রকমে। কোথাও নায়ক সংসার ত্যাগ করে চলে যায়, কোথাও বা সে দেহের আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করে হারিয়ে যায়। মানবদেহ মোরিয়াকের নিকট বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতারও প্রতীক। 'দি কিস টু দি লেপার' উপন্যাসে মোরিয়াকের প্রেম ও জীবন সম্বন্ধে মূল বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে।

ফরাসী কবি ও নাট্যকার পল ক্লদেল যে শুধু মৌলিক ক্যাথলিক আদর্শে বিশ্বাসী তাই নয়, ক্যাথলিক ধর্মের নানাবিধ সংস্কারেও আস্থাশীল। মোরিয়াকের তুলনায় তিনি অনেক বেশী গোঁড়া ক্যাথলিক লেখক। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি টাইডিংস্ ব্রট টু মেরি' মধ্যযুগের পটভূমিকায় রচিত। এই নাটকে মধ্যযুগ-

সুলভ পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব এবং অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। ক্লদেলের কোনো কোনো কবিতা বাইবেলের অংশবিশেষের কাব্যরূপ মাত্র।

ক্লদেল মোরিয়াকের মতো পিউরিটান নন। দেহ তাঁর কাছে পাপের কেন্দ্র-ভূমি নয়। নীতিশাস্ত্র নির্ধারিত জীবন-যাত্রার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াই তাঁর নিকট পাপ।

ক্লদেল বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টির ক্ষমতা ঈশ্বরের দান। এই ঐশ্বরিক শক্তি ভাগ্যক্রমে যিনি পেয়েছেন তাঁর ধর্মের পথেই চলা উচিত।

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে ক্যাথলিক আদর্শ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁদের পুরোধা জি. কে. চেস্টারটন। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাকে ক্যাথলিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং ১৯২২ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গ্রেট ব্রিটেন ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে ভুল করেছে। চেস্টারটনের রচনায় ক্যাথলিক নীতিবাদ ও রূপকের প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁর সুপরিচিত উপন্যাস 'দি ম্যান হু ওয়াজ থার্সডে' পাপ-পুণ্য, ধর্ম ও চার্চ প্রভৃতির কথা দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। চেস্টারটনের নীতিবাদ পাঠকের অনেক সময় ভালো না লাগলেও রচনার গুণে শেষ পর্যন্ত পড়া যায়।

ঔপন্যাসিক ইভ্‌লিন ও' (Waugh) রক্ষণশীল ক্যাথলিক। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ধর্ম উপেক্ষা করবার ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে যে ভাঙন ধরেছে ও' তারই ছবি এঁকেছেন অধিকাংশ উপন্যাসে। বর্তমান যুগের নীতি-হীনতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতার তিনি কঠোর সমালোচক। আমরা যে ভাঙনের পথে অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছি একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থাই তা প্রতিরোধ করতে পারে। 'ভাইল বডিস' এবং 'ব্রাইডস্‌হেড রিভিজি-টেড' উপন্যাস দু'টিতে ও' (Waugh)-এর মূল চিন্তাধারার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে।

টি. এস. এলিয়টও ক্যাথলিক আদর্শের পক্ষপাতী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর কবিতাব বিষয়বস্তু। ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের 'হলো ম্যানে'র কথা এনে তিনি আধুনিক কবিতায় যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন।

আলডুস হাক্সলি ক্যাথলিক আদর্শে বিশ্বাসী নন। কিন্তু তিনিও ক্যাথলিক লেখকদের মতো আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কঠোর সমালোচক। একালের

বুদ্ধিজীবীদের বিজ্ঞান ও তথাকথিত প্রগতির উপর অত্যধিক আস্থা এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি সংশয় তাঁকে ব্যথিত করে। আমরা আত্মার সম্পদকে হারিয়েছি এরোপ্লেন, আণবিক শক্তি, রেডিও, টেলিফোন, ভিটামিন বড়ি প্রভৃতির বিনিময়ে। আত্মার অধঃপতন প্রতিরোধের জন্য তিনি ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে শক্তির সন্ধান করেননি। তিনি প্রাচ্যের দর্শন, ধর্ম ও মিস্টিসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

সমকালীন সাহিত্যের ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুচিহ্নিত হল মার্কস্‌বাদী গোষ্ঠী। বিগত শতাব্দী পর্যন্ত আমরা ছিলাম প্রধানত সামাজিক জীব, এখন আমরা হয়ে উঠেছি রাজনৈতিক জীব। রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বর্তমানে কোনো নাগরিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্রে নায়কের জীবন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেখানে রাষ্ট্রকে এবং রাজনীতির আদর্শকে ভুলে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কল-কারখানার প্রসারের ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই তীব্র স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কসের দর্শন সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছে। নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রামই আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। মার্কসের দর্শন অনুসারে এখন প্রোলিটারিয়েট ও ক্যাপিটালিস্টের মধ্যে সেই সংগ্রাম চলছে। বিত্তহীনের দল একদিন শক্তির অধিকারী হবে। পৃথিবীতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই মার্কসবাদীর আদর্শ।

এই আদর্শ যাতে সত্য হয়ে ওঠে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখকরা তার জন্য সচেষ্ট। 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই নীতি তাঁদের পক্ষে অচল। বিত্তহীনদের মনে আশার সঞ্চার করতে হবে, শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে তারা যেন সচেতন থাকে তার দায়িত্বও লেখকদের। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ গৌণ, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শই মুখ্য।

১৯১৭ সালের পর থেকে রাশিয়ায় এই বিশেষ গোষ্ঠীর লেখকরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। এই পরীক্ষা কতদূর সফল হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত অভিমত দেবার সময় এখনো আসেনি। সেন্সরের আশঙ্কা এবং সরকারের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে নীতির অনিশ্চয়তা লেখকদের শিল্পসমৃদ্ধ রচনা সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাশিয়ায় পাস্তেরনাকের 'ডাঃ জিভাগো' কিরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছে তা আমরা জানি। নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও গোর্কি, শলোকভ ও অন্য

কয়েকজনের রচনা রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান সাহিত্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ এখনও দেখা যায় না।

রাশিয়ার বাইরেও অনেক লেখক মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইগনাৎসিও সিলোনে, আঁদ্রে মালরো, আর্থার কোয়েসলার প্রভৃতি লেখকদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মালরো দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক উপন্যাসও কত সুন্দর করে লেখা হতে পারে। এঁরা তিনজনই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং কম্যুনিজমের প্রতি ছিল তাঁদের পক্ষপাতিত্ব। এঁদের বিশ্বাস ছিল, একনায়কত্বের বিভীষিকা প্রতিরোধ করবার একমাত্র অস্ত্র হল কম্যুনিজম। কিন্তু এখন এঁদের সকলেরই সেই বিশ্বাস শিথিল হয়েছে। কোনো কোনো মার্কসবাদী লেখক কম্যুনিজমের উপর আস্থা হারিয়ে গ্রহণ করেছেন উদারনৈতিক আদর্শ।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ খ্যাতনামা লেখকই উদার সমাজতান্ত্রিক ভাবতত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁরা মানবতাবাদী, সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরোধী এবং তাঁদের অধিকাংশ রচনা ধর্মনিরপেক্ষ। এ সব লেখক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনা করেন; সাধারণ নাগরিক আরো বেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে,—এই তাঁদের দাবি। সাধারণ লোকের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করবার তাঁরা পক্ষপাতী। মার্কসবাদী লেখকরাও সাধারণ লোকের কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু তাঁদের কল্যাণ একটি নির্দিষ্ট সংকীর্ণ পথেই আসতে পারে। উদারপন্থী লেখকদের কল্যাণের আদর্শ কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

মানবতাবাদ মহৎ সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। এই একটি লক্ষণের সূত্র আলোচ্য গোষ্ঠীকে অতীতের প্রধান প্রধান লেখকদের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক আনাতোল ফ্রান্স। সমসাময়িক সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিদ্রূপ করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথাকথিত নীতিবাদের মিথ্যা গৌরব, গির্জার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ এবং সেনাবিভাগের ঔদ্ধত্য তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ড্রেফুসের সমর্থক হিসাবে ফ্রান্সের সেনা ও বিচার বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর রূপক কাহিনী 'পেঙ্গুইন আয়ল্যাণ্ড'-এ স্বদেশের রাজনীতি ধর্ম ও শিল্পকলার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছেন।

বিদ্রোহের আতিশয্যকেও তিনি পছন্দ করতেন না। এর প্রমাণ পাই 'দি গডস আর অ্যাথার্স্ট' উপন্যাসে। সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ছিল তাঁর কাম্য। ফ্রান্সের সকল বিদ্রূপ ও কঠোরতার অন্তরালে ছিল গভীর মানবপ্রীতি। তাঁর সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস 'দি ক্রাইম অব সিলভেস্ত্রে বোনার্দ' গভীর মানবতাবোধের নিদর্শন।

রোমাঁ রোলাঁ অনুভূতিপ্রবণ উদারপন্থী। তার উদারতা শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক নয়, তাঁর উদারতার পশ্চাতে ছিল বৃহত্তর আদর্শবাদ। তিনি য়ুরোপ বা আমেরিকার মধ্যেই তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে ক্ষান্ত হননি। প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতিও ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন। শান্তিবাদে রোলাঁর ছিল অবিচল আস্থা। শান্তিবাদ প্রচারের জন্য প্রথম মহা-যুদ্ধের সময় তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁর মত পরিবর্তন হয়নি। মানবিকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তিবাদের আদর্শ রোলাঁর এপিক উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মূল কথা।

বার্নার্ড শ'র রচনায় যদিও আমরা এই গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সবই দেখতে পাই তথাপি তাঁকে হয়ত কোনো গোষ্ঠীর ছায়া দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি নিজেই একটি গোষ্ঠী। প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, বিবাহ, নৈতিক আদর্শ, দানশীলতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে চিরাগত সংস্কার আমাদের অন্ধ করে রেখেছে তাকে তিনি শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য হিসাবে সাহিত্য-জীবনের প্রথম থেকেই শ' সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত গণতন্ত্রে আস্থাবান ছিলেন না। রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষিত 'সুপারম্যানদের' হাতে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে,—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

এচ. জি. ওয়েলসও ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য ছিলেন। সমাজবাদে তাঁর বিশ্বাস থাকলেও শ'র মতো তিনি প্রচারক হয়ে ওঠেননি। মানব সমাজের যে ভবিষ্যৎ তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন তার মধ্যে কল্পনার প্রাধান্য দেখা যায়। একমাত্র 'অ্যান ভেরোনিকা'র কাহিনীতে ওয়েলস সমসাময়িক সমাজের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। শেষ জীবনে ওয়েলস সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শান্তিবাদের

উপরও আস্থা রাখতে পারেননি তিনি। গভীর নিরাশাবাদের অস্বস্তি নিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক আপ্টন সিনক্লেয়ার তাঁর কাহিনীকে বিশেষ একটি তত্ত্বের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা; ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারের ফলে সাধারণের দুর্দশা, এবং পুঁজিপতিদের বৃহত্তর সমাজকে বঞ্চিত করে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের উপর আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি কু-ব্যবস্থাকে উপন্যাসের মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দি জাঙ্গল' উপন্যাসে আছে চিকাগো শহরের মাংস-প্যাকিং শিল্পে দুর্নীতির চিত্র; 'কিং কোল' ও 'অয়েল' উপন্যাস দু'টিতে যথাক্রমে কয়লা ও তৈল শিল্পের কথা। আপটন সিনক্লেয়ারের রচনায় সর্বত্র মানবপ্রীতি পরিস্ফুট।

অনেক লেখক এবং দার্শনিক জীবনের কোলাহল থেকে একটি সত্য আবিষ্কার করবার জন্য ব্যগ্র। যা সত্য বলে উপলব্ধি করেন অন্ধের মতো একমাত্র তাকেই অবলম্বন করে পথ চলতে তাঁরা উৎসুক। প্রচলিত সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যদি তাঁদের অনুমোদন লাভ না করে তাহলে এদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের তাঁরা পক্ষপাতী। কিন্তু আর একদল লেখক বলেন, সত্য এত সংকীর্ণ নয়। সবকিছুর মধ্যেই সত্য ছড়িয়ে আছে। সেই সত্য উপলব্ধি করবার মতো ঔদার্য থাকা চাই। তা ছাড়া চরম সত্য বলে কিছু তো নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্যোপলব্ধির পার্থক্য ঘটে। একজনের কাছে যা সত্য অন্যের কাছে তা সত্য না-ও হতে পারে। সুতরাং সত্য পারস্পরিক সম্পর্ক সাপেক্ষ।

সাহিত্যে এই ভাবতাত্ত্বিক আদর্শ যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আঁদ্রে জিদ ও লুইগি পিরান্দেলোর নাম উল্লেখযোগ্য। আঁদ্রে জিদ যে বিচিত্র মত ও রূপের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছেন তার প্রমাণ তাঁর রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রথম জীবনে তিনি প্রতীকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তারপর এল রূপকের প্রাধান্য; ধর্ম, নীতি ও রাজনৈতিক মতবাদও বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বকে জিদ রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আত্মা ও দেহ, ব্যক্তি ও সমাজ, ঈশ্বর ও শয়তান এই সংঘাতের নায়ক। জিদ এদের কাউকেই চরম সত্য বা চরম অসত্য বলে ঘোষণা করেননি। 'দি ইম্মর‍্যালিস্ট' উপন্যাসের কাহিনী থেকে জিদের জীবনদর্শন সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। নায়ক মিচেল স্ত্রীর জীবনের বিনিময়ে ক্ষয়রোগ থেকে মুক্তি

পেল। সে ভালো হয়ে উঠল; স্ত্রী সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। স্ত্রীর জন্য শোক করবার পরিবর্তে মিচেল জঘন্য উপায়ে যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করবার পথ অবলম্বন করল। এজন্য তার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। তার বিশ্বাস: I feel nothing in myself that is not noble. জিদের 'দি কাউণ্টারফিটার্স'-এর মূল কথাও এই যে, সমাজে কি যে আসল, এবং কি যে নকল তা বলা কঠিন। সুতরাং সত্য-অসত্য সম্বন্ধে চরমভাবে কিছুই বলা চলে না।

সত্যের আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী আর একজন লেখক হলেন পিরান্দেলো। পিরান্দেলোর চোখে জীবন শুধু কতকগুলি ভ্রান্তির সমষ্টি। সাধারণ লোকের নিকট এরাই সত্যের মর্যাদা পায়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে এই সত্যের ফাঁকি ধরা পড়ে, তখনই জীবনে ট্র্যাজেডির আবির্ভাব ঘটে। সত্যের সঙ্গে সত্যের মুখোশের দ্বন্দ্ব পিরান্দেলোর নাটকের প্রিয় বিষয়বস্তু। কোনটি সত্য, কোনটি নয়, এই নিয়ে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে বিরোধ। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ বলে গৌরব অনুভব করে। কিন্তু পিরান্দেলো নিষ্ঠুর আঘাতে সেই ধারণা ভেঙ্গে দেন। দেখা যায় একজনের মধ্যে অনেক ব্যক্তিত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। সত্যের বেলাতেও তেমনি চরম একক সত্য বলে কিছু নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ফরাসী সাহিত্যে একটি শক্তিশালী নতুন ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেখকরা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী। জিদ ও পিরান্দেলোর মতে অস্তিত্ববাদীরাও এক চরম সত্যে আস্থাশীল নন। এঁরাও বলেন, "truth is subjective."

অস্তিত্ববাদ দর্শনের ইতিহাসে নতুন নয়। ড্যানিশ দার্শনিক কিয়েরকেগার শতাধিক বৎসর পূর্বে অস্তিত্ববাদের তত্ত্বকে প্রথম একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন হেগেলের যুক্তিবাদের বিরোধী। কিয়েরকেগার দেখিয়েছেন, সংসারের বহু ঘটনাই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। একান্ত অযৌক্তিক বা অ্যাবসার্ড ঘটনার সমষ্টিই হল আমাদের জীবন। কিয়েরকেগার তাঁর Either-or গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন।

দস্টয়েভস্কি কিয়েরকেগার না পড়েও অস্তিত্ববাদের মূল কথাটি তাঁর কোনো কোনো রচনায় গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ফরাসী সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ কেন প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তার বিশেষ একটি কারণ আছে। ফ্রান্স

য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। কিন্তু সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে বর্বরতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারল না। তাই ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন: "We and things in general exist and that is all there is to this absurd business called life." এই যুক্তিহীন অ্যাবসার্ড পৃথিবীতে একমাত্র বেঁচে থাকার অনুভূতিটাই সত্য। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ববোধটা তীব্রতর হবে। অস্তিত্ববাদীর নিকট সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামে জয়ের কোনো আশা নেই। তা জেনেও সংগ্রাম করে যেতে হবে। না হলে জীবন-বিরোধী শক্তিগুলি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

জাঁ-পল সারতর, আলবেয়ার কামু, সিমন দ্য বোভোয়ার, জঁ-আনুইয়্ গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রভৃতি লেখক অস্তিত্ববাদী। 'দি মিথ অব সিসিফাস' গ্রন্থে কামু অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। অস্তিত্ববাদী লেখকদের মধ্যেও অস্তিত্ববাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

ফ্রান্সের বাইরে অস্তিত্ববাদ প্রসার লাভ করেনি। অস্তিত্ববাদ নিরর্থক দুঃখময় সংগ্রামের কথাই বলে। জীবনের আশা ও আনন্দের ছবি অস্তিত্ববাদে স্বীকৃত হয়নি। এই নিরাশাবাদ অস্তিত্ববাদ প্রচারের পথে প্রধান অন্তরায়।

সমকালীন সাহিত্যের সমীক্ষার জন্য ভাবতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে। উপরে আমরা প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অন্তর্গত কয়েকজন মাত্র লেখকের নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো শক্তিশালী লেখককে একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা সকল ক্ষেত্রে হয়ত যুক্তিযুক্ত নয়। গোষ্ঠীর চেয়ে তাঁদের সৃষ্টি বড। তবে রচনার প্রধান লক্ষণগুলি থেকে এঁদের কোনো একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক বোধ হয় নির্দেশ করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাস্তবতা

কোনও একটি যুগের সাহিত্যকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা চলে না। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরবর্তী যুগের সাহিত্যের যোগাযোগটা অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা যুগের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে না। বিংশ শতকের সাহিত্যে একান্ত স্বাভাবিকরূপেই বিগত শতকের প্রভাব পড়েছে। কালের প্রভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফলে আধুনিক সাহিত্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা পূর্বে ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করেও বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল ধারা পূর্ববর্তী শতাব্দীর খাতেই বয়ে এসেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ব্যক্তিগত; অন্যটি ভাবগত। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক শতাব্দীর সীমানা অতিক্রম করে সাহিত্য সাধনা করেছেন। টলস্টয়, ইবসেন, চেকভ, হাউপ্টমান, ভেরগা, স্ট্রীণ্ডবার্গ, হার্ডি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমান যুগের প্রথমার্ধের অনেক লেখককে স্পর্শ করেছে। ভাবগত প্রভাবটা এর চেয়ে অনেক বেশী গভীর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান ভাবধারাগুলি অতি সহজেই শতাব্দীর কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম করে একালের সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল রিয়ালিজমের আবির্ভাব। যদিও রোমান্টিসিজমের আধিপত্য এই শতকের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, তথাপি ১৮৩০ সনে রিয়ালিজমের যে সূত্রপাত হয়, তা-ই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দান। ক্লাসিসিজম আঙ্গিকের উপর জোর দেয়; রোমান্টিসিজমের প্রেরণা স্বপ্ন ও কল্পনা; এবং জীবনের বাস্তব ছবি আঁকা রিয়ালিজমের আদর্শ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে কোনও এক যুগে কোনও একটি ধারা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে। তবে কোনও বিশেষ লেখকের রচনা কিংবা কোনও যুগের সাহিত্যকে ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম অথবা রিয়ালিজমের বিশুদ্ধ নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা যায় না। হোমারের কাব্যেও রিয়ালিজমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রোমান্টিক লেখকের মধ্যে রিয়ালিজম এবং রিয়ালিস্ট লেখকের

মধ্যে রোমান্টিসিজমের দৃষ্টান্তও সচরাচর মেলে। শাতোব্রিয়াঁ, মাদাম ছ স্তাল, ভিনি, ডুমা (বড়), হুগো, স্কট প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক লেখকরা উপন্যাসকে সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের পূর্বে গ্যেটেও তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন রোমান্টিকতাকে। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যেরও মূল প্রেরণা রোমান্টিসিজম। এই রোমান্টিক লেখকদের পাশাপাশি ছিলেন একদল বাস্তববাদী লেখক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকরা শুধু যে আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করেছেন তাই নয়; একে সমৃদ্ধ করে সাহিত্যের এক শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাখায় পরিণত করেছেন।

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদলকে (১৭৮৩-১৮৪২) আমরা প্রথম বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের গৌরব দিতে পারি। ১৮৩০ সনে প্রকাশিত 'লালকালো' উপন্যাসে তিনি সমসাময়িক ফরাসী সমাজের যেরূপ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন পূর্বে তা দেখা যায়নি। স্তাঁদল তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তাই সাহিত্যে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হতে বিলম্ব হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সমালোচক টেন (Taine) স্তাঁদলের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন: No one has taught us better how to open our eyes and see—চোখ খুলে জীবনকে কী ভাবে দেখতে হয় তা স্তাঁদলের মতো আর কেউ আমাদের শেখায়নি। চোখ খুলে দেখবার ক্ষমতাই বাস্তববাদী লেখকের সবচেয়ে বড শক্তি।

স্তাঁদলের পরে এলেন বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)। বালজাক 'হিউম্যান কমেডি' সিরিজের অন্তর্গত উপন্যাসগুলিতে ফরাসী সমাজকে নিখুঁতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের (১৮২১-'৮০) 'মাদাম বোভারি' এবং 'একটি সরল হৃদয়'। তাঁর পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর অন্য কোনও ফরাসী লেখক জীবনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিখুঁত বর্ণনা দেননি।

রাশিয়ান সাহিত্যের ঝোঁক বরাবরই বাস্তবতার দিকে। গোগোলের (১৮০৯-'৫২) 'দি ক্লোক' রাশিয়ান সাহিত্যে রিয়ালিজমের সূত্রপাত করেছে। এর পরে দস্টয়েভস্কি (১৮২১-'৮১), টুর্গেনিভ (১৮১৮-'৮৩) এবং টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) রাশিয়ান সাহিত্যে বাস্তবতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন।

নাট্য-সাহিত্যে বাস্তবতা আনলেন নরওয়ের লেখক হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)। নাটকে এরূপ তীব্র সমাজ-সমালোচনা তাঁর পূর্বে কেউ করেননি। ইবসেনের রচনা জার্মান সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বার্নার্ড শ'র (১৮৫৬-১৯৫০) উপরে তাঁর প্রভাব তো সর্বজনবিদিত।

ফরাসী বা রাশিয়ান সাহিত্যের মতো রিয়ালিজম ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। তবে ডিকেন্স (১৮১২-'৭০), থ্যাকারে (১৮১১-'৬৩) ও ট্রলোপ (১৮১৫-'৮২) সমসাময়িক জীবন ও সমাজের বাস্তব ছবি এঁকেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জোলা (১৮৪০-১৯০২) বাস্তবতার আদর্শকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। রিয়ালিজমের এই প্রসারকে বলা হয় ন্যাচারিলিজম বা অতি-বাস্তবতা। টেন (Taine) তাঁকে এই অতি-বাস্তবতার আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জোলার আদর্শে বিশ্বাসী অনুরক্ত নবীন লেখকের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁদের মধ্যে মোপাসাঁর (১৮৫০-'৯৩) নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। জোলা বিশ্বাস করতেন যে, বৈজ্ঞানিক যেমন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তেমনই উপন্যাসও লেখকের পরীক্ষালব্ধ একটি সামাজিক সমস্যা। বালজাকের 'হিউম্যান কমেডি'র মতো জোলা 'রুগোঁ-মাকার' (Rougon-Macquart) নামে একটি উপন্যাসের সিরিজ রচনা করেন। এই সিরিজের কুড়িটি উপন্যাসে জোলা একটি পরিবারের জীবনযাত্রার ইতিহাস প্রায় বৈজ্ঞানিকের মতো বর্ণনা করেছেন। মানুষের জীবনে বংশগতির (heredity) প্রভাব যে কত বড় রুগোঁ-মাকার সিরিজে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখানো হয়েছে।

ন্যাচারালিস্ট লেখকরা জীবন সম্বন্ধে কোনও সংস্কার বা আদর্শবাদে বিশ্বাস করতেন না। বৈজ্ঞানিকের মতো নৈর্ব্যক্তিক ভাবে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। জীবনের ক্লেদাক্ত ও ঘৃণ্য দিকটা হুবহু ফুটিয়ে তুলতে তাঁদের দ্বিধা ছিল না। জীবনের সঙ্গে যার যোগ আছে তা যত ঘৃণ্য ও নীচ হোক না কেন, সাহিত্যের আসরে অপাঙ্ক্তেয় নয়। অতি-বাস্তববাদী লেখকরা জীবনের স্থূল দিকটার উপরই জোর দিয়েছেন; এক টুকরো জীবনের অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়ে তাকে সজীব করে তুলতে পারার মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব। এ বর্ণনায় শালীনতার খাতিরে কিছুই গোপন করলে চলবে না। জোলা পতিতালয়ে বাস

করে বারবনিতাদের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

ফ্রান্সের বাইরে সাহিত্যে এই অতিবাস্তবতার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। জার্মানী, ইংলণ্ড, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশে অনেক লেখক অতিবাস্তবতার আদর্শকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ফন্টেইন (১৮১৯-'৯৮) হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯৪৬), হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), ভেরগা (১৮৪০-১৯২২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাস্তবতা ও অতিবাস্তবতার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। নিছক রোমান্টিক রচনার যুগ শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তার কারণও আছে। এই বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিদ্যার যুগে রোমান্স সৃষ্টির সুযোগ একান্তরূপে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। মনের ছায়াচ্ছন্ন কোণে রোমান্সের যে শেষ আশ্রয়টুকু ছিল, ফ্রয়েডের আবিষ্কার তাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় টমাস মান, আর্নল্ড বেনেট, আইভান বুনিন, সিগ্রিদ উন্‌সেত্, সমারসেট মম প্রভৃতির নাম। এঁরা প্রত্যেকেই কুশলী ঔপন্যাসিক। শিল্পী হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে এঁরা সর্বদাই সচেতন। জীবনের যথার্থ রূপায়ণ এঁদেরও লক্ষ্য ; কিন্তু ন্যাচারালিস্ট লেখকদের মতো নির্বিচারে সব-কিছু পাঠকের সামনে তুলে ধরতে এঁরা আগ্রহশীল নন। মানবতার আদর্শ এঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। মানুষের পক্ষে যা কল্যাণপ্রসূ নয়, তেমন সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য কী ? এঁরা বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবাতীত এক মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এঁদের রচনায়। অবশ্য আর্নল্ড বেনেট প্রধানত গল্পকার। অন্য লেখকরা বাস্তব জীবনের সঙ্গে এক মহত্তর জীবনের আদর্শের যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন।

টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) 'বুডেনব্রুকস' ও অন্যান্য রচনায় সমসাময়িক য়ুরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব ছবি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর কাজ শেষ হয়নি। মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন এবং সে উত্তর পাঠকদের দিতে চেষ্টা করেছেন। জোসেফের কাহিনীতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের "origin, his essence, his goal" সম্বন্ধে আলোচনা করা।

আর্নল্ড বেনেটের (১৮৬৭-১৯৩১) 'দি ওল্ড ওয়াইভ্‌স্‌ টেল' মধ্যবিত্ত ইংরেজ-সমাজের জীবন্ত আলেখ্য। ছবি হিসাবেই এর প্রধান মূল্য।

আইভান বুনিন (১৮৭০-) চেকভ, টুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাশিয়ার সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'দি ভিলেজ' এবং 'দি জেণ্টেলম্যান ফ্রম সানফ্রান্সিসকো' থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বুনিনের কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে দর্শন ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য থাকায় সুখপাঠ্যতার অন্তরায় হয়েছে।

উন্‌সেত্‌ (১৮৮২-১৯৪৯) তাঁর উপন্যাসে সমসাময়িক সমাজের ছবি দেবার চেষ্টা করেননি। বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার রীতি প্রয়োগ করে তিনি মধ্যযুগের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জীবন্ত ছবি দিয়েছেন। তাঁর বই পড়ে মনে হবে যেন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। Kristin Lavransdatter-এ লেখিকার রচনারীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সমারসেট মম্‌ (১৮৯৪-) সুখপাঠ্য কাহিনীর লেখক। অবশ্য বাস্তবতামূলক গল্প। গল্পকার হিসাবেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ', 'দি রেজ্বরস্‌ এজ' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

বর্তমান শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য ন্যাচারালিস্ট লেখকের সংখ্যাও কম নয়। বাস্তববাদী ও অতিবাস্তববাদী লেখকদের রচনাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়- সে সম্বন্ধে উপরে একটু আভাস দিয়েছি। পার্থক্যটা প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত। সুতরাং কোথায় রিয়ালিজমের শেষ এবং ন্যাচারালিজমের শুরু তার নিশ্চিত নির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী বাস্তববাদী লেখকদের রচনায় অতিবাস্তবতার লক্ষণ কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও জোলাই প্রথম সচেতনভাবে নতুন রীতি গ্রহণ করেন এবং প্রধানত তাঁর রচনাই পরবর্তী অতিবাস্তবতার ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। আর একজন লেখক বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ও আমেরিকান অতিবাস্তববাদী লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তিনি হেনরিক ইবসেন। ইবসেনকে অতিবাস্তবতাবাদী লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা না গেলেও তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষভাগে রচিত সামাজিক নাটকে ('দি লীগ অব ইয়ুথ' প্রভৃতি) অতিবাস্তবতার বীজ সুস্পষ্ট। অতিবাস্তববাদী লেখকদের রচনা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সত্য, কিন্তু বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে যে গভীরতা পাওয়া যায় এঁদের মধ্যে তার অভাব আছে।

বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান সাহিত্যে অতিবাস্তবতার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। স্টিফেন ক্রেইন (১৮৭১-১৯০০) এবং বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক নরিস (১৮৭০-১৯০২) আমেরিকান সাহিত্যে প্রথম অতিবাস্তব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু থিওডোর ড্রেইজারের (১৮৭১-১৯৪৫) হাতে পড়ে অতিবাস্তবতার ধারা আমেরিকান সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ড্রেইজার বাস্তব অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। সমাজে যা দেখেছেন তা উপন্যাসে ও নাটকে যথাযথরূপে বর্ণনা করেছেন,—ভদ্রতার মুখোশ পরিয়ে অপ্রিয় সত্যকে রীতি-সম্মত করবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। অনাবৃত সত্য প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিস্টার কেরি' অশ্লীলতাব অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়েছিল, আর একটি উপন্যাস—'দি জিনিয়াস'—নিষিদ্ধ হয়েছিল অন্য কারণে। এই উপন্যাসে তিনি পাপের জয় ও পুণ্যের পরাজয় দেখিয়েছিলেন বলে গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ড্রেইজার সমাজ-জীবন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক আমেরিকান সমাজে যত ক্লেদ, যত কুশ্রীতা ছিল ড্রেইজার তাদের বাস্তব রূপ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে শুধু যে পাঠকদের সাহিত্যরস উপভোগের সুযোগ দিয়েছেন তাই নয়, এর ফলে সমাজেরও প্রভূত উপকার হয়েছে। তাঁর 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এক দল চরিত্রহীন ভদ্রবেশী লোকের হাতে আমেরিকান তরুণীদের সম্মান এবং জীবন যে কিরূপ বিপন্ন, সে সম্বন্ধে আমেরিকান নাগরিকরা এই উপন্যাস পড়ে বিশেষরূপে সচেতন হয়।

ড্রেইজারের পরেই উল্লেখ করতে হয় সিনক্লেয়ার লুইসের (১৮৮৫-১৯৫১) নাম। সামাজিক গলদগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য তিনিও ড্রেইজারের মতো প্রথমে অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। সমাজের বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস রচিত। কোথাও ডাক্তার, কোথাও পাদরি, কোথাও বৃহৎ ব্যবসায়ী, ইত্যাদির জীবনযাত্রা তাঁর বিষয়বস্তু। এঁদের সম্বন্ধে নির্ভুল খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশণ করবার জন্য নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন; আবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তাও গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর 'অ্যারোস্মিথ' উপন্যাসে চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে তাদের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ছাড়া সম্ভব নয়।

আর্নেস্ট হেমিংওয়েকেও (১৮৯৮-১৯৬১) অতিবাস্তববাদী লেখক হিসাবে স্বীকার করা যেতে পারে। তাঁর মতে লেখকের কর্তব্য হল "to put down what I see and what I feel in the best and simplest way I can tell it." এর মধ্যে অতিবাস্তববাদী লেখকের নীতি ব্যক্ত হয়েছে।

হেমিংওয়ের লেখক-জীবনের গুরু শ্রীমতী গারট্রুড স্টেইন (১৮৭৪-১৯৪৬) ছিলেন অতিবাস্তববাদী লেখিকা। হেমিংওয়ে, এজরা পাউণ্ড, শেরউড অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি তরুণ লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল। অতিবাস্তবতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যতীত তাঁর রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই রীতিটি হল দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যুক্তিহীন কথাবার্তাকে উপন্যাসে স্থান দেওয়া। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মুখে যে ভাষা তিনি দিয়েছেন তা পালিশ করা ভাষা নয়। বাস্তব জীবনে লোকে যে ভাবে কথা বলে ঠিক সেই ভাষাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। এর ফলে কোথাও কোথাও তাঁর কাহিনী দুর্বোধ হয়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগের অন্যান্য আমেরিকান অতিবাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে জেমস টি. ফারেল (১৯০৪-), জন ডস প্যাসাস (১৮৯৬-), স্কট ফিট্‌জারাল্ড (১৮৯৬-১৯৭০) হেনরি মিলার (১৮৯১-) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে অতিবাস্তববাদী লেখকের সংখ্যা এবং সাহিত্যে তাঁদের প্রভাব খুবই কম। জন গল্‌স্‌ওয়ার্দিকে (১৮৬৭-১৯৩৩) কেউ কেউ বাস্তববাদী, কেউ বা অতিবাস্তববাদী লেখক বলে থাকেন। নগ্ন দারিদ্র্য, অশ্লীলতা, নীচতা ইত্যাদি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নয় বলে অনেকের তাঁকে অতিবাস্তববাদী লেখক হিসাবে স্বীকার করতে দ্বিধা আছে। জোলার রুগোঁ-মাকার সিরিজের মতো গল্‌স্‌ওয়ার্দি 'ফোরসাইট সাগা' সিরিজের সাহায্যে একটি পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সূক্ষ্মতা অতিবাস্তবতার লক্ষণাক্রান্ত। অতিবাস্তববাদী লেখকেরা সাধারণত সমাজের নীচুতলার অথবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথা বলে থাকেন; গল্‌স্‌ওয়ার্দির প্রধান চরিত্রগুলি অভিজাত অথবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কিন্তু সামাজিক নাটকগুলিতে ('জাস্টিস', 'স্ট্রাইফ', ইত্যাদি) তিনি বাস্তব জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছেন।

উপরে আমরা যে-সব অতিবাস্তববাদী লেখকের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের

অধিকাংশই প্রধানত ঔপন্যাসিক। নাটকে অতিবাস্তবতার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন ইবসেন, তাঁর পরে জার্মান লেখক হাউপ্টমান এই ধারাকে সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন। উপন্যাসে অতিবাস্তবতার আদর্শ যেরূপ সাফল্যের সহিত রূপায়িত হয়েছে, নাটকে প্রায় তদ্রূপ সাফল্যের কৃতিত্ব হাউপ্টমানের। নাটকে যে জীবনের এমন বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব পূর্বে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। সাধারণ শ্রমজীবী নরনারীর বেদনাক্ষুব্ধ জীবনের কাহিনী তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। 'বিফোর ডন' এবং 'দি উইভার্স' হাউপ্টমানের অতিবাস্তব নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু যে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে হাউপ্টমান অতিবাস্তবতার প্রমাণ দিয়েছেন তাই নয়, নাটকের আঙ্গিক ও প্রযোজনার ব্যাপারেও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

যদিও হাউপ্টমানের অতিবাস্তবতামূলক নাটক বিংশ শতাব্দীর পূর্বক্ষণে রচিত হয়েছিল, তথাপি বর্তমান শতাব্দীতেও তাদের প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তী কালে হাউপ্টমান অতিবাস্তব পদ্ধতি ত্যাগ করেছিলেন।

অতিবাস্তববাদী ফরাসী লেখকদের মধ্যে জুল রোমাঁ ও মারতাঁ দু গারের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। রোমাঁর (১৮৮৫-) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি চব্বিশ খণ্ডের উপন্যাস 'মেন অব গুডউইল'। নায়ক পীয়ের জালেজ্ এবং অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম চল্লিশ বৎসরের জীবনযাত্রা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে অতিবাস্তবতার পদ্ধতি অনুসারে রোমাঁ চল্লিশ বছরের ফরাসী জীবনযাত্রার ধারা এবং বিচিত্র ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য অতিবাস্তববাদী লেখকের সঙ্গে তাঁর দুটি পার্থক্য লক্ষণীয়: (১) রোমাঁ তাঁর চরিত্রগুলি স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আঁকেননি; এরা গোষ্ঠীর অংশমাত্র, ব্যক্তির চেয়ে তাঁর কাছে সমাজের প্রাধান্য বেশী। সমাজের মধ্য দিয়েই মানুষকে সাফল্য অর্জন করতে হবে। সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হত Unanimism। জর্জ দুয়ামেল (১৮৮৪-) এবং আরও কোন কোন ফরাসী লেখক এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। (২) কোথাও কোথাও রোমাঁ মনের গতিপথ অনুসরণ করে তাঁর চরিত্রের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। পুঁথিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনাও তাঁর রচনার অতিবাস্তবতা স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এক দিক থেকে বিচার করলে মারতাঁ দু গার (১৮৮১-) বোধ হয় বর্তমান

কালের সর্বাপেক্ষা 'রক্ষণশীল' অতিবাস্তববাদী ঔপন্যাসিক। তাঁর দশ খণ্ডের উপন্যাস Les Thibaults একটি ফরাসী পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী। রোমাঁর 'মেন অব গুড উইল' অপেক্ষা দু গারের উপন্যাসের মিল জোলার রুগোঁ-মাকার সিরিজের সঙ্গে বেশী। রোমাঁর কাহিনীতে সকল শ্রেণীর লোকের আনাগোনা দেখতে পাই। দু গার দেখিয়েছেন একটি শ্রেণীর এবং বিশেষ করে একটি পরিবারের লোকদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকদের মত সূক্ষ্ম বর্ণনার উপর তিনি জোর দিয়েছেন, ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির দ্বারা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে অতিবাস্তবতার আদর্শের প্রতি তিনি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

বাস্তবতা রাশিয়ান সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ান লেখকরা বাস্তবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী গ্রন্থ রচিত হয়েছে অনেক। বাস্তবতামূলক উপন্যাস রচনার জন্য যে অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োজন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তেমন স্বাধীনতা পাওয়া কঠিন ছিল।

বিংশ শতাব্দীর অতিবাস্তববাদী রাশিয়ান লেখকদের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তিনি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর রচনা এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রভায় উজ্জ্বল।

গোর্কির সাহিত্যসাধনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: গোর্কি ত্রিশ বছর বয়সের পূর্বে যে-সব কাহিনী লিখেছেন তার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, জনসাধারণ চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে বাস করলেও তাদের মনুষ্যত্ব এখনও বেঁচে আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায় জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের চরিত্রের নীচতা, দীনতা এবং কুশ্রীতাকেও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সময়কার রচনার মধ্যেই অতি-বাস্তবতার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্'। এই নাটকের চরিত্রগুলির কেউ চোরাই মালের কারবার করে, কেউ মাতাল, কেউ জোচ্চোর; আবার অন্যেরা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সবাই থাকে শহরের একটা নিম্নশ্রেণীর হোটেলে। একদিন এক রহস্যময় তীর্থযাত্রী সেই হোটেলে এসে উপস্থিত হল। লোকটি তাদের জড়তা

ত্যাগ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। এ রকম একজন লোকের উপস্থিতি আশার সৃষ্টি করল হোটেলের বাসিন্দাদের মনে। আগন্তুকের ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পেরেও একটি জীবনবিদ্বেষী চরিত্র বলছে: everybody lives for something better to come.

গোর্কির তৃতীয় পর্যায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি নিছক সাহিত্য হিসাবে তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পাবে।

অতিবাস্তববাদী লেখকদের আদর্শ হল জীবনের যথাযথ নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া। ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব যোগ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গোর্কির বই পড়ে স্পষ্টই মনে হবে লেখক শুধু জীবনের ছবি আঁকেননি, তাঁর একটি বক্তব্যও আছে। সে বক্তব্য এই যে, বিরূপ সামাজিক পরিবেশের জন্যই মানুষের জীবন বিকৃত হয়।

আলেকজান্দার কুপ্রিনের (১৮৭০-১৯৩৮) 'ইয়ামা দি পিট' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান সাহিত্যে অতিবাস্তবতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওডেসার পতিতালয়ের বারবনিতাদের জীবনযাত্রার যে নিখুঁত ছবি তিনি দিয়েছেন তা একমাত্র জোলার 'নানা'র সঙ্গে তুলনীয়। পতিতাবৃত্তির কারণ ও কুফল সম্বন্ধেও কুপ্রিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মিখাইল শলোকভের (১৯০৫-) 'ডন' উপন্যাসে বাস্তব ও অতিবাস্তব রচনা-রীতি পাশাপাশি পাওয়া যাবে। ১৯১০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কসাক জাতির বিবর্তনের বিবরণ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর প্রভাব কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রেমের উপকাহিনীর উপর পড়েছে 'অ্যানা কারেনিনা'র ছায়া। শলোকভ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় কসাকদের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি গোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে তিনি ব্যষ্টির চরিত্রায়ন উপেক্ষা করেননি। বরং ব্যক্তির জীবনকে যথাযথ রূপে ফুটিয়ে তুলে গোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। শলোকভের ঝোঁক বিশদ বর্ণনার উপর। একটি ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ উপস্থিত করতে তিনি ভালবাসেন। চরিত্রের সমালোচনা করায় প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী বৃদ্ধ শ্বশুরকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছিল তার তুলনা অতিবাস্তব সাহিত্যেও পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান ও কলকারখানার যুগে সাহিত্যে অতিবাস্তবতার ধারা প্রচলিত

হয়েছে। শহর ও ফ্যাক্টরির জীবনের সঙ্গে অতিবাস্তব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প সমাজে যে পরিবর্তন এনেছে, জীবনে যে অজ্ঞাতপূর্ব দীনতা, ক্লেদ ও গ্লানি দেখা দিয়েছে, ন্যাচারালিস্ট লেখকরা প্রধানত তারই ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অতিবাস্তববাদী লেখকদের নাগরিক জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া কোনও কোনও লেখকের মধ্যে দেখা যায়। এঁরা নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে কাহিনী সৃষ্টি করেন। নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার জন্য যেন আহ্বান জানান এঁরা।

এই ধরনের রচনার মধ্যে ক্নুট হামসুনের (১৮৫৯-১৯৫২) 'গ্রোথ অব দি সয়েল' অগ্রণী। নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে এক খণ্ড পতিত জমির উপর প্রথম কেমন করে একটি গ্রাম্য সমাজ একটু একটু করে গড়ে উঠেছে সেই চিত্তাকর্ষক বিবরণ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়ক আইজাকের মধ্যে আমরা আদিম মানবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ; লেখক তার চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। আইজাকের বুদ্ধি বেশ মোটা, কিন্তু সে সৎ ও হৃদয়বান। এই নতুন উপনিবেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের খুব বিশদ ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

ক্নুট হামসুনের মতো ফরাসী লেখক জঁ জোনো (১৮৯৫-) কৃষক-জীবনের চিত্রকর। অবশ্য 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর মতো বৃহৎ পটভূমিকা জোনোর কোনও বইয়েই নেই। তথাপি গ্রাম্য পরিবেশ ও কৃষক-জীবন সম্বন্ধে হামসুনের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জোনোর অনেকটা মিল আছে। কিন্তু জোনো সর্বত্র নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেননি এবং স্থানে স্থানে মনোবিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীর কাজের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও অন্য সকল প্রাণীর যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, এই উপলব্ধি জোনোর অনেক কাহিনীতে পাওয়া যায়।

উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২) হামসুনের মতো গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেননি—যদিও তিনি আঞ্চলিক লেখক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের পটভূমিকা। উত্তরাঞ্চলের অসম প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চল আর্থিক ও নৈতিক ভাঙনের মুখে চলেছে। ফকনার ওই অঞ্চলের জনশ্রুতি, কুসংস্কার, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির নিপুণ প্রয়োগের দ্বারা একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ জগতে খুন, যৌন অপরাধ, গোষ্ঠীগত

কলহ ইত্যাদি লেগেই আছে। ১৯৪৯ সনে নোবেল পুরস্কার আনতে গিয়ে ফকনার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, 'সাহিত্যের বিষয় হল "the human heart in conflict with itself".' ফকনার তাই বাইরে থেকে জীবনের যে ছবি দেখা যায় শুধু তাব হুবহু ছবি দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেননি। তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মানসিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও করেছেন। সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। সাহিত্য-সৃষ্টির একটি বিশেষ পথ ধরে লেখকরা আজকাল বড একটা চলতে চান না। আজ কোনও লেখককে শুধু বাস্তববাদী অথবা রোমান্টিক বলে চিহ্নিত কবা সম্ভব নয়। একজন লেখকের মধ্যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে দেখতে পাই।

বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি রিয়ালিজম আর একটি রোমান্টিসিজম। সর্বত্র রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজমকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। রিয়ালিস্ট লেখকের রচনায় যেমন কোথাও কোথাও রোমান্টিসিজিম পাওয়া যায় তেমনি রোমান্টিক সাহিত্যেও রিয়ালিজম একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্যেও রিয়ালিজম দেখা যায়। কিন্তু সেই রিয়ালিজমের প্রকাশ কুণ্ঠিত, শুধু মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে চোখে পড়ে। বর্তমানে সাহিত্যে রিয়ালিজম বলতে আমরা যা বুঝি তার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্তাঁদালের 'রেড অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক' রিয়ালিজমের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সাহিত্যে বাস্তবতার ধারা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জোলা প্রমুখ কয়েকজন ফরাসী লেখক বাস্তবতার ধারাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিলেন। বাস্তবতার এই প্রসারকে বলা হয় ন্যাচারিলিজম বা অতিবাস্তবতা। রিয়ালিজমের সঙ্গে ন্যাচারিলিজমের মূল পার্থক্য হল মাত্রার। বাস্তববাদী লেখক জীবনের হুবহু ছবি তুলে ধরেন, কিন্তু তাঁর বিচরণ-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বাস্তব বলেই সবকিছুকেই তিনি বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। রুচি ও নীতির মানদণ্ড প্রয়োগ করে তিনি ঘটনা ও পটভূমিকা গ্রহণ বা বর্জন করেন। অতিবাস্তববাদী লেখকের বিচরণক্ষেত্র প্রশস্ততর; নির্বাচন তাঁর পক্ষে গৌণ। জীবনের যে-কোনো বিষয়ই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। নীতি বা রুচির প্রশ্ন বাধা সৃষ্টি করে না। অতিবাস্তববাদী লেখক বৈজ্ঞানিকের মতো জীবনের সঙ্গে যা-কিছুর যোগ আছে তা পরীক্ষা করে দেখেন। সেই পরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় স্থান পায়। ন্যাচারিলিজমে বাস্তবতা একটু বেশী উদ্ধত, কখনো নগ্নতায় নিষ্ঠুর। জীবনের যে-সব দিক আমরা আড়ালে রাখতে ব্যগ্র অতি-বাস্তববাদী লেখকরা তাদের পাঠকের সামনে তুলে ধরেন।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার প্রসার এবং ফরাসী বিপ্লবের মৈত্রী,

সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ পাশ্চাত্ত্য লেখকের দৃষ্টি কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে এনে বাস্তব জীবনের পরিবেশে নিবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। ভাববিলাস বিজ্ঞান চর্চার সহায়ক নয়। যা প্রত্যক্ষ, যা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা যেতে পারে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার তা নিয়েই কারবার। বৈজ্ঞানিক যুগের এই বৈশিষ্ট্য সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। এ কালের পাঠকও নিছক কল্পনা-বিলাসের পক্ষপাতী নয়। তারা সাহিত্যে নিজেদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখবার জন্য উৎসুক।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেরও সাধারণ লক্ষণ জীবনের বাস্তব চিত্রের প্রাধান্য। বিগত এবং বর্তমান শতকের অতিবাস্তবপন্থী লেখকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন ইবসেন। জুল রোমঁা, মারতাঁ দু গার, গোর্কি, কুপ্রিন, হাউপ্টমান, গলস্‌ওয়ার্দি, হেমিংওয়ে, হেনরি মিলার, থিওডোর ড্রেজার, সিনক্লেয়ার লুইস প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর ন্যাচারিলিস্ট লেখকরা জোলার উত্তরসাধক। অবশ্য সমকালীন অতিবাস্তববাদী লেখকদের রচনাপদ্ধতির গভীর পরিবর্তন ঘটেছে; এবং আপাতদৃষ্টিতে উনবিংশ শতকের এই শ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য বড বলে মনে হতে পারে।

বিজ্ঞান নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু-জগতই একমাত্র সত্য নয়। মানুষের কাছে তার মনের জগৎ ও কল্পনার জগৎও কম বড় নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতাপও আমাদের জীবন থেকে এদের প্রভাব দূর করতে পারেনি। তাই শুধু বাস্তববাদী সাহিত্য পাঠকদের তৃপ্তি দিতে পারে না। মনের ও কল্পনার জগৎ তৃপ্ত করবার জন্য ভিন্ন জাতের সাহিত্য প্রয়োজন। এই দাবীর ফলে বাস্তবতার প্রাধান্য সত্ত্বেও বর্তমান শতকে এমন কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে যা দৈনন্দিন জীবন ও তার পারি-পার্শ্বিকের নিছক প্রতিবিম্ব নয়। বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে।

রিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসে। সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ নতুন নয়। প্রাচীন সাহিত্যেও মনের জগতের কথা আছে। মানুষের জীবন কেন্দ্র করে যা-কিছু লেখা হয় তা থেকে মনকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। চসারের 'ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা' মনোবিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। স্তাঁদালের উপন্যাসকেও মনোবিজ্ঞানমূলক বলে কেউ

কেউ বলেছেন। নায়কের মানসিক দ্বন্দ্বের উপর তিনি আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। দস্টয়েভস্কি, বোদলেয়ার এবং পো-কেও এই শ্রেণীর লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ এঁরা মানসিক অস্বাভাবিকতার কথা নিয়ে লিখেছেন।

কিন্তু বর্তমান শতকের মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসের প্রকৃতি একটু আলাদা। পূর্বে নায়ক-নায়িকার মন বাইরে থেকে দেখা হত, এখন পাত্র-পাত্রীর মন ভিতর থেকেই দেখানো হয়। লেখক একজন দর্শক হিসাবে বাইরে থেকে পাত্র-পাত্রীর মন দেখতে চেষ্টা করেন না। এই শ্রেণীর লেখকরা বিশ্বাস করেন যে, জীবনের রণক্ষেত্র হল মানুষের মনে। বাইরের ঘটনা বড নয়, মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে বাইরে তার প্রসার ঘটে। তাই লেখকের উদ্দেশ্য হল পাত্র-পাত্রীর অন্তরে প্রবেশ করে মনের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা এবং তার সম্বন্ধে অবজেক্টিভ বিবরণ পাঠকের নিকট উপস্থিত করা। "The psychological novel is not content to state what happens but goes on to explain the why and the wherefore of this action. In this type of writing character and characterization are more than usually important."

পাত্র-পাত্রীর মনের অন্ধকার অলি-গলিতে যে-সব লেখকের যাতায়াত তাঁদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। একদল লেখক আছেন যাঁরা পাত্র-পাত্রীদের কাজের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য থাকে তার নিপুণ বিশ্লেষণ করে পাঠকদের নিকট উপস্থিত করেন। এডিথ হোয়ারটন, থরুনটন ওয়াইলডার, আলবার্তো মোরাভিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর লেখক। শ্রীমতী হোয়ারটনের 'ইথান ফ্রম', ওয়াইলডারের 'দি ব্রিজ অব স্যান লুই রে' এবং মোরাভিয়ার 'দি ওম্যান অব রোম' বিশ্লেষণ-মূলক উপন্যাসের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

হেরমান হেসে, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, ই. এম. ফরস্টার প্রভৃতি জীবনের নৈতিক সমস্যাকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন। এই জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এঁদের উপন্যাস 'স্টেপেনউল্ফ', 'দি মাদার' এবং 'এ রুম উইদ এ ভিউ'-তে।

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীদের পথ অনুসরণ করে একদল লেখক পাত্র-পাত্রীদের যৌনবিকৃতি ও স্নায়বিক বিকৃতি বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন।

ডি. এইচ. লরেন্স ও আর্থার শনিৎস্লার, হিউগো ফন হফমানসথল এই শ্রেণীর লেখক। লরেন্সের উপন্যাসে এবং শেষোক্ত দু'জনের নাটকে আমরা চরিত্রের অস্বাভাবিকতার বিশ্লেষণ দেখতে পাই।

মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসের একটি নতুন ধারার নাম stream-of consciousness. এই জাতীয় উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মনে স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদির প্রবাহ অবাধে বয়ে চলে, এই চলার মধ্যে কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই। মানুষের মনে যে-সব চিন্তা-ভাবনা আসে যায় তাদের মধ্যে পারম্পর্য অথবা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখক এ সব বিচ্ছিন্ন অযৌক্তিক চেতনা-প্রবাহকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে এবং অনেক কিছু বাদ দিয়ে কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু স্ট্রীম-অব-কনশাস্‌নেস পদ্ধতি অনুসারে যাঁরা লেখেন তাঁরা কিছুই বাদ দেন না কিংবা চেতনা-প্রবাহকে যুক্তিসম্মত করবার চেষ্টাও করেন না। তাই এই জাতীয় রচনা পড়তে গিয়ে পাঠক বারবার হোঁচট খায়, কাহিনী খাপছাড়া মনে হয়। স্ট্রীম-অব-কনশাসনেস পদ্ধতির লেখক বাইরের জগতকে উপেক্ষা করেন, তাঁরা আমাদের মনোজগতের বাস্তবপন্থী শিল্পী। এঁরা সামাজিক, রাজনীতিক এবং নৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন।

এই পদ্ধতির প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা Edouard Dujardin-এর We'll To the Woods No More (১৮৮৭)। কিন্তু উপন্যাসের একটি বিশেষ রীতি হিসাবে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। স্ট্রীম-অব-কনশাসনেসের পদ্ধতি সফলতা লাভ করেছে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং জেম্‌স্‌ জয়েসের রচনায়। ফকনার কোনো কোনো উপন্যাসে—বিশেষ করে Sound and Fury-তে এই রীতি ব্যবহার করেছেন। ইউজিন ও' নীলের Strange Interlude নাটকেও এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ দেখা যায়। ভার্জিনিয়া উলফের The Waves এবং Mrs. Dalloway স্ট্রীম-অব-কনশাসনেস রীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী উলফ দেখিয়েছেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক যেন লক্ষ্যস্থল, পরিবেশ এবং স্মৃতির তূণ থেকে নানা বিশৃঙ্খল চেতনার তীর নিরন্তর লক্ষ্যস্থলে এসে আঘাত করছে। এলোমেলো ছাপগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা আনবার সুযোগ নেই, ক্রমাগত নতুন নতুন চেতনার তীর এসে মর্মস্থল বিদ্ধ করছে।

জেম্‌স্‌ জয়েসের 'ইউলিসিস' স্ট্রীম-অব-কনশাসনেস রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন ডাবলিন শহরে দুই শতাধিক নরনারীর জীবনে যা ঘটেছিল তারই বিবরণ 'ইউলিসিস'। তবে ঘটনার পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিবরণ পাই না। লিওপোল্ড ব্লুম ও স্টিফেন ডিডেলাসের চেতনার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে ঐ একটি দিনের ইতিহাস পাঠকের নিকট পৌঁছেছে। পাত্র-পাত্রীদের মনের অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা interior monologue-এর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জয়েসের রচনায় রিয়ালিজমের অভাব নেই ; কিন্তু সেই রিয়ালিজম সরাসরি পাঠকের নিকট উপস্থিত হয় না, পাত্র-পাত্রীর মনের জানালা গলিয়ে আসে।

নব-রোমান্টিক লেখকদের রচনাতেও রিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রোমান্টিক আন্দোলন সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার ফিরে এসেছে। কেননা, মানুষের চরিত্রের মধ্যে আছে রোমান্সের বীজ। বাস্তবতার কঠোরতা থেকে আমরা মাঝে মাঝে মুক্তি চাই। তারই তাগিদে নব-রোমান্টিকতার আবির্ভাব হয়েছে বর্তমান শতকের প্রথমেই।

দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভের কামনায় পাঠক অপরিচিত পরিবেশের কল্পনায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, উদ্ভট ঘটনাপূর্ণ কাহিনী খোঁজে ; অসাধারণ চরিত্র উপন্যাসের মধ্যে দেখতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার উপযোগী কাব্যময় অনুভূতিপ্রবণ ভাষাও পাঠকদের কাম্য। কোনো লেখক স্বল্প-পরিচিত দেশের পরিবেশে কাহিনী রচনা করে পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করেছেন ; কেউ স্বপ্নের জগৎ রচনা করেছেন, কেউ বা রোমান্টিক মনোবৃত্তি-সুলভ অতৃপ্ত সৌন্দর্য পিপাসায় ব্যাকুল।

পীয়ের লোটি, কিপলিং এবং কনরাড স্বল্পপরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশের রোমান্স পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে লোটি জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেন। দূর দেশের পটভূমিকায় অনেক উপন্যাস লিখেছেন তিনি। 'আইসল্যাণ্ডের জেলে' তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। জোসেফ কনরাডও সমুদ্র-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার পটভূমিকা য়ুরোপীয় পাঠকের মন আকৃষ্ট করেছে। 'লর্ড জিম' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কনরাডের রচনা শুধু রোমান্সের জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা এবং জীবন সম্বন্ধে ভাবনাও তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিপলিং ভারতীয়

পটভূমিকায় কাহিনী রচনা করে সহজেই ইংরেজ পাঠকদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

মেতারলিঙ্কের রচনায় পাওয়া যায় রূপক ও সংকেতময়তার প্রাধান্য, বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগ সামান্য। কিন্তু রচনাকৌশলের জন্য রূপকের গূঢ় অর্থ উপেক্ষা করেও দর্শক তাঁর নাটক সহজ ভাবেই উপভোগ করতে পারে। তা না হলে 'নীলপাখি' এমন জনপ্রিয় হত না। ইটালীর কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল দ্য আনুনৎসিও রোমান্টিক জীবন-পিপাসা মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর রচনায়। ক্রিস্টোফার ফ্রাই ও এডমণ্ড রোস্তাঁর রচনায় রোমান্টিক সৌন্দয-পিপাসা রূপলাভ করেছে। কবি স্টেফান জর্জ 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' তত্ত্বকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তথ্যবিরহিত সাহিত্যরস পরিবেশনই তাঁর লক্ষ্য। রাশিয়ান লেখক লিওনিদ আন্দ্রিয়েভের রচনা অবক্ষয়ধর্মী। ঊনবিংশ শতকের অনেক রোমান্টিক লেখকের রচনায় অবক্ষয়ের সুর পাওয়া যায়। আন্দ্রিয়েভ বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে আর সব মিথ্যা, একমাত্র সত্য মৃত্যু। প্রেম তাঁর কাছে পাশবিক বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। প্রেম আমাদের চরিত্র থেকে রুচি ও আত্মসম্মানবোধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পীয়ের লুই-এর রচনাতেও অবক্ষয়ের সুর লক্ষণীয়। তাঁর সৌন্দর্যলিপ্সা এবং পলায়নী মনোবৃত্তি আন্দ্রিয়েভের মধ্যে অনুপস্থিত। পীয়ের গ্রীক বিদ্যায় পারদর্শী বলে তার উপন্যাসে আমরা ইতিহাসের রোমান্টিক পরিবেশ পাই। 'আফ্রোদিতে' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

রিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যের আর একটি রীতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই রীতিকে বলা হয় Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ। সাহিত্যে ও শিল্পে অভিব্যক্তিবাদ আবির্ভাবের প্রধান কারণ দু'টি: ফ্রয়েড, য়ুং প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ফলে আমরা উপলব্ধি করলাম যে বাইরে থেকে নর-নারীকে যেমন দেখি সেটাই তার আসল রূপ নয়। অবচেতন মনের অন্ধকারে প্রকৃত রূপটি আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রণের দ্বারা একটি মানুষকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা যায় না। লেখক নিজের মনে একটি লোকের যে রূপ উপলব্ধি করবেন তাকে রূপ দিলে হয়ত হঠাৎ বিকৃত মনে হবে, কিন্তু শিল্পীর উপলব্ধির সত্যতা তাতে অক্ষুণ্ণ থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হল, মার্কস্‌বাদের প্রভাব। মার্কসবাদে ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীর

স্থান বড়। ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য হারিয়ে যাচ্ছে। তাই অভিব্যক্তিবাদী সাহিত্যে পাত্র পাত্রীদের ব্যক্তিগত নামে চিহ্নিত না করে শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন, বাবা, ভাই, স্ত্রী, বান্ধবী ইত্যাদি। এরা মানুষের দল হিসাবে সত্য। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবি নেই এদের। অভিব্যক্তিবাদী সাহিত্য 'portrays an object, but views it subjectively as modified or distorted by the highly individual and intellectual conception of the author.'

অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে দেখা যায়। বিশ শতকের জার্মান নাট্যকারদের রচনা অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত। ভ্যাডেকিণ্ট, জর্জ কাইজার, টলার, চাপেক প্রভৃতির নাটকে এই রীতির যেমন সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায় অন্য কোনো লেখকের রচনায় তেমন দেখা যায় না। ও'নীল, পিরান্দেলো, লরকা, কাফকা প্রভৃতি লেখক অবশ্য সাধারণভাবে অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

সমকালীন সমালোচনা

বইয়ের সংখ্যা যখন কম ছিল, তখন সমালোচকের প্রয়োজন বড় একটা ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল, আর এদিকে পাঠকদের অবসর সংকীর্ণ হতে লাগল যন্ত্রযুগের প্রভাবে। শুধু উপন্যাস পড়তেই যার আগ্রহ তার পক্ষেও সবগুলি উপন্যাস পড়া সম্ভব নয়। এত সময় নেই। ভালো-মন্দ সবকিছু পড়া যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেগুলি ভালো, যেগুলি আমার রুচির সঙ্গে মিলবে বলে আশা করি, শুধু সেইগুলিই পড়ব। এই নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য সমালোচকদের প্রয়োজন হল।

সাহিত্যের তাত্ত্বিক সমালোচনা অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যে ছিল। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী থেকে। বর্তমান শতকে সমালোচনা-সাহিত্য নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পেরেছে। বিশেষ করে এটা সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্ত্যে। সেখানে এখন এক দল লেখক সাহিত্য সমালোচনাকে জীবিকা-অর্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রধানত সমালোচনার বই লিখে খ্যাতি লাভ করাও এখন সম্ভব হয়েছে। আই. এ রিচার্ডস্ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী শতকেও অনেকে সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তখন সাধারণত কবিতা উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখকরা তাঁদের অন্য রচনার সঙ্গে কিছু কিছু সাহিত্য সমালোচনাও লিখেছেন। সেণ্টস্‌বারির মতো দু'চারজন ব্যতিক্রম যে না ছিলেন এমন নয়। তবে এখনকার মতো সমালোচনা-সাহিত্য যে পৃথক মর্যাদা লাভ করেনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমালোচনা-সাহিত্য বলতে আমরা এখানে একটি বিশেষ বইয়ের পরিচিতি এবং সাহিত্যের আদর্শ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—এই দুটি শাখাকেই বুঝব।

বিংশ শতাব্দীতে সমালোচনা সাহিত্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান কারণ দুটি। সাহিত্য এখন পুরোপুরি ব্যবসায়ের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকের মতামতের উপরে এই পণ্য বিক্রি বিশেষরূপে নির্ভরশীল। যে ব্যবসায় কয়েক কোটি টাকা খাটছে সমালোচকদের তার উপর প্রভাব আছে বলেই তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান শতকের মতো সাহিত্যের বহুমুখীনতা এবং জটিলতা পূর্বে কখনো ছিল না। বিগত শতাব্দীর সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ ও বাস্তবতা—এই দুটি প্রধান ধারা ছিল বলতে পারি। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে কোন্ ধারাটি যে প্রধান তা নির্দেশ করা যায় না। বাস্তবতা, নিও-রোমান্টিসিজম, অস্তিত্ববাদ, ইম্প্রেশানিজম, স্যুর্‌রিয়ালিজম, মার্কসবাদ ইত্যাদি অসংখ্য ধারা ও উপধারা পাশাপাশি রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি সাহিত্যগোষ্ঠী। এসব গোষ্ঠীর চিন্তা ও আদর্শ সাধারণ পাঠকের পক্ষে সাহায্য ব্যতীত উপলব্ধি করা কঠিন। লেখকের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় স্থাপনের জন্য সমালোচকের সহায়তা তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পাঠকের প্রয়োজন ছাড়া গোষ্ঠীর প্রয়োজনেও সমালোচকের সাহায্য দরকার। আদর্শের ব্যাখ্যা ও প্রচার না হলে গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তার লাভ করবে না। সমালোচকের মর্যাদাবৃদ্ধির এটি দ্বিতীয় কারণ।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি বিচারের জন্য সেই গোষ্ঠীর আদর্শে বিশ্বাসী সমালোচকের দলও আবির্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ যেমন মার্কসবাদী লেখক আছেন তেমনি মার্কসবাদী সমালোচকও রয়েছেন। মনো-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের সমালোচনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব ঐ গোষ্ঠীর সমালোচকদের।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-সাহিত্যে যে-সব প্রধান গোষ্ঠী ও ধারা আছে তাদের মধ্যে সমাজবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। গণতন্ত্রের যুগে সমাজসচেতনতা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্য সমাজ-ঘনিষ্ঠ না হলেও বিরূপ অভ্যর্থনা পাবার আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু এখন সামাজিক পরিবেশ এবং ব্যক্তির উপরে তার প্রভাবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য রচনা করবার কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়। সাহিত্য সমাজসচেতন হবার ফলে সমাজবাদী সমালোচকেরও আবির্ভাব হয়েছে। সমাজবাদী সমালোচনার সূত্রপাত করেছেন Hippolyte Taine (১৮২৮-'৯৩)। বংশগতি এবং পরিবেশ যে মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে হিপলিট টেন এই তত্ত্ব প্রথম জোরের সঙ্গে প্রচার করেন। তিনি বলেন, সাহিত্য যদি সত্যি জীবনের ছবি হয় তাহলে গ্রন্থকারকে এ দুটি প্রভাবের কথা তাঁর রচনার মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

টেন-এর এই মতবাদ শুধু সমালোচনার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রইল না। একদল লেখক তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করে সাহিত্য রচনা আরম্ভ করলেন। এঁরা ন্যাচারালিস্ট বা অতিবাস্তববাদী লেখক। জোলা এই দলের অগ্রণী। তাঁর "রুগোঁ-মাকার" সিরিজে বংশগতির প্রভাব মানুষের জীবনে যে কত বড় তা দেখানো হয়েছে।

একালের সমাজবাদী সমালোচকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিভিন্ন উপদলের দৃষ্টিকোণ একটু পৃথক। তবে এঁদের প্রত্যেকেই একটি মূল আদর্শে বিশ্বাসী। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য হল ইতিহাসের প্রতিবিম্ব। ইতিহাস বলতে শুধু রাজনৈতিক ঘটনার সমষ্টিকে বুঝব না, আর্থিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথাও সেই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজবাদী সমালোচকরা বলেন, এই সামগ্রিক ইতিহাসের প্রতিফলন যে সাহিত্যে নেই সে সাহিত্য অসার্থক। কারণ মানুষ milieu বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রীড়নক মাত্র। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্প জয়ী হতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সাহিত্যে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া না হয়, তাহলে সে সাহিত্য বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

সমাজবাদী সমালোচক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মার্কসবাদীরা একটি শক্তিশালী শাখা। সাহিত্য বিচারে এঁরাও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে স্বীকার করেন। কিন্তু এঁদের চোখে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টির সবচেয়ে প্রধান উপাদান রাজনৈতিক প্রভাব। মানুষের সভ্যতা ও সমাজের অগ্রগতি একমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সম্ভব। শ্রেণী সংগ্রাম চরম রূপ লাভ করে বিপ্লবের মধ্যে। যদি মার্কসের আদর্শানুযায়ী বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহলে সে বিপ্লব হবে সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ। যতদিন পযন্ত তেমন বিপ্লব না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলবে। বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চাকাটা সামনের দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। লোহার উপর লোহা দিয়ে কঠিন আঘাত করলে আগুনের ফুলকি বের হয়। ঠিক তেমনি শ্রেণী-সংঘাতের ফলে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ফুরণ হতে পারে।

মার্কসবাদীর চোখে ব্যষ্টি কোনো বিশেষ একটি শ্রেণীর প্রতীক। এ ছাড়া তার পৃথক কোনো মূল্য নেই। মার্কসবাদী সাহিত্যের আদর্শ নায়ক

বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। শ্রেণী সংগ্রাম সফল করতে কতটুকু সাহায্য করেছে—সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদী সমালোচকদের সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মার্কস-এর পূর্ববর্তী লেখকদেরও তাঁরা এই মানদণ্ডে বিচার করেন। যে-সাহিত্য শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লবের আদর্শে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে না মার্কসবাদী সমালোচক তাকে সমাজবিরোধী বলে চিহ্নিত করেন।

মার্কসবাদের আদর্শ যাঁদের প্রভাবান্বিত করেছে তাঁদের মধ্যে হার্বার্ট রীড, সি. ডে. লুইস, স্টিফেন স্পেণ্ডার, ভি. এফ কালভার্টন, মাইকেল গোল্ড, ডেভিড ডেইচেস, এডমাণ্ড উইলসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই সাহিত্য বিচারে মার্কসের আদর্শকে তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মার্কসকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছেন অল্প কয়েকজন।

সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণের স্থান বহু দিন থেকেই আছে। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুবর্তীরা মনের জগৎ সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার অনেক পূর্বে সফোক্লিস, টলস্টয়, দস্টয়েভস্‌কি প্রভৃতি লেখকরা মনের বিচিত্র গতিপথের কথা পাঠকদের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁদের সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে বর্তমান কালের লেখকদের মতো মনোজগতের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সচেতনতা ছিল না। অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে মনের অন্ধকার কোণকে যতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছেন তাঁরা ততটুকুই তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

ফ্রয়েড, য়ুং, অ্যাডলার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনোবিদ্যা সম্বন্ধে যে-সব নতুন তথ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ফলে শিল্পে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির সকল বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত হল। মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে চিরাগত ধারণা অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমরা দেখলাম, মানুষের চিন্তা ও আচরণের জন্ম তার অবচেতন মনে। এখানে সচেতন বিচার বুদ্ধির প্রবেশ করবার ক্ষমতা নেই। তাই অবচেতন মন নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার ও অসামাজিক বাসনার বিচরণক্ষেত্র। অপরিতৃপ্তির ধূমায়িত ক্ষোভ জটিল পথে পরিচালিত হয়ে মানুষের জীবনকে বিকৃত করে তোলে। সুতরাং মনোবিজ্ঞানী সাহিত্য সমালোচকরা বিশ্বাস করেন যে, শুধু বাহিরের ঘটনা দিয়ে মানুষের বিচার করা চলে না, কিংবা সম্পূর্ণ ছবিও পাওয়া যায় না। যে সাহিত্য মনের উত্থান-পতন ও একান্ত গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে না সে সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করেনি। পূর্বে

কতকগুলি বাহিরের ঘটনা সাজিয়ে জনপ্রিয় কাহিনী রচনা করা সম্ভব ছিল। বিংশ শতাব্দীতে মনোজগতে আলোকপাত না করে কোনো কাহিনীই সার্থক হতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, মানুষ কতকগুলি প্রাচীন প্রথা, পৌরাণিক কাহিনী, প্রতীক, কমপ্লেক্স, আদিরূপের (archetype) ধারণা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত। এদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে মানুষের মনের এবং জটিল ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যে সাহিত্য মানুষের জীবনের ছবি প্রতিফলিত করবে সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কমপ্লেক্স, প্রতীক, আদিরূপ প্রভৃতি সমকালীন সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাচীন সাহিত্যেও এদের কথা আছে। ঈডিপাস কমপ্লেক্সের কথা সুবিদিত। ফ্রয়েড তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা থেকে বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।

মার্কসবাদী সমালোচকরা সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা না দেখলে ক্ষুব্ধ হন। মনোবিজ্ঞানী সমালোচকরা যে সাহিত্যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা না হয় তাকে আক্রমণ করেন। নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের অনুশাসনের ফলে আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলিও দমন করতে হয়। পরিণামে জীবন বিকৃত ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে। কামনা-বাসনার স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হলে মানুষের কি অবস্থা হয় সাহিত্যের মাধ্যমে তা দেখানো কর্তব্য বলে মনোবিজ্ঞানী সমালোচকরা বিশ্বাস করেন। তাহলে নীতি ও প্রথার দাসত্ব ক্রমশ শিথিল হবে বলে আশা করা যায়।

অবদমিত বাসনার গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানী সমালোচকদের নিকটে আর একটি কারণে খুব বেশী। ফ্রয়েডের মতো তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, নিরুদ্ধ কামনা-সঞ্জাত ব্যর্থতা ও হতাশা মানুষের স্নায়ু বিকৃত করে। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা স্নায়ুরোগী। তাঁদের যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা সহজভাবে জীবনে সফলতা লাভ করে না, সৃষ্টির জগতে তাকে মুক্তি দিতে পারলে কিছুটা তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে। যাঁর বেদনা ও ব্যর্থতা যত বেশী, যাঁর আকাঙ্ক্ষার জটিলতা যত গভীর, তাঁর সৃষ্টির মানও তত উঁচু। ফ্রয়েড বলেন যে, শিল্পীর অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে বিকল্প সার্থকতা লাভ করে। একমাত্র শিল্পীদের স্নায়ুবিকারই সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। মনোবিজ্ঞানী সমালোচকরা শিল্পীর মন বিশ্লেষণ করে সৃষ্টির রীতি ও পদ্ধতি উপলব্ধি করতে পারেন। টমাস

মান ফ্রয়েডের এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচনায় যতগুলি শিল্পী ও সাহিত্যিক চরিত্র দেখতে পাই তারা সকলেই স্নায়ুবিকারগ্রস্ত।

শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদে যে-সব সমালোচক বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড ডেল, ওয়াল্‌ডো ফ্র্যাঙ্ক, হার্বার্ট রীড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডেল তাঁর "লাভ ইন দি মেশিন এজ" নামক গ্রন্থে ফ্রয়েডের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। হার্বার্ট রীড মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদ—এই উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত। তিনি "আর্ট অ্যাণ্ড সোসাইটি" নামক তাঁর বইয়ে শিল্প সৃষ্টির ধারাকে ফ্রয়েডের মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যা করেছেন।

নব মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী একটি সমালোচক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে আমেরিকায়। সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল যুগের ডিসিপ্লিনের পুনঃপ্রবর্তন এঁদের কাম্য। এই ডিসিপ্লিন রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—এই উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। সাহিত্যে বাস্তববাদ, রোমান্টিকতা এবং মনোবিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা এই গোষ্ঠীর সমালোচকরা বরদাস্ত করতে পারেন না। বিংশ শতাব্দীর জীবনে যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে তার প্রতিবাদে এঁরা মানবতার আদর্শে সমৃদ্ধ ক্লাসিক্যাল যুগেব পরিবেশে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ। জীবনে ও সাহিত্যে ধর্ম যদি প্রেরণার উৎস হয় তাহলে সকল উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে সমাজ ও নীতি শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। সমকালীন সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে প্রাধান্য দেখা দিয়েছে মানবতাবাদী সমালোচক গোষ্ঠী তার বিরোধী।

সাহিত্য সমালোচনায় 'নিউ হিউম্যানিজম'-এর প্রবর্তন করেছেন পল এলমার মোর ও আর্ভিং ব্যাবিট। দু'জনেই পণ্ডিত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁদের সমালোচনার রীতি বাস্তব জীবনের দাবীকে অনেকাংশে উপেক্ষা করে পুঁথিগত হয়ে পড়েছে। মোর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় আদর্শ তাঁর মতবাদকে কিছু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে। আমেরিকার বাইরে সাহিত্য বিচারে 'নিউ হিউম্যানিজম'-এর আদর্শ বিশেষ প্রচার লাভ করেনি।

আত্মমুখীন বা ইম্‌প্রেশানিস্‌টিক সমালোচনায় শিল্প ও সাহিত্যকর্মকে পৃথকভাবে বিচার করা হয় না। একটি বই বা ছবি সমালোচকের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই আত্মমুখীন সমালোচনার

উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মূল বইয়ের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ স্থাপন না করিয়ে বই নিজের মনের উপরে যে ছাপ ফেলে সমালোচক তার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেন। আত্মমুখীন সমালোচনার মূল কথাটি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বলেছেন আনাতোল ফ্রান্স :

"The good critic is the one who tells the adventures of his soul among masterpieces."

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচনা বলেই কোনো বিশেষ রীতি বা আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন নেই। নিজের ভালোলাগা কি মন্দলাগার কথাটি পাঠকের নিকট পৌঁছে দেওয়াই সমালোচকের কাজ। এ ধরনের সমালোচনায় যেমন অবাধ স্বাধীনতা আছে, তেমনি দায়িত্বের পরিমাণও রয়েছে যথেষ্ট। সমালোচকের ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি এবং প্রকাশের ক্ষমতার উপরে সমালোচনার সার্থকতা নিভর করে। একটি রীতি অনুসরণ করে কিংবা আদর্শ সামনে রেখে সমালোচনা করা এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ।

ব্যক্তিমুখীন সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি। তথাপি এ জাতীয় সমালোচনার বিকাশ ঘটেছে অনেক পরে। তার কারণও আছে। সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমালোচনার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। যে-সব সমালোচক এবং লেখক কোনো বিশেষ গোষ্ঠিভুক্ত নন তাঁদের অধিকাংশই এ ধরনের সমালোচনা লিখতে পছন্দ করেন।

ব্যক্তিমুখীন সমালোচনাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ফরাসী লেখক জুল লেম্যেৎর্। পরে বহু সমালোচক ব্যক্তিমুখীন সমালোচনাকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমালোচক ইটালীর বেনেদেত্তো ক্রোচে। তিনি সমালোচকের রসাস্বাদন ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিমুখীন ছিলেন না। কারণ সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল।

সংবাদপত্রে এবং জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয় প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে সমালোচনা বলা যায় না। এ যেন অনেকটা আর পাঁচটা সংবাদের মতো একটি নবপ্রকাশিত পুস্তকের খবর পরিবেশন করা। লেখকের পরিচিতি, বইয়ের বিষয়বস্তু এবং ছবি, ছাপা ও বাঁধাই সম্বন্ধে পাঠকদের সংবাদ জানানোই এ ধরনের তথাকথিত সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য। সংবাদপত্র

ও জনপ্রিয় সাময়িক পত্রের প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে পুস্তক-পরিচয়ের চাহিদা বেড়েছে। সকল প্রকার সংবাদের মতো সাহিত্যের সংবাদও পাঠকরা পেতে চায়। পুস্তক-ব্যবসায় প্রসার লাভ করবার ফলে বিজ্ঞাপনদাতা ব্যবসায়ীদের দাবী উঠেছে। সাহিত্য সম্বন্ধে কাগজে আলোচনা থাকা চাই,—না হলে বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ কী?

এই ব্যস্ততার যুগে পাঁচ-দশ মিনিটে কাগজ পড়া শেষ করতে হয়। গম্ভীর ও গভীর সমালোচনা পড়বার মতো সময় নেই। সাধারণ পাঠক বইটি সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পেলেই সন্তুষ্ট। এই প্রয়োজনের তাগিদে পাশ্চাত্ত্যে একদল পেশাদারী পুস্তক-পরিচয় লেখকের সৃষ্টি হয়েছে। যত্ন করে এরা বই পড়েন না, বইয়ের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিমতও প্রকাশ করেন না, এঁরা ভদ্র ও সংযত ভাষায় পুস্তকের পরিচয় দেন। উনবিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুর সমালোচনা—যে সমালোচনা কীটসের অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে কারো কারো ধারণা—এখন আর নেই। এখনকার পুস্তক-পরিচয় লেখক তাঁর কাগজের এবং প্রকাশকের স্বার্থ মনে রেখে পরিচিতি লেখেন।

এই ধরনের পরিচিতিতে মাঝে মাঝে ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়। কারণ লেখক সম্পূর্ণ বই প্রায়ই পড়েন না, প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি এবং সূচীপত্র দেখে বই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনা করেন। এর ফলে কৌতুকজনক ভুল ঘটবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের দেশে যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে পুস্তক পরিচয় লেখেন তাঁরা তো এ ভুল করেনই, পাশ্চাত্ত্যেও এরূপ ভুল পরিচিতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইচ. ডব্লু. ফাউলার সংকলিত 'এ ডিক্সিওনারি অব মডার্ন ইংলিশ ইউসেজ' গত ত্রিশ বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। এই সংকলনে হেনরির ভাই এফ. জি. ফাউলারেরও সহায়তা ছিল। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, বইয়ের নামপত্রে দু' ভাইয়ের নামই ছিল। এক বিলিতি কাগজের সমালোচক ভাবলেন, দুই 'ফাউলার' যখন তখন নিশ্চয়ই এঁরা স্বামী-স্ত্রী। তিনি লিখলেন, স্ত্রী যে অংশ সংকলন করেছেন সে অংশ অপেক্ষাকৃত ভালো। এই মন্তব্যের সবটাই অবশ্য সমালোচকের আবিষ্কার।

পুস্তক-পরিচিতির প্রভাবের ফলে প্রকৃত সমালোচনার মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা যত কমছে ততই সাধারণ পাঠকের মনে ধারণা হচ্ছে যে, পুস্তক পরিচয়ই সমালোচনা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে সমালোচনা সাধারণত গোষ্ঠীর সংকীর্ণ আদর্শকোণ থেকে, কখনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো বা ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। এরূপ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি বইয়ের যথার্থ এবং সামগ্রিক বিচার সম্ভব নয় বলে এক দল সাহিত্যরসিকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে একটি সমালোচক গোষ্ঠী গড়ে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এঁদের প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ছে। এঁদের সমালোচনার পদ্ধতিকেই 'নিউ ক্রিটিসিজম' বা নতুন সমালোচনা বলা হয়।

এই সমালোচনার পদ্ধতির নাম সার্থক। কেননা, প্রচলিত সমালোচনা রীতি সাহিত্যরস আস্বাদনের পরিপন্থী বলে নতুন সমালোচনার সমর্থকরা মনে করেন। একটি বইকে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকম হিসাবে বিচার করতে হবে। তার সঙ্গে লেখকের জীবন, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা ভ্রমাত্মক। তাহলে শিল্পকর্মের সামনে অনাবশ্যক আড়াল এসে উপলব্ধির পথে ব্যাঘাত জন্মাবে। বইটির শিল্পসত্ত্বাই তো সমালোচকের একমাত্র বিচার্য! বিচারের এই পথ ত্যাগ করলে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। টলস্টয় সেক্সপীয়র-এর 'লীয়ার' নাটক শিল্পকর্ম হিসাবে উপেক্ষা করেছেন, কারণ এর মধ্যে কোন নৈতিক আদর্শ পরিস্ফুট হয়নি। একজন মার্কসবাদী সমালোচক শ্রেণী-সংগ্রামের কথা নেই বলে হেরমান হেসের 'সিদ্ধার্থের' মধ্যে কোনো সার্থকতা দেখতে পাননি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা টেনে তাঁর রচনার অপব্যাখ্যা তো হামেশাই হয়ে থাকে। এই জন্যই 'নতুন সমালোচনার' সমর্থকরা একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসাবে বইয়ের বিচার করতে চান। সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে এঁরা মোটামুটিরূপে 'আর্ট ফর আর্টস সেক-'এর নীতিকে গ্রহণ করেছেন।

নতুন সমালোচনার সমর্থকরা মনে করেন যে সমালোচকের কর্তব্য শুধু অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যাখ্যা নয়, সমালোচকও মৌলিক শিল্পী। প্রকৃত সমালোচকের রচনা রসোত্তীর্ণ হবে এবং সাহিত্যে স্থান লাভ করবে। প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূন নয়। রসোত্তীর্ণ কাব্য ও সমালোচনা সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য।

সাহিত্য সমালোচনার বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল

যাবৎ বিচারের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানদণ্ড ছিল নৈতিক আদর্শ। পুস্তকের বিষয়বস্তু সেই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করলে লেখককে ক্ষমা করা হত না। ক্রমশ রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির যুগোপযোগী আদর্শ সমালোচকের বিচারকে প্রভাবান্বিত করেছে। 'নতুন সমালোচনা' সমালোচনা-সাহিত্য বিবর্তনের এখন পর্যন্ত শেষ ধাপ। এই রীতি গ্রন্থের শিল্পসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে বলেই আঙ্গিক বিচারের উপরে জোর দিতে হয়। ভাবের সৌন্দর্যের প্রতিফলন অঙ্গসৌষ্ঠবে। সুতরাং কোনো বইকে শিল্পকর্ম হিসাবে দেখতে হলে আঙ্গিকের বিচার অত্যাবশ্যক। এই সমালোচক গোষ্ঠী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দেন। সমালোচকের খেয়াল অনুসারে সমালোচনা হবে এটাও তাঁরা চান না। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যেরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, সাহিত্যের আলোচনায়ও তেমনি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা উচিত, এই তাঁদের মত।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও শব্দার্থশাস্ত্রজ্ঞ আইভর আর্মস্ট্রং রিচার্ডস্ 'নতুন সমালোচনার' আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন নানা বই ও প্রবন্ধ লিখে। 'প্রিন্সিপলস্ অব লিটারারি ক্রিটিসিজম', 'সায়েন্স অ্যাণ্ড পোয়েট্রি', 'প্রাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম', 'দি ফিলসফি অব রেটরিক', 'হাউ টু রীড এ পেজ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। অপরের সহযোগিতায় লিখিত 'দি ফাউণ্ডেশানস্ অব ঈসথেটিকস্' এবং 'দি মীনিং অব মীনিং' বই দু'টির নামও সুপরিচিত। এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, এডিথ সিটওয়েল, অ্যালেন টেট্ প্রভৃতি লেখকরা 'নতুন সমালোচনার' আদর্শে বিশ্বাসী।

আমরা সমালোচনার প্রধান প্রধান ধারাগুলির পরিচয় দিয়েছি। সম্প্রতি দু'টি নতুন ধারার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা। তুলনামূলক সাহিত্যপাঠের আদর্শ নতুন নয়; গ্যেটে এই আদর্শের প্রবর্তক। যুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের প্রচলন হওয়ায় বিশ্বসাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনাও ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে একটি ভাবের বিকাশ কিভাবে হয়েছে, বিভিন্ন যুগের প্রতিচ্ছবি কোন দেশের সাহিত্যে কিভাবে ফুটেছে—তুলনামূলক সমালোচনায় তারই উপর জোর দেওয়া হয়। খকের সঙ্গে লেখকের, বইয়ের সঙ্গে বইয়ের তুলনা উদ্দেশ্য নয়।

আর একটি হল নৃ-বিজ্ঞানীদের সাহিত্যের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা। তাঁরা সাহিত্যকে পৃথকভাবে বিচার না করে মানুষের সমগ্র সংস্কৃতির শাখা হিসাবে দেখেন। সভ্যতার কোন স্তরে কি ধরনের সাহিত্য রচিত হয় তার বিশ্লেষণ করে এঁরা মানুষের সামগ্রিক প্রগতির ইতিহাস রচনা করেন। ক্রোয়েবারের Configurations of Culture Growth বইটির নাম এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

সাহিত্যিক ধাপ্পা

সংসারে ধাপ্পা ও জালিয়াতি কোথায় নেই? আজকালকার দুর্দিনের বাজারে অনেকে এদের অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে আমরা প্রায় সকলেই জালিয়াতি না করলেও নিছক আমোদের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ধাপ্পা দিয়ে থাকি। এ জাতীয় ধাপ্পায় কারো ক্ষতি হয় না; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হাসতে পারা যায়।

জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চুরি, জালিয়াতি ও ধাপ্পার অভাব নেই। অবশ্য কপিরাইট আইন বলবৎ হবার পর প্রকাশ্য চুরি ও জালিয়াতি প্রায় বন্ধ হয়েছে। লেখকদের ধাপ্পা দেবার অভ্যাসটাও বর্তমান শতকে উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পেয়েছে। অর্থোপার্জনের জন্য যারা জালিয়াতি করে বা ধাপ্পা দেয় তাদের কথা ভুলে যেতে আমাদের দেরী হয় না। শাস্তি হলেও আদালতের নথিপত্রে তাদের পরিচয় হারিয়ে যায়। কিন্তু লেখকদেব ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ কবে।

সাহিত্যিক ধাপ্পার দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখকরা সাধারণত অর্থের লোভে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করে না। লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তাদের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য। অর্থ উপার্জনের জন্য এক শ্রেণীর লোক নকল প্রথম সংস্করণ তৈরী করে চড়া দামে বিক্রি করে। এরা প্রায় কেউ লেখক নয়, সুতরাং এদের কথা এখানে আলোচনা করব না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন লেখকদেব প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হত। তখন কোনো লেখকের প্রশংসা প্রচার করবার মতো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র ছিল না। নতুন লেখকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো কঠিন ছিল। এই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক লেখক ধাপ্পার সহায়তা গ্রহণ করত। এই ধাপ্পা কি রকম? যেমন ডিফো (১৬৫৯-১৭৩১) 'জার্ণল অফ দি প্লেগ' বের করলেন বেনামে। নামপত্রে লিখলেন: 'প্লেগের সময় লণ্ডনে অবস্থানকারী একজন নাগরিকের রচিত।' প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যাবে বলে পাঠক সমাজে এ-বই সমাদৃত হবে এই আশায় ডিফো ধাপ্পা দিয়েছেন। ১৬৬৫ সালের প্লেগ মহামারীর সময় ডিফোর

বয়স মাত্র ছয় বছর। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তো আর লিখতে পারেন না।

স্কট (১৭৭১-১৮৩২) 'রব রয়' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কাহিনীর খসড়াটা তিনি পেয়েছেন এক অপরিচিত পত্র-লেখকের কাছ থেকে। কিন্তু পরবর্তী এক সংস্করণে তিনি জানিয়েছেন যে, একথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভল-তেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) 'কাঁদিদ' বেরিয়েছিল বেনামে। ভূমিকায় লেখা হয়েছিল যে, জার্মাণ লেখক ডঃ রালফের বইয়ের ফরাসী অনুবাদ এই 'কাঁদিদ।' বলা বাহুল্য, জার্মাণ ভাষায় এ বইয়ের অস্তিত্ব ছিল না।

হোরেস ওয়ালপোল (১৭১৭-৯৮) তাঁর 'ক্যাসল্' অব ওত্রান্তে' ছাপিয়েছিলেন বেনামে। ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে এটি প্রাচীন ইটালিয়ান গ্রন্থের অনুবাদ। বইটি এক বনেদী ক্যাথলিক পরিবারে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইভাবে মূল লেখকের নাম গোপন করে পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করাই ছিল লেখকের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে ধাপ্পার যত প্রাচুয, আমাদের দেশে তেমন নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ধাপ্পার প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১)। বালক রবীন্দ্রনাথ যোলো বছর বয়সে বৈষ্ণব কবিদের ভাষা ও ভাবের সফল অনুকরণ করে লিখলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এগুলি যে বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত আসল পদাবলী নয় তা পণ্ডিতরাও ধরতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ চ্যাটারটনের কাহিনী শুনে এরূপ ধাপ্পা দেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, লোকে যদি জানে যে এগুলি বালকের রচিত তা হলে তারা মুরুব্বীর চালে পিঠ চাপড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার কথা শোনাবে। কিন্তু 'তাহাদের (লোকদের) যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই, হইবে না ; এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে?'

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বেনামীতে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ক্যালকাটা রিভিউতে।' তৃতীয় পক্ষ সমালোচকের মতো তিনি নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সে মন্তব্যে অসত্য উক্তি কিছু না থাকলেও পাঠকের ধোঁকা লাগবার পক্ষে যথেষ্ট।

ওদেশের সাহিত্যিক ধাপ্পার কথা বলতে গেলে প্রথম যে দৃষ্টান্তটি মনে পড়ে

তা এই : এক যুবক কাগজে লেখা পাঠিয়ে, প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি দিয়ে কোনো সুবিধে করতে পারল না। কেউ তার লেখা ছাপতে রাজী নয়। অথচ লেখক হবার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তখন সে নিরুপায় হয়ে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করল। যুবক নিজের হাতে মিণ্টনের (১৬০৮-৭৪) 'Samson Agonistes' নকল করে নতুন নাম দিল 'Like a Giant Refreshed.' তারপর একে একে নাম-করা প্রকাশক ও সম্পাদকদের নিকট পাঠাতে শুরু করল তার নকল পাণ্ডুলিপি। কিছুদিন পর থেকে, সে জবাব পেতে আরম্ভ করল। অনেক প্রকাশকই লিখল, বইটি ভালো, তবে ভাষা পুরানো ধাঁচের। একজন প্রকাশক জানালো, বইটি চমকপ্রদ 'উপন্যাস'। আর একজন বইটি প্রকাশ করতে রাজী হল, কিন্তু শ' পাঁচেক টাকা লেখককে দিতে হবে ছাপার খরচ হিসাবে। মিণ্টনের বিখ্যাত বইটি কেউ চিনতে পারেনি। সকলে পাণ্ডুলিপি দেখেওনি। দেখলে 'সামসন অ্যাগোনিষ্টিসকে' উপন্যাস বলতে পারত না।

যাই হোক্, লেখক-যশঃপ্রার্থী যুবক সম্পাদক ও প্রকাশকদের চিঠিগুলি পেয়ে উপকৃত হল। সে তার পাণ্ডুলিপির ইতিহাসের সঙ্গে এই চিঠিগুলি যোগ করে একটি প্রবন্ধ লিখল। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'সেণ্ট জেমস গেজেটে।' ছাপার অক্ষরে এই তার প্রথম লেখা, এবং বোধহয় শেষ।

নিছক কৌতুকের উদ্দেশ্যে ধাপ্পা দেবার সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। কবি আলেক-জাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) তাঁর সদ্যরচিত ব্যঙ্গ কাব্য (Rape of the Lock) সুইফটকে পড়ে শোনাচ্ছেন। ডাঃ পার্নেল ঘরের এক কোণে বসে পোপের কাব্যপাঠ অলক্ষ্যে শুনছিলেন; তাঁর উপস্থিতির কথা কেউ জানত না। ডাঃ পার্নেলের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি বাড়ী এসে কাব্যের একটি সর্গ ল্যাটিনে অনুবাদ করে পুরনো কাগজে ছাই রঙের কালি দিয়ে লিখে রাখলেন। কিছুদিন পরে একটি বৈঠকে পোপ যখন আবার 'রেপ অব দি লক' পড়ছিলেন তখন পার্নেলও উপস্থিত ছিলেন। কাব্যপাঠ শুনে পার্নেল মন্তব্য করলেন, এটা তো ল্যাটিন থেকে অনুবাদ! পোপ লাফিয়ে উঠলেন। পোপ তখন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এরূপ অন্যায় মন্তব্যে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। প্রমাণ দাবী করলেন তিনি। পার্নেল প্রমাণ উপস্থিত করে বললেন, এক প্রাচীন খ্রীষ্টান মঠে একটি ল্যাটিন কাব্যের টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া গেছে। তার একটি অংশ তিনি পেয়েছেন। পোপ তো তাঁর কাব্যাংশের সঙ্গে পুরনো পাণ্ডুলিপির হুবহু

মিল দেখে হতবাক। কিছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না এমন মিল কি করে হতে পারে! পার্নেল যতদিন পর্যন্ত দয়া করে রহস্য ভেদ করেননি, ততদিন তাঁর মন এ ব্যাপারে ভারাক্রান্ত ছিল।

বার্ক (১৭২৯-৯৭) একবার বাজি ধরে লিখেছিলেন Vindication of Natural Society. বাজির সর্ত ছিল এই যে, ভাষা ও রচনারীতি এমন হবে যে পাঠকরা মনে করবে বইটি পরলোকগত বোলিংব্রোকের লেখা। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না, নামপত্রে উল্লেখ ছিল: 'by a late Noble Writer.' বার্ক বাজি জিতেছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ অভিজ্ঞ সমালোচকরাও বুঝতে পারেননি যে বইটি প্রকৃতপক্ষে বার্কের রচনা। প্রস্পের মেরিমে (১৮০৩-৭০) তাঁর প্রথম রচিত নাটকগুলি নিজের নামে প্রকাশ করেননি। নাটক-সংগ্রহের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, জিব্রাল্টারের ক্লারা গাজল নামে এক মহিলা এই নাটকগুলির লেখিকা। স্প্যানিশ ভাষা থেকে নাটকগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পর্যন্ত মেরিমে গ্রহণ করেননি। একজন কাল্পনিক অনুবাদকের নাম বইয়ে ছাপা হয়েছিল। এই কল্পিত লেখিকার এক সুবিস্তৃত জীবনী নাট্য-গ্রন্থাবলীর ভূমিকার সহিত যোগ করা সত্ত্বেও ক্লারা গাজলকে কেউ খুঁজে পায়নি। যদিও একজন 'বিজ্ঞ' সমালোচক তথাকথিত অনুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, অনুবাদ ভালো হলেও 'মূলের' তুলনায় নিকৃষ্ট। কোথায় মূল স্প্যানিশ লেখিকার রচনা? মেরিমে ধাপ্পা দিলেন, তার উপরে আবার সমালোচকের ধাপ্পা।

জোনাথান সুইফটের (১৬৬৭-১৭৪৫) ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর 'গালিভার্স ট্র্যাভেল্স্' প্রথমে বেরিয়েছিল বেনামে। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল যে, মিঃ লেমুয়েল গালিভার পুস্তকের সম্পাদকের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিঃ গালিভার জীবিত আছেন এবং থাকেন নিউইয়র্কে। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য গালিভারের একটি ছবি ও স-তারিখ ব্যক্তিগত চিঠি ছাপা হয়েছিল। বই বের হবার পর অনেক পাঠক নিউইয়র্কে গিয়ে বৃথাই গালিভারের খোঁজে ঘুরে এসেছে।

বই শেষ করবার পর সুইফটের আশঙ্কা হয়েছিল যে, এমন আজগুবি ভ্রমণ-কাহিনী পাঠকরা হয়ত সম্পূর্ণ উদ্ভট বলে গোড়াতেই বাতিল করে দেবে। তাই তিনি সত্য কাহিনী হিসাবে একে চালাবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন।

কবি শেলী (১৭৯২-১৮২২) প্রথম যৌবনে একবার ধাপ্পা দিয়েছিলেন।

The Posthumous Fragments of Margaret Nicholson নামে একটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তিকার সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়েছিল মার্গারেটের এক কল্পিত ভাইপোর নাম। মার্গারেট ছিল এক বিকৃত-মস্তিষ্ক ধোবানী। ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় জর্জকে হত্যা করবার চেষ্টা করায় তাকে পাগলা গারদে দেওয়া হয়েছিল। এই পাগলীর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয়েছিল যে, রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কায় নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন শেলী।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজান্দার দুমা (১৮২৪-৯৫) নাকি মোট প্রায় বারোশ' গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছিলেন। একজনের পক্ষে কি এত লেখা সম্ভব? বাজারে তাঁর লেখার খুব চাহিদা; দুমার নাম থাকলে যে কোনো লেখা হুহু করে বিক্রি হয়ে যায়। দুমা অর্থোপার্জনের এই লোভ ছাড়তে পারেননি। ভাড়াটে লেখকের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। অধিকাংশ লেখক নিজেদের লেখা অন্যের বলে চালিয়ে ধাপ্পা দিয়েছেন, এখানে তার উল্টো। দুমা অন্যের লেখা নিজের বলে ভক্ত পাঠকদের ধাপ্পা দিয়েছেন। গল্প আছে, দুমা একদিন তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার শেষ লেখাটা পড়েছ?' ধূর্ত ছেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন করল 'তুমি নিজে পড়েছ তো?'

ইংরেজী সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত ধাপ্পাবাজ লেখক জেমস্ ম্যাকফারসন, টমাস চ্যাটারটন ও উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যাণ্ড। এদের জালিয়াতও বলা যায়। কারণ ধাপ্পা দেবার জন্য এরা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিল।

জেমস্ ম্যাকফারসন (১৭৩৬-৯৬) ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। প্রাচীন গেইলিক উপজাতির (স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা) কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করবার পর ম্যাক্‌ফারসনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো গেইলিক কবিতা সংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়। স্কটল্যাণ্ডের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও কবি ওসিয়ানের রচিত একটি কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি আবিষ্কার করেছেন। ওসিয়ানের পিতা ফিঙ্গলের জীবনকাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ম্যাকফারসন গেইলিক ভাষা থেকে এই কাব্যের ইংরেজী 'অনুবাদ' প্রকাশ করেন। আসলে এটি মস্ত বড় ধাপ্পা।

ম্যাকফারসনই কাব্যের রচয়িতা। মূল পাণ্ডুলিপি কেউ চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। ম্যাকফারসনের তথাকথিত 'অনুবাদ' প্রকাশিত হবার পরেই ডঃ জনসন সন্দেহ প্রকাশ করেন। ম্যাকফারসন আর প্রাচীন গেইলিক কবিতা আবিষ্কারে ধাপ্পা দেননি। এরপর থেকে তিনি ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চা করেছেন।

ম্যাকফারসনের 'ওসিয়ান' গ্যেটে, শিলার, শাতোব্রিয়াঁ প্রভৃতি বিখ্যাত য়ুরোপীয় লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যেটের Sorrows of Werther-এ দেখতে পাই ভার্টার তার দয়িতা লোটিকে ওসিয়ান পড়ে শোনাচ্ছে।

ম্যাকফারসন শুধু ধাপ্পাবাজই ছিলেন না, কবি প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। টমাস চ্যাটারটনের (১৭৫২-৭০) কবি প্রতিভাও প্রখর ছিল। কিশোর চ্যাটারটন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ব্রিস্টলের এক গির্জায় পুরনো কাগজপত্রের মধ্য থেকে টমাস রাউলি নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবির কাব্য আবিষ্কার করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সবই ধাপ্পা; কবিতাগুলি চ্যাটারটনেরই লেখা। কিন্তু কিশোর কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাব, ভাষা ও পরিবেশ এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে পাঠকের মনে কাব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চ্যাটারটন অনেক চেষ্টা করেও টমাস রাউলির কবিতা প্রকাশের জন্য কোনো প্রকাশক পেলেন না। তখন তিনি সাহায্যের আশায় পাণ্ডুলিপি পাঠালেন হোরেস ওয়ালপোলকে। পূর্বেই বলেছি, ওয়ালপোল নিজেই 'দি ক্যাসল্ অব ওত্রান্তো' সম্পর্কে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ালপোল প্রথমে চ্যাটারটনের দাবীকে যথার্থ বলে ভেবেছিলেন, তারপরে যখন বুঝলেন এটা ধাপ্পা, তখন উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন চ্যাটারটনকে। চ্যাটারটন বারবার অনুরোধ করেও ওয়ালপোলের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাননি।

রাউলি ও তার কবিতার কথা ভাবতে ভাবতে চ্যাটারটনের মানসিক রোগ হল। তিনি নিজেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বলে মনে করতেন; জীবনযাত্রাব ধরণও হয়ে গেল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো। কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদালাভ না করতে পারার বেদনায় এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় চ্যাটারটন ১৭৭০ সালে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো।

মৃত্যুর পরে ওয়ালপোল চ্যাটারটনের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর সব রচনা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অশ্লীলতার জন্যই নাকি অপ্রকাশিত রচনাগুলি ছাপানো যায় না। চ্যাটারটনের করুণ কাহিনী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। ধাপ্পার কথা মনে থাকে না।

ম্যাকফারসন ও চ্যাটারটন নিঃসন্দেহে কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যাণ্ডের (১৭৭৭-১৮৩৫) সাহিত্য প্রতিভার তুলনায় জালিয়াতির প্রতিভা ছিল বেশী। আয়র্ল্যাণ্ডের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁর বাবা বইয়ের ব্যবসা করতেন, সুতরাং ছেলেবেলা থেকে পুরনো বই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সাত বছর বয়সে তিনি একবার স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই থেকে সেক্সপীয়র সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেন। চ্যাটারটনের বোনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ধাপ্পা দেবার কথা তাঁর মনে হয়।

প্রথম প্রথম তিনি সেক্সপীয়রের স্বাক্ষর, একটা সনেট বা নাট্যাংশ নকল করে লোকের মনে কিছুটা বিশ্বাস উৎপাদন করলেন, তিনি জানালেন সেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত এই কাগজগুলি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সাহস বেড়ে গেল। আয়র্ল্যাণ্ড এবার একটি সম্পূর্ণ নাটক লিখে সেক্সপীয়রের নামে চালিয়ে দিলেন। নাটকটির নাম 'Vortigern and Rowena', হলিনশেডের 'ক্রনিক্‌ল্‌'-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। আয়র্ল্যাণ্ডের বয়স তখন মাত্র আঠারো। এই নাটক রচনা করতে তাঁর দু'মাস সময় লেগেছে। আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে সেক্সপীয়রের লেখার ছাঁদ, ভাষা ইত্যাদি অনুকরণ করেছেন। এলিজাবেথান যুগের বই থেকে সাদা পৃষ্ঠা সংগ্রহ করে এক বিশেষ ধরণের কালি দিয়ে নাটকটি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে বিশেষজ্ঞরাও কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেননি।

সেক্সপীয়রের নতুন নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে জেনে ইংলণ্ডে হৈচৈ পড়ে গেল। প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ নিজে তাদের বাড়া এসে আয়র্ল্যাণ্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বিখ্যাত নাট্যকার শেরিডানের প্রযোজনায় এই নতুন নাটকটি ড্রুরি লেন থিয়েটারে ১৭৯৬ সালের ২রা এপ্রিল অভিনীত হল। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কেম্বল নিয়েছিলেন নায়কের পার্ট। আয়র্ল্যাণ্ড রয়েলটি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন চুক্তি হয়েছিল।

অভিনয় জমেনি, কারণ নাটকটি কাঁচা। তবু দীর্ঘকাল লোকে ভেবেছে এটি বোধহয় সেক্সপীয়রের প্রথম জীবনের রচিত নাটক, তাই অপরিণত। তারপর আয়র্ল্যাণ্ডই এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে সকল রহস্য ফাঁক করে দেন।

আজকাল সমালোচকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে, তাদের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকরা বই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তাই এখন ধাপ্পা দেওয়া সহজ নয়। তথাপি সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিক ধাপ্পা হল লামা লপসাং রম্পার 'দি থার্ড আই।' একজন তিব্বতী লামার আত্মজীবনী হিসাবে এ বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের মধ্যে তিব্বতের পরিবেশ নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। পরে জানা গেল লেখক লামা নয়, তিব্বতবাসীও নয়। কিন্তু প্রকাশকের বিশেষজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলীও ধাপ্পা ধরতে পারেননি।

প্রতিভা ও পাগলামি

হয়ত এর পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই। কিন্তু ধারণাটা অনেক দিনের—প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই বলেছেন প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যোগাযোগ আছে। সুতরাং প্রচলিত ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রতিভার ইংরেজী 'জিনিয়াস'। এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন থেকে। 'জিনিয়াসের' গোড়ার অর্থ হল অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। রোমান পুরাণে বলা হয়, প্রত্যেক লোকই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশেষ এক দেবতার তত্ত্বাবধানে বাস করে। জিনিয়াস আবার দু'রকম—শুভ এবং অশুভ। অশুভ জিনিয়াসের প্রাধান্য হলে জীবন দুঃখময় হয়।

কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যা শুধু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা করা যায় না, এবং কেন যে সে-ই পারে অন্য কেউ পারেনা—এর যখন ব্যাখ্যা থাকে না, তখনই বুঝতে হবে এ হল প্রতিভার কাজ। প্রাচীনকালে সমাজ বিশ্বাস করতে পারত না কেউ নিজের ক্ষমতায় অসাধারণ কিছু করতে পারে। তাই প্রতিভাবানের কীর্তিকে জিনিয়াস বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কাজ বলে চিহ্নিত করা হত। ব্যক্তি জিনিয়াসের বাহন মাত্র।

প্রাচ্যের অনেক দেশে ধারণা ছিল যে উন্মাদ ব্যক্তির উপর দেবতার ভর হয়। তাই পাগলকে অবজ্ঞা না করে সমীহ করা হত। এখনও পৃথিবীর বন্য জাতিগুলির মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

সমাজের মধ্যে প্রতিভাবান এবং উন্মাদরাই অসাধারণ। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করা চলে না। এই অসাধারণত্বকে তাই অধিষ্ঠাতৃ দেবতার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর প্রাচীনকাল থেকেই এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তাদের অসাধারণত্ব যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই ধারণা বিভিন্ন যুগের মনীষীদের মন্তব্যের ফলে প্রচারিত হয়েছে। প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) বলেছেন, পাগলামি দু'জাতের: সাধারণ পাগলামি এবং দৈবানুগ্রহপুষ্ট মানসিক উন্মাদনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর উন্মাদনা কবিদের মধ্যে দেখা যায়।

অ্যারিস্টটলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) অভিমত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, পাগলামির স্পর্শ লাগেনি এমন কোনো মহৎ প্রতিভা দেখা যায়নি। রোমান দার্শনিক ও নাট্যকার সেনেকা (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪-খ্রীষ্টাব্দ ৬৫) অ্যারিস্ট-টলের উক্তি সমর্থন করেছেন। সেনেকার পূর্বে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সিসারো (খ্রীঃ পূঃ ১০৬-৪৩) এবং ল্যাটিন কবি হোরেস (খ্রীঃ পূঃ ৬৫-২৭) অ্যারিস্টটলের মতোই প্রতিভা ও পাগলামির সম্পর্ক স্বীকার করে মন্তব্য করেছেন। সেক্সপীয়রও কাব্য-প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে যোগাযোগ দেখতে পেয়েছেন : দি লুনাটিক, দি লাভার, অ্যাণ্ড দি পয়েট আর অব ইম্যাজিনেশান অল্ কম্প্যাক্ট।—মিডসামার নাইট্স্ ড্রিম, ৫ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

ফরাসী দার্শনিক ও বিজ্ঞান-সাধক পাসকাল (১৬২৩-৬৩) বলতেন, পাগলামি ও প্রতিভা চিরদিনের প্রতিবেশী। বিখ্যাত ফরাসী লেখক মঁতেনি (১৫৩৩-৯২) পাগলা গারদে তাসোকে (১৫৪৪-৯৫) দেখে এসে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি নিজেদের পাগলামির জন্য অকালে অক্ষম হয়ে পড়েন।

ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রের নিকট ড্রাইডেনের (১৬৩১-১৭০০) এই লাইন ক'টি সুপরিচিত :

> গ্রেট উইটস্ আর স্যুয়োর টু
> ম্যাডনেস অ্যালইড,
> অ্যাণ্ড থিন পার্টিসান্স ডু দেয়ার
> বাউণ্ডস্ ডিভাইড।
>
> --অ্যাবসালোম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল, ১ম সর্গ।

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। এদের মধ্যে প্রভেদ খুবই সামান্য।

ফরাসী দার্শনিক ও লেখক দিদেরো (১৭১৩-৮৪) প্রতিভাবানদের পাগলামি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হায়, যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা কত নির্বোধ !

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যে সম্বন্ধ আছে তা শোপেনহাউআরও (১৭৮৮-১৮৬০) বিশ্বাস করতেন। প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যেই তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, বেদনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল পাগল হওয়া। প্রতিভাবানের

বেদনাই সবচেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ আদি কবিকে উল্লেখ করে যা বলেছেন প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি সম্বন্ধেই তা সত্য :

অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়,
তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ ;

সুতরাং প্রতিভাবানদের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ এত বেশী করে চোখে পড়ে। অবশ্য অনেকে এই মতের বিরোধিতাও করেছেন। গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) স্বীকার করতেন না যে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির সম্পর্ক আছে। তাঁর ধারণা ছিল প্রতিভাবানের মধ্যে পরিবার ও সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। ডঃ জনসন (১৭০৯-৮৪) নিজে ছিটগ্রস্ত হলেও প্রতিভা ও পাগলামিকে পৃথক করেই দেখতেন। পূর্ণবিকশিত মানসিক শক্তি যিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন, জনসনের মতে তিনিই হলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি।

চার্লস্ ল্যাম (১৭৭৫-১৮৩৪) বিশেষ জোরের সঙ্গেই প্রতিভা ও পাগলামির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই ধারণার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিভাবান লেখক সবচেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ; তাঁর মানসিক বৈকল্য ধারণার অতীত। অথচ ল্যাম নিজে মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে ভুগেছেন। তাঁর দিদি তো পালাজ্বরের মতো কিছুদিন পর পরই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ল্যাম্ হয়ত নিজেকে প্রতিভাবানদের দলভুক্ত মনে করতেন না, তাই পাগলামির সঙ্গে প্রতিভার কোনো সম্পর্ক দেখতে পাননি।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মনীষীর অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের মতামত সমাজের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিভাবান ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত। সমাজ চিরাগত প্রথা ও ভাবনার দাস। নতুনকে গ্রহণ করতে সমাজ যে শুধু দ্বিধা করে তা-ই নয়, সক্রিয়ভাবে বিরোধিতাও করে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমাজে নতুনের অগ্রদূত হিসাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। প্রচলিত সামাজিক রীতি ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো কিছুকেই ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত বলে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলে প্রচার করা হত। কখনো বা বলা হত এঁদের উপর শয়তান ভর করেছে। য়ুরোপে চার্চের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিভার লাঞ্ছনা

ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমাজের তথাকথিত নেতাদের হাতে যে কত লাঞ্ছন ভোগ করেছেন তার কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। দীর্ঘকালের সামাজিক বিরোধের ফলে এই ধারণা প্রচার লাভ করেছে যে, প্রতিভা ও অসুস্থ মানসিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জীবনের ইতিহাস। তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অনেকেই মানসিক রোগে ভুগতেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে পাগলা গারদে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে লেখক, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রতিভাবানদেরই দেখা যাবে। মানসিক ব্যাধিতে যাঁরা ভুগতেন তাঁদের মধ্যে সক্রেটিস, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, বীঠোভেন, সুম্যান, গ্যালিলিও, মোৎসার্ট, ক্লাইভ, নিউটন, কোঁতে, নীটশে প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কবি ও ঔপন্যাসিকের রচনা যেমন প্রচার লাভ করে অন্যান্য প্রতিভাবানদের কীর্তি তেমন প্রচারিত হয় না। লেখকদের মতো নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করবার সুযোগও অন্য কারো নেই। তাছাড়া রচনার বহুল প্রচারের জন্য পাঠকদের মনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। যাঁর লেখা পড়ে আনন্দবেদনায় মন অভিভূত হয়ে পড়ে সেই লোকটির পরিচয় কি? এই আগ্রহের ফলে লেখকদের জীবনের কাহিনী সাধারণের মধ্যে যত প্রচাবিত হয় অন্য শিল্পীদের তেমন হয় না। হয়ত সেইজন্যই পাগলামির সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই লেখকদের দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। লেখকদের মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেউ একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ বা বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে মানসিক রোগের যেরূপ আধিক্য দেখা যায় অন্য কোনো শতকে তেমন দেখা যায় না।

ইটালিয়ান কবি তোরকোয়া তো তাসোর (১৫৪৪-১৬৫৯) জীবনের দুঃখময় ইতিহাস বিচিত্র নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ। তাঁর 'জেরুজালেম উদ্ধার' কাব্য ল্যাটিন সাহিত্যের একটি ক্লাসিক। তিনি ছিলেন ফেরারার ডিউকের সভাকবি। ডিউকের বোন লিওনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাসোর বিপদ ঘনিয়ে এল। তিনি

প্রাণভয়ে নেপল্স্ পালিয়ে এলেন; কিন্তু 'জেরুজালেম উদ্ধারের' পাণ্ডুলিপি ডিউকের সভায় রয়ে গেল। কাব্যগ্রন্থ এবং প্রণয়িনী হারিয়ে তাঁর মানসিক ভারসাম্য আর রইলো না। ১৫৭৯ থেকে সাত বছর তাঁকে পাগলা গারদে আটক রাখা হয়েছিল। তাসোর জীবনী অবলম্বন করে গ্যেটে একটি কাব্য-নাটক রচনা করেছিলেন। অন্যত্র গ্যেটে যে অভিমতই প্রকাশ করুন না কেন, এই নাটকে তাসোর করুণ কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে যোগসূত্র দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হয়। বায়রনও 'দি ল্যামেণ্ট অব তাসো' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

পাসকাল (১৬২৩-'৬২) বালক বয়সে একটি যোগ করবার যন্ত্র আবিষ্কার করে সমকালীন বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছিলেন। চিরজীবন তাঁর কর্মোদ্যম বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে বিভক্ত ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রতিভার অনুরূপ কীর্তি তিনি রেখে যেতে পারেননি। তাঁর 'চিন্তাধারা' বইটি শিক্ষিত সমাজে চিরদিন সমাদৃত হবে। পাসকাল উন্মাদ আশ্রমে যাবার মতো উন্মাদ কখনো হননি, কিন্তু মানসিক ব্যাধি তাঁর কর্মশক্তি অনেকটা পঙ্গু করেছিল। হ্যালুসিনেসানের জ্বালায় তিনি মানসিক শান্তি পেতেন না। তাঁর সর্বদাই মনে হত তিনি যেন এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে সরে আসবার উপায় নেই, যে কোনো মুহূর্তে গহ্বরে পড়ে যেতে পারেন। আর ছিল তাঁর অদ্ভুত জলাতঙ্ক। জল দেখলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এ-ছাড়া তীব্র মাথা ধরা এবং মৃগী রোগেও আক্রান্ত হতেন প্রায়ই।

'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর বিখ্যাত লেখক জোনাথান সুইফ্ট (১৬৬৭-১৭৪৫) জীবনে নাকি হেসেছেন মাত্র দু'বার। অথচ তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় কত হাসির খোরাক ছড়িয়ে আছে। একটা অস্বস্তিকর মানসিক পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁর কাকা মৃত্যুর পূর্বে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুইফ্টের উৎকেন্দ্রিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানসিক অস্থিরতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্টেলা ও ভানেসা নামক দুই মহিলার প্রতি তাঁর ব্যবহার। বিয়ে করবেন বলে দু'জনকেই কেবল আশা দিতেন; কিন্তু শেষ পযন্ত কাউকেই বিয়ে করেননি। সুইফ্ট সারা জীবন মাথা-ঘোরা রোগে ভুগেছেন। কানে শুনতে পেতেন না; চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। মুখের এক পাশ অবশ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় এমন অগ্নিশর্মা

হয়ে থাকতেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় হত। শেষ বয়সে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি এমন চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তাঁকে সংযত রাখার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে হয়েছিল। মৃত্যুর পর শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কের গঠন ত্রুটিপূর্ণ।

ডঃ জনসন (১৬৯৬-১৭৭২) যদিও নিজে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির কোনো সম্বন্ধ দেখতে পাননি তথাপি তাঁর জীবন থেকেই এর সমর্থনে দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন বিষাদ-রোগ বা মেলাংকলিয়া। জীবনের প্রথমার্ধ তাঁকে কাটাতে হয়েছে চরম দারিদ্র্যে এবং তার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ব্যাপি-কল্পনা বা হাইপোকণ্ড্রিয়া রোগে তিনি সর্বদা অস্থির থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি যেন শুনতেন অদৃশ্য নরনারী তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। অন্য কেউ শুনতে পেত না, কিন্তু তিনি শুনতে পেতেন। পথে চলতে চলতে হঠাৎ কি খেয়াল হ'ত, প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগুতেন। হয়ত খেতে বসেছেন, অকস্মাৎ পাশের ভদ্রমহিলার পা ধরে টানতে আরম্ভ করলেন। এমনি সব বিচিত্র বাতিকের বিবরণ লিখে গেছেন বসওয়েল। জনসনের আতঙ্ক ছিল তিনি বদ্ধ পাগল হয়ে যাবেন।

রুশোর (১৭১২-৭৮) পিতৃবংশে ছিল পাগলামির বীজ। যাঁর সামাজিক চুক্তি একদা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করেছিল তাঁর মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই ব্যাহত হত। রুশোর কাজে ও কথায় পরস্পর-বিরোধিতার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অনেক সময় যুক্তিহীন দুর্বোধ্য উক্তি করতেন। পাস-কালের মতো তিনিও ছিলেন হ্যালুসিনেসনের রোগী। তাঁর সব সময় মনে হত সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তিনি অত্যাচারীদের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন। বিষাদরোগ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

রোমান্টিক-পূর্ব যুগের ইংরেজ কবি কুপার (১৭৩১-১৮০০) কয়েকবার সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে ভালো থাকতেন, তখন কবিতা লিখতেন। সামান্য সরকারী চাকরে হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ হয়। একজন পৃষ্ঠপোষকের চেষ্টায় হাউস অব কমন্সে তিনি কেরানীর চাকরি পেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়োগের ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কুপারকে পরীক্ষা দিতে বলা হল। পাশ করলে চাকরি থাকবে, না হলে

আবার বেকার হতে হবে। চাকরি যাবার আতঙ্কে কুপার বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বটে কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেল। এক বছর উন্মাদ-চিকিৎসালয়ে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। শ্রীমতী আনউইন নামে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। তাঁকে বিয়ে করবেন বলে সব স্থির। এমন সময় (১৭৭৩) আবার তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। এর পর থেকে প্রায়ই তিনি মানসিক রোগে ভুগতেন। শ্রীমতী আনউইন তাঁর সেবা করতেন, সুস্থ অবস্থায় উৎসাহ দিতেন কবিতা লিখতে। শ্রীমতী আনউইন কুপারের আগেই মারা গেলেন। কুপার তাঁর সেবা করেছেন। এর পর যখন কুপারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে তখন তাঁকে সস্নেহে সেবা করবার কেউ ছিল না।

'মার্ভেলাস বয়' চ্যাটারটন (১৭৫২-৭০) দারিদ্র্যের জ্বালায় এবং কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে না পারার বেদনায় আত্মহত্যা করেছেন, এই কথা সকলে জানেন। কিন্তু তাঁর ল্যাণ্ডলেডির বিবৃতি থেকে জানা যায় আত্মহত্যার পূর্বে চ্যাটারটনের মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

উইলিয়ম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) সারা জীবন অলৌকিক ছায়ামূর্তি দেখতে পেতেন, শুনতে পেতেন তাদের কথা। চার বছর বয়সেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ঈশ্বর জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছেন। দেবদূত, বাইবেলের প্রফেট প্রভৃতির ছায়া তিনি সর্বত্রই দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হোমার, ভার্জিল, দান্তে ও মিলটন তাঁর দিবারাত্রির সঙ্গী। ব্লেক প্রচার করতেন যে, ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি ছবি আঁকেন ও কবিতা লেখেন। তিনি ঠিক উন্মাদ কখনো হননি, তথাপি স্বাভাবিক মানসিকতার যে অভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জার্মান কবি হলডারলিন (১৭৭০-১৮৪৩) গ্রীক ঐতিহ্য সমাপ্তি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি চিঠির আকারে রচিত 'হাইপেরিয়ান' কাব্যগ্রন্থ। জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর তাঁকে উন্মাদ আশ্রমে কাটাতে হয়েছে।

কবি ও জীবনীকার রবার্ট সাদে (১৭৭৪-১৮৪৩) অনেক গাথা কবিতা এবং জীবনী ও প্রবন্ধ লিখেছেন। আজ তাঁর খ্যাতি অনেকটা ম্লান হলেও সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮১৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের পোয়েট লরিয়েট। বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণের

জন্য তাঁকে প্রচুর লিখতে হত। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে ভুগেছেন।

চার্লস ল্যাম (১৭৭৫-১৮৩৪) ও তাঁর দিদির করুণ কাহিনী সুপরিচিত। তাঁদের বংশে পাগলামির বীজ ছিল। ল্যামের বয়স যখন মাত্র কুড়ি তখন তিনি মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত হন। ছ' সপ্তাহ পরে পাগলা গারদ থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর দিদিও বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন। একদিন উন্মত্ত অবস্থায় মাকে খুন করে ফেলল মেরি। ল্যাম দিদিকে দেখা-শোনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। পাছে দিদির অযত্ন হয়, এজন্য তিনি বিয়ে করেননি।

উনবিংশ শতকের আমেরিকান সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯)। পো ছিলেন একাধারে কবি, গল্পলেখক এবং সমালোচক। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে। ১৮৪৭ সালে স্ত্রী ভার্জিনিয়ার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। কেবল মদ খেতেন আর সেই নেশা দিয়ে বেদনা ভুলে থাকতে চাইতেন। একবার আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর থেকে প্রায়ই তিনি অল্প সময়ের জন্য মানসিক বৈকল্যে ভুগতেন, আবার সুস্থ হয়ে উঠতেন। মত্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

'সুপারম্যানের' তত্ত্ব প্রচারক নীটশে (১৮৪৪-১৯০০) দার্শনিক গ্রন্থ লিখলেও তাঁর রচনাবলী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এমন মৌলিক যাঁর দর্শনচিন্তা তিনিও শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারেননি। ১৮৮৯ সালে তিনি পাগল হয়ে যান। পাগলা গারদে তাঁকে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সুস্থ হতে পারেননি।

মোপাসাঁ (১৮৫৯-৯৩) তাঁর পরিণতি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে আরম্ভ হয়। এমন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, মনে হয় যেন ফেটে পড়বে। চোখে সব অন্ধকার মনে হয়। তবু সে যুগের রীতি অনুযায়ী কপালের দু'পাশে বড় বড় জোঁক লাগিয়ে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতেন। পাগল হবার আশঙ্কা তাঁর বরাবরই ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে পাগলের লক্ষণ জেনে নিয়ে নিজের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। ছোট ভাইয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ায় তাঁর আতঙ্ক আরো বাড়ল। পাগল হয়ে বেঁচে থাকবার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তিনি ক্ষুর দিয়ে গলা

একটু কাটলেন, আত্মহত্যা করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। দেড় বছর বদ্ধ পাগল অবস্থায় বাতুলাশ্রমে থেকে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মোপাসাঁর অনেক বই পাগল হয়ে যাবার আতঙ্কের ছায়ায় রচিত।

ভার্জিনিয়া উলফের (১৮৮২-১৯৪১) মতো এমন তীক্ষ্ণধীসম্পন্না লেখিকা ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে পেয়েছেন সম্মান ও ভালোবাসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে বোমা পডতে শুরু হবার পর থেকে ভার্জিনিয়া বড বিচলিত হয়ে পডেন। তাঁর দিনলিপি থেকে অসংলগ্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। লণ্ডনের উপরে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। স্বামীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে এসে বাস করতে লাগলেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে একদিন স্ত্রীর খোঁজে এসে স্বামী দেখলেন তাঁর নামে একটি চিঠি টেবিলের উপর চাপা দেওয়া আছে, ভার্জিনিয়া কোথাও নেই। নিকটে নদী। নদীর তীরে পাওয়া গেল ভার্জিনিয়ার টুপি ও বেডাবার লাঠি। পনেরো দিন পবে নদীর জল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার কবা হল। চিঠিতে স্বামীকে ভার্জিনিয়া লিখেছেন: 'আমার আশঙ্কা হয় আমি পাগল হয়ে যাব। অদৃশ্যলোক থেকে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে এসে আমাকে অস্থির করে, কিছুতেই কাজে মনঃসংযোগ করতে পারি না। এই মানসিক বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেছি, কিন্তু আর পারছি না।...পাছে তোমার জীবন আমার জন্য দুঃখময় হয়ে ওঠে, এইজন্য আমি বিদায় নিচ্ছি।'

ওপরে লেখকদের জীবন থেকে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন যাঁদের মন ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। তাহলে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যোগাযোগ সম্বন্ধে ধারণাটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? তীক্ষ্ণ অনুভূতি, মানসিক সচেতনতা এবং মাত্রাতিরিক্ত উদ্দীপনা প্রতিভার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ। যে ঘটনা বা দৃশ্য অন্য লোকের মনে রেখাপাত করে না প্রতিভাবানের হৃদয়ে তা হয়ত প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কখনো ভুলে থাকা প্রতিভাবানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবির 'নিত্য জাগরণ'; মন ও অনুভূতির নিরন্তর সচেতনতা প্রতিভার লক্ষণ। স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ গঠনের উপরেই এইসব লক্ষণ নির্ভর করে। পাগলামিও স্নায়ুরোগ। উন্মাদ ব্যক্তির প্রবল উত্তেজনা, অস্থিরতা ও বিষাদ স্নায়ুবিকৃতির বাহ্যিক প্রকাশ। সুতরাং পাগলামি ও প্রতিভা দুই-ই স্নায়ুমণ্ডলীর

উপর নির্ভরশীল। উত্তেজনার প্রকৃতি ও স্নায়ুর গঠন অনুসারে প্রতিভাবানের উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়া হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ। উন্মাদ ব্যক্তির মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা দেয় তার ফলে তাদের কারো কারো মধ্যে অকস্মাৎ কিছু প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোনো দিন ছবি আঁকেনি বা কবিতা লেখেনি পাগলা গারদে গিয়ে সে হয়ত চমৎকার ছবি এঁকেছে, সুন্দর কবিতা লিখেছে। ভ্যান গগ বাতুলাশ্রমে বন্দী থাকবার সময়ও ছবি এঁকেছেন। বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রম থেকে উন্মাদ ব্যক্তিদের আঁকা ছবির নমুনা সংগ্রহ করে একটি বই সংকলন করা হয়েছে। রাঁচীর পাগলা গারদের শিল্পীদের ছবির নমুনাও এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রতিভা ও পাগলামি,—এই দুইয়ের মূলেই রয়েছে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রভাব। সুতরাং খুব সামান্য হলেও দুইয়ের মধ্যে কিছু সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না।

আফ্রিকার সাহিত্য

দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ লেখকরা আফ্রিকার পটভূমিকায় অনেক বই লিখেছেন। প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক টমাস প্রিঙ্গ্‌ল্ (১৭৮৯-১৮৩৪)। তাঁর 'দি বাকুয়ানা বয়' বোধ হয় আফ্রিকার অধিবাসীদের সমস্যা নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে লেখা প্রথম উপন্যাস। এরপর ওলিভ শ্রাইনারের উপন্যাস 'স্টোরি অব অ্যান আফ্রিকান ফার্ম' (১৮৮৩) নানা কারণে ইংরেজী সাহিত্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সারা গারট্রুড মিলিন-এর 'গড্‌স্ স্টেপ চিলড্রেন' (১৯২৪) বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় এবং শিল্পসৌকর্যে উল্লেখযোগ্য। কবি রয় ক্যাম্পবেলের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, স্কুলের পড়াও সেখানে করেছেন, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে য়ুরোপে। প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকা কেন্দ্র করে অনেক ইংরেজী বই লেখা হয়েছে। সেই সব বই সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস এবং সমালোচনাও পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সাহিত্য যদিও সমালোচকের নিকট 'দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্য' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তবু প্রকৃতপক্ষে একে আফ্রিকার সাহিত্য বলা চলে না। আফ্রিকা যাদের বহু পুরুষের মাতৃভূমি, যারা আফ্রিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্মবোধ উপলব্ধি করে, যাদের রঙের জন্যই শ্বেতকায়দের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যে সাহিত্যে তাকেই আফ্রিকান সাহিত্য বলা যায়।

আফ্রিকার মাটির মানুষদের এই সাহিত্যের পরিচয় লাভের সুযোগ আমাদের পক্ষে খুবই সংকীর্ণ। সংকীর্ণ নানা কারণে। বহু ভাষার দেশ আফ্রিকা। সে-সব ভাষা আয়ত্ত করে সাহিত্যের একটি নতুন জগৎ আবিষ্কারের আগ্রহ এখনও বিশেষ দেখা যায় না। আফ্রিকার ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভারতও বহু ভাষার দেশ। কিন্তু ভাষার বিভেদের মধ্যে ইংরেজী এনেছে ঐক্য। আফ্রিকায় য়ুরোপের নানা জাতি তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষাও বিভিন্ন রাষ্ট্রের এলাকায় রাজভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজীর মত এমন একটি

সুপরিচিত ভাষা নেই যার মাধ্যমে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

আফ্রিকান সাহিত্যের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। সেই সাহিত্যের ভাণ্ডারে এখনো এমন সম্পদ সঞ্চিত হয়নি যা বিদেশী অনুবাদক এবং প্রকাশকদের আকৃষ্ট করতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকা মহাদেশে নতুন প্রাণের সাড়া জেগেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে অন্ধকার মহাদেশের অধিবাসীরা। এই নতুন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের তাড়নায় আফ্রিকার সাহিত্য দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ইটালীয়ান অথবা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষা-গোষ্ঠীর বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও এই নবীন সাহিত্যে নতুন জীবনের পিপাসা পরিস্ফুট।

আফ্রিকার আয়তন ১,১৭,০০,০০০ বর্গ মাইল; অর্থাৎ, য়ুরোপের তিনগুণ এবং ভারতের প্রায় নয়গুণ বড। সেই তুলনায় লোকসংখ্যা খুবই কম,—মাত্র ২১,৬০,০০,০০০। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার বিভিন্নতা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী।

আফ্রিকার সকল ভাষা সম্পর্কিত তথ্য এখনো সংগৃহীত হয়নি। তবে ভাষাবিজ্ঞানীরা আফ্রিকার ভাষাগুলিকে পাঁচটি প্রধান গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এই ভাষা-গোষ্ঠীগুলির নাম হল বান্টু, সুদানী, হামিটিক, সেমিটিক ও বুশম্যান। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮২, ২৬৪, ৪৭, ১০ ও ১১।

বান্টু এবং সুদানী ভাষা-গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত। এই গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আফ্রিকার প্রায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত এই সব ভাষা ব্যবহার করে। উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষা হামিটিক। মিশর ও ইথিওপিয়ায় ব্যবহৃত হয় সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষা। বুশমান ভাযা-গোষ্ঠীর ব্যবহার দেখা যায় কালাহারি মরুভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে। আন্তর্জাতিক আফ্রিকান ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি কয়েক বছর পূর্বে নতুন বানান পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন; প্রধান প্রধান কতকগুলি ভাষায় সেই পদ্ধতি গ্রহণ করবার ফলে ভাষার হট্টগোলের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূচনা দেখা দিয়েছে।

অন্য সকল দেশের মতো আফ্রিকার প্রাচীনতম সাহিত্য রচিত হয়েছে

লোকের মুখে মুখে। ধর্মোৎসব উপলক্ষে গান রচিত হত; তারপর ভ্রাম্যমাণ গায়করা সেই গান গেয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। এ ছাড়া গল্প, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ প্রভৃতি মৌখিক রচনাগুলি প্রাক-লিপিযুগের সাহিত্যের ভাণ্ডারে ছিল প্রধান সঞ্চয়। কথক ও গায়কের মুখেই ছিল তাদের আশ্রয়। আফ্রিকায় মৌখিক-সাহিত্যের যুগ ছিল সুদীর্ঘ কালের। কারণ আফ্রিকানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে অনেক পরে।

বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান যেমন স্বীকার করতে হয়, তেমনি আফ্রিকান সাহিত্যের সূচনা মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের প্রচেষ্টা থেকেই আরম্ভ হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মান্তরিত আফ্রিকানদের দিয়ে লেখান হত ধর্মসঙ্গীত এবং যীশুর জীবন সম্পর্কিত কাহিনী। ধর্মপ্রচারেব তাগিদে হয়েছিল মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন। আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষার জন্য মিশনারীরা রোমান বর্ণমালার ব্যবহার আরম্ভ করবার ফলে মুদ্রণের প্রসার ঘটল এবং আফ্রিকান সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু হল প্রায় সেই সময় থেকে।

আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের মোটামুটিভাবে আরম্ভ হয়েছে বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই। আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হল লেখকেব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ। পূর্বে লেখকরা নিজেদের নাম গোপন করে রাখত, রচনা প্রকাশিত হত বেনামীতে। এবার শুধু নামপত্রে নয়, রচনায় সর্বত্র লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ফুটে উঠল।

এই নতুন যুগের প্রথম লেখক দক্ষিণ আফ্রিকার স্যামুয়েল এডওয়ার্ড ক্রুন মকহায়ি। তিনি অনেকগুলি ভক্তিমূলক গান লিখেছেন, আর লিখেছেন একটি কাহিনী, ইটায়লালামাওয়েলে বা যমজদের কলহ। খোসা সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে এখনো তাঁর রচনা স্কুলের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

বাসুতোল্যাণ্ড নিবাসী টমাস মোফোলো সর্বপ্রথম সমকালীন জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভকে সাহিত্যে রূপায়িত করেন। সুতরাং আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন। খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম; শিক্ষালাভ করেছেন মিশনারী স্কুলে। তারপর জীবন আরম্ভ করলেন প্যারিস ইভানজেলিক্যাল মিশনের প্রুফ রীডার হিসাবে। এই মিশনের অন্যতম কাজ ছিল ধর্মপুস্তিকা বিতরণ করা। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম বই 'প্রাচ্যের যাত্রী' হয়ত

সেই জন্যই মূলত খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে রচিত। নায়ক ফেকেসি সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে প্রাচ্য ভূ-খণ্ডের অভিমুখে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করবার পর ফেকেসি সমুদ্রতীরে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তিন জন য়ুরোপীয়ান তাকে জাহাজে এনে ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ করে তুলল। ফেকেসিকে তারা প্রথম নিয়ে এল য়ুরোপে, সেখান থেকে ফিরে এল আফ্রিকায়। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারল ঈশ্বর পুর্ব দেশে নেই, আছেন স্বর্গে, য়ুরোপীয়ানরা ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলে, সুতরাং তাদের সাহচর্যে থাকলে একদিন ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যাবে।

এখানে স্পষ্টই মোফোলো খ্রীষ্টধর্মেব প্রতি তাঁর প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর রচনার গুণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। মোফোলোর পরবর্তী বই 'চাকা' আফ্রিকান সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। নায়ক চাকা জুলু জাতির কৃষ্ণকায় নেপোলিয়ন। প্যাগানিজম দূর করবার জন্য সে ডাকিনী-বিদ্যার শরণাপন্ন হল। ডাকিনী-বিদ্যাকে চাকা পাপ বলে মনে করা সত্বেও তার আশ্রয় নিয়েছিল বৃহত্তর পাপ প্যাগানিজমকে পরাস্ত করবার উদ্দেশ্যে। পাদ্রি সাহেবরা পাণ্ডুলিপি পড়ে কিন্তু খুশী হল না। কাবণ ডাকিনী-বিদ্যা প্যাগানিজমেরই অন্তর্গত। প্রকৃত-পক্ষে কাহিনীতে প্যাগানিজমের জয় দেখানো হয়েছে। সুতরাং দীর্ঘ বিশ বছর পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল। তখন ছাপাখানাগুলি প্রায় সবই ছিল মিশনারিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। তাছাড়া নিজের টাকায় ছাপাবাব মত সম্বলও ছিল না। মোফোলো ভগ্নমনোরথ হয়ে লেখা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শ্বেতকায়দের উপর আস্থা হারালেন না। প্রুফ রীডারের চাকরি ত্যাগ করে তিনি জীবিকার্জনের জন্য নানা কাজ করেছেন। তারপব জমি কিনলেন চাষাবাদ করে শান্তিতে দিন কাটাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কৃষ্ণকায়দেব পূর্বগ্রিকোয়াল্যাণ্ডে এই অধিকার ছিল না। তাঁর জমি বাজেয়াপ্ত হল। তিনি সবকিছু বিক্রি করে মামলার খরচ চালালেন। কিছুই হল না, জমি গেল, শ্বেতকায়দের উপর আস্থা হারালেন; আর বোধ হয় খ্রীষ্টধর্মের উপর বিশ্বাসও একটু টলে উঠল। ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে তিনি পরলোক গমন করেছেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

খ্রীষ্টধর্ম ও শ্বেতকায় জাতির উপর আস্থা বিচলিত হবার পব থেকে মোফোলো লেখা বন্ধ করেন। শুধু এই চারিত্রিক সততার উপরই তাঁর রচনার মূল্য নির্ভর করে না। তাঁর রচনারীতি এখন পর্যন্ত বাণ্টু সাহিত্যের আদর্শ। মোফোলো বাইবেলের আদর্শে প্রাঞ্জল অথচ বেগবান রচনারীতি গড়ে তুলেছেন।

মোফোলোর সাফল্য বাণ্টু ভাষা-গোষ্ঠীর সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তাঁর বন্ধু জাকিয়া ম্যাঙ্গোয়েলা ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং প্রাণীজগৎ নিয়ে গল্প লিখেছেন। অ্যাজারেয়েল সেকিসে লিখেছেন ব্যঙ্গাত্মক উপকথা। বাসুতো দলপতি মোশেশু-র জীবনী নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছেন থেকো বেরেঙ্। প্রাচীন জীবনের সারল্য ও ধর্মপ্রবণতার সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের নীতিহীনতার তুলনা করে গল্প লিখেছেন সেগোয়েটে। বেচুয়ানার সলোমন প্লাটজে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি বই লিখেছেন। দক্ষিণাঞ্চলে আফ্রিকানদের উপর যে অত্যাচার করা হত তার মর্মন্তুদ চিত্র পাওয়া যাবে এঁর রচনায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহুদী' য়ুরোপীয়ান সাহিত্যের আদর্শে রচিত, আফ্রিকান জীবনের বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট, সুতরাং সার্থক হয়নি। ইংরেজী ভাষায় যে-সব আফ্রিকান লিখেছেন তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে এঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কোন কোন লেখক আফ্রিকানদের জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে উপন্যাস লিখেছেন। আর্থার নাথল ফুলার রচনা থেকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। জোহান্‌স্‌বুর্গের এক আফ্রিকান তরুণের কাহিনীতে তিনি শুধু বলেছেন সিনেমা, মদ ও নারীর প্রতি আকর্ষণের কথা। বর্ণবিদ্বেষ, দারিদ্র্য এবং লাঞ্ছনার চিত্র কোথাও নেই। যেখানেই এসব সমস্যার ইঙ্গিত এসেছে সেখানেই তিনি প্রার্থনাকে সমাধানের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন।

অবশ্য এর কারণও আছে। প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপির জন্য একটি শর্ত আরোপ করত। তা হল এই যে, বইটি যেন বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী হয়। এই শর্ত পালন করতে হলে রাজনীতি এবং ধর্মের আলোচনা বর্জন করা অত্যাবশ্যক। আফ্রিকায় প্রকাশন শিল্প এমন বিস্তার লাভ করেনি যে লেখকের রুচি অনুযায়ী বই লিখলেও ছাপানো সম্ভব হবে। জুলু-ঐতিহাসিক ধলোমো ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আফ্রিকান ও ভারতীয়দের মধ্যে দাঙ্গার কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন, এখনো তা ছাপা হয়নি। এই জন্য সমকালীন সমস্যা এড়িয়ে অনেক লেখক হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন অথবা বিতর্কহীন ভক্তিমূলক গান লেখেন। তবু সুযোগ পেলে এঁরা এমন দু'একটি মন্তব্য করেন যা থেকে অনুভূতিপ্রবণ লেখকদের জ্বালা ও বেদনা প্রকাশ পায়। কেওয়া ভাষায় লেখা স্যামুয়েল নাটারার উপন্যাস 'সর্দারের ব্যবসা'র এক জায়গায় একজন য়ুরোপীয়ান বলছে: "ট্যাক্স আদায়ের জন্যই

আমি আফ্রিকায় এসেছি।" এই উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। আফ্রিকার বেদনা মূর্ত হয়েছে সেই সব লেখকের রচনায় যাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশের নাগরিক হয়ে ইংরেজীতে বই লিখছেন। এঁদের মধ্যে পিটার আব্রাহামস্ এবং এজেকিয়েল মফাহলেলের নাম উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান অনুসারে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ অনুযায়ী আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির ক্রমোন্নতি ঘটছে। স্প্যানিশ গিনিতে একজন লেখকও নেই,—স্প্যানিশ সরকারের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে। ফরাসী ও পোর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে লেখকের সংখ্যা কম নয়। এঁরা যে শুধু স্থানীয় ভাষায় লেখেন তা-ই নয়, শাসকদের ভাষায় গ্রন্থরচনা করেও এঁরা বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন। সেনর আন্দ্রাদ সম্পাদিত আফ্রিকান কবিতার পোর্তুগীজ সংস্করণ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হবার পরই য়ুরোপের সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রুয়াণ্ডার কবি কাগামে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে লিখছেন এক বিরাট মহাকাব্য। এর ফরাসী অনুবাদ (১৯৫২) করেছেন কবি নিজেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকার রাজনীতি-সচেতন লেখকদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য বিদেশী শাসকদের মর্জির উপর এই প্রকাশের মাত্রা বহুলাংশে নির্ভর করত এবং তার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বে দিয়েছি। রাজনৈতিক মুক্তি-কামনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও এল মুক্তির প্রেরণা। শুধু রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি নয়, রীতির বন্ধন ও আফ্রিকান হয়ে জন্মাবার জন্য হীনমন্যতা-থেকে মুক্তি। এই উপলব্ধিকে বলা যেতে পারে আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব। যে-সব আফ্রিকান লেখক ফরাসী ভাষায় লিখতেন, বিশেষ করে তাঁরাই ফরাসী সুর-রিয়ালিস্ট কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব' প্রকাশের জন্য ফরাসী শব্দ একটু বদলে, মোচড় দিয়ে, নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ য়ুরোপীয় ঐতিহ্যের বাহক যে ভাষা তার ব্যঞ্জনার কিছু রূপান্তর ঘটিয়ে উপযোগী করা হল আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব প্রকাশের। সাহিত্যে 'আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব' প্রকাশের নামকরণ হল 'নেগ্রিট্যুড'। এই নতুন রীতির মধ্যে বুদ্ধিজীবী লেখকরা মুক্তি পেলেন, আফ্রিকার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলন ঘটল পাশ্চাত্ত্যের নবমানসিকতার; আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নবীন লেখকদের রচনা।

'নেগ্রিট্যুড'-এর প্রবর্তক কবি আইমে সিজেয়ার এবং লিওপোল্ড সেন্‌ঘর। সেন্‌ঘর ফরাসী ভাষায় 'নেগ্রিট্যুড' কবিতার চারটি বই লিখেছেন। নেগ্রিট্যুড ভাবধারার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে মংগো বেটির (ছদ্মনাম-এজা বোট্টা) উপন্যাস Le Pauvre Christ de Bomba (১৯৫৬) থেকে। এক পাদ্রি তাঁর সঙ্গে যুক্ত আফ্রিকানদেব মনোভঙ্গী থেকে উপলব্ধি করলেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি যে মিশন গড়ে তুলেছেন তা দেশের কোনই মঙ্গল করেনি। তাঁব আফ্রিকান পাচককে জিজ্ঞাসা কবলেন, বিশ বছর পূর্বে যে আগ্রহের সঙ্গে সবাই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিত, মিশনেব ডাকে যে-ভাবে সাড়া দিত, আজ সে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নেই কেন? পাচক উত্তব কবল: The first of us who came flocking to religion, to your religion, they came there as if to a revelation a school where they might acquire the revelation of your aeroplanes, your railways and what the secret of your mastery, in fact. Instead of that you started to talk to them God, soul, eternal life and so on Do you think that they did not know about all that before, well before, your arrival?

নেগ্রিট্যুডের পূর্বে এ জাতীয় উক্তি কোন আফ্রিকানের মুখ দিয়ে বলানো সম্ভব ছিল না।

ঘানার কবি ফ্রান্সিস আর্নেস্ট কোবিনা পার্কস্ শ্বেতকায়দেব মনুষ্যহীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণেব গৌববে গৌববান্বিত বোধ করছেন:

Give me black souls,
Let them be black
Or chocolate brown
Or make them the
Colour of dust—
Dustlike,
Browner than sand
But if you can
Please keep them black.

সিয়েরা লিওনের কবি আবিওসেহ্ নিকল এতদিনে নিবিড় অরণ্যের আদিম পরিবেশে আফ্রিকার আত্মাকে খুঁজে পেয়েছেন:

যাও জঙ্গলে, জঙ্গলে যাও, গভীর বনে—
সেখানে খুঁজে পাবে তোমার লুকানো হৃদয়,
তোমার পুর্বপুরুষের মূক আত্মা।
তাই পথ দিয়ে নেচে নেচে
আমি গেলাম জঙ্গলে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক রিচার্ড রিভ-এর গল্প 'বেঞ্চ' উল্লেখযোগ্য। জোহান্‌সবার্গ শহরে পথের ধারে সভা হচ্ছে। বক্তা আবেগময় ভাষায় বলছে, গায়ের রঙ কালো বলেই কেন এক দল লোককে নীচে দাবিয়ে রাখা হবে, তার কোন কারণ নেই, সংসারে সব মানুষই সমান। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলেরই সমান অধিকার।

কার্লি এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। সভা ভেঙ্গে গেল। কার্লিকে বাড়ী ফিরতে হবে, সে থাকে শহরতলিতে। হাঁটতে হাঁটতে এল স্টেশনে। তখনো গাড়ী আসবার দেরী আছে। স্টেশনে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ কার্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি শূন্য বেঞ্চ; তার গায়ে শাদা রং দিয়ে লেখা: 'একমাত্র য়ুরোপীয়ান যাত্রীদের জন্য।' প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে, কোনদিন তো এমন করে বেঞ্চটি চোখে পড়েনি? হয়ত আজকের বক্তৃতা অবচেতন মনে কাজ করেছে। এই শাদা অক্ষরগুলি মানব অধিকারের শত্রু হিসাবে যেন সঙ্গিন তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুর আহ্বান কার্লিকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সব মানুষ এক,—শাদা-কালোর ভেদ নেই। এই বেঞ্চটিই প্রতিপক্ষ, সমগ্র মানবজাতি যেন কার্লিকে আহ্বান করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

কার্লি ধীর পায়ে সেই বেঞ্চে গিয়ে বসল। তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। কত দিনের কুসংস্কার। রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে শ্বেতকায়ের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি! জোরে দুই হাতে বেঞ্চ আঁকড়ে ধরে বসে রইল।

কিছুক্ষণ কেউ লক্ষ্য করল না কার্লিকে। তারপর এল এক সাহেব। বলল, জানো না, নিগ্রোদের জন্য বেঞ্চ আছে ওদিকে। ওঠো।

কার্লি কিছুই বলল না। বেঞ্চ আঁকড়ে বসে রইল। চারদিকে ক্রমশ ভিড়

জমে গেল। এল পুলিশ; কিল-ঘুষি নেমে এল কার্লির উপর। নিছক গায়ের জোরেই তাকে টেনে তোলা হল বেঞ্চ থেকে।

সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠার ছোট গল্প। এই একটি গল্পে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়।

ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক কামারা লায়ে। এঁর একটি উপন্যাসে 'আফ্রিকান ব্যক্তিত্বের' প্রকাশ হয়েছে নতুন ভাবে। এতদিন সাহিত্যে আফ্রিকানদের য়ুরোপীয়ান জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা গ্রহণ করবার কথাই পাওয়া যেত। আফ্রিকার কিছু দেবার নেই—এই নিগূঢ় ধারণা থেকেই এরূপ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকার যে দেবার আছে, সে যে একেবারে রিক্ত নয়, কামারার উপন্যাস থেকে এই নতুন বিশ্বাসের সমর্থন পাওয়া যায়।

আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যই সবাই লেখেন, এমন ধারণা করা অবশ্য ভুল হবে। নিছক শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও গল্প, কবিতা ও উপন্যাস আফ্রিকার আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিতে লেখা হয়ে থাকে। ঘানার ম্যাবেল ডোভ্-ভাংকুযাব 'প্রতীক্ষা' গল্পটি সার্থক সৃষ্টি। সর্দার দ্বিতীয় আডাকুর বয়স পঞ্চান্ন, চল্লিশটি স্ত্রী। উৎসবের দিনে একটি মেয়েকে দেখে আডাকু ব্যাকুল হয়ে উঠল। একে তার সে দিনই চাই। টাকা দিয়ে লোক পাঠাল। সারাদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সন্ধ্যাবেলা তাব দেখা পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল। মেয়েটি কাছে এসে বলল, আমি তোমারই স্ত্রী, দু'বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার কৌলিন্য প্রথার কথা মনে পড়ে যায়। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজের স্ত্রীকে চিনতে না পেরে 'মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আফ্রিকা এখন প্রাচীন-প্রথার জীবন থেকে নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং পুরানো সংস্কারগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়েছে আফ্রিকান লেখকদের।

আকোয়া লালুয়া ক্রীতদাসীর মধ্যেও সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন। হোটেলে ক্রীতদাসী পরিচারিকার কাজ করে। খদ্দের যারা আসে তাদের আহার্য ও পানীয় পরিবেশন করাই তার কাজ। হাত দিয়ে যে সব অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে লোকে শুধু তাই দেখে:

> But who can guess, or even surmise
> The countless things she served with her eyes?

আধুনিক আফ্রিকার সাহিত্যের সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বাংলা সাহিত্যের সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মুক্তির কামনাই এই দুই সাহিত্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতির সূত্র। তাই অনেক বাধা অতিক্রম করে আফ্রিকার সাহিত্যের সামান্য একটু প্রাণধারার যখন স্পর্শ পাওয়া যায় তখন আত্মীয়তা অনুভব করি।

সুইডিশ সাহিত্য ঃ আধুনিক যুগ

নোবেল পুরস্কারের দেশ সুইডেন। সুইডিশ আকাদেমি সাহিত্যের পুরস্কারের জন্য যাঁকে নির্বাচন করেন তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর সকল দেশের পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের স্থষ্টি হয়। নির্বাচনের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও নানা তর্ক ওঠে। একেবারে অপরিচিত লেখকও পুরস্কার পেয়ে অকস্মাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশ্ব-সাহিত্যের উপর যে দেশের এত বড প্রভাব সে দেশের সাহিত্যের পরিচয় জানবার সুযোগ কিন্তু বেশী নেই। ইংরেজী ভাষায় সুইডিশ সাহিত্যের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস বিরল। আধুনিক লেখকদের অনেক বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি। সুইডেনের বাইরে শুধু স্বেডেনবর্গ, স্ট্রীণ্ডবার্গ, সেলমা লাগেরলফ এবং লাগেরকভিস্টের নাম পাঠক মহলে পরিচিত। লাগেরলফ, লাগেরকভিস্ট, হেইদেনস্তাম ও কার্লফেলদৎ—এই চারজন সুইডিশ লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত দু'জন লেখকেব রচনা স্বদেশের বাইরে প্রচার লাভ করেনি।

যুরোপের মূল ভূ-খণ্ডের জীবনপ্রবাহের আবর্ত থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াব দেশগুলি বরাবরই একটু দূরে থাকে। ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়ার মতো সুইডেনকে বর্তমান শতকে রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে পডতে হয়নি। তাছাডা আয়তন, জনসংখ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচার করলেও সুইডেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ দাবী করতে পারে না। সুইডেনের মোট আয়তন প্রায় ১,৭৩,০০০ বর্গ মাইল, এর মধ্যে প্রায় পনেরো হাজার বর্গ মাইল অধিকার করে আছে ছোট বড নানা আকারের হ্রদ। মোট জমির শতকরা দশ ভাগ মাত্র চাষ করা হয়। জনসংখ্যা প্রায় ৭৭,০০,০০০। সাত বছরের উপরে যাদের বয়স তারা প্রায় প্রত্যেকেই সাক্ষর। নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম। প্রতি বছর সুইডেনে পাঁচ ছয় হাজার বই বের হয়। এদের মধ্যে শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ শিল্প ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয়, ঊনত্রিশ ভাগ সমাজবিদ্যা এবং সাতাশ ভাগ বিজ্ঞান-বিষয়ক। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪। এদের মধ্যে মোট সাক্ষরের সংখ্যা প্রায় এক কোটি আঠারো লক্ষ। বাংলা ভাষায় বছরে গড়পড়তা তিন হাজার বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই সাহিত্য-বিষয়ক।

সুইডেনের প্রাচীন সাহিত্য গাথা-জাতীয় কাব্যে সমৃদ্ধ। এই সব কাব্য লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। লিখিত রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন শিলালিপিতে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার লাভ করবার পরে ল্যাটিন ভাষার আধিপত্য শুরু হল। সুইডিশ সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয়ে গেল। নতুন যুগের সূত্রপাত হল ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর ওলাউস্ পেট্রি সুইডিশ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। এর পর থেকে ধীরে ধীরে সুইডিশ ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সুইডিশ কবিদের মধ্যে স্টিয়েরনহিয়েল্‌ম, ড্যালিন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য লেখক মাইকেল বেলম্যান ও হেনরিক কেলগ্রিন। স্ট্রীণ্ডবার্গের পূর্বে বেলম্যানই একমাত্র সুইডিশ লেখক যিনি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করতে পারেন। গুস্তাভ যুগের তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। রাজা তৃতীয় গুস্তাভ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিচ্ছিন্ন সুইডেন সাম্রাজ্য সংহত করেন। তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন; নানা অত্যাচার করেছেন। তথাপি সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি। লেখকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিছু ক্ষুণ্ণ হলেও তাঁরা গুস্তাভের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য পেতেন। লেখকের সামাজিক মর্যাদা ঐ সময় থেকেই শুরু হয়। সুইডিশ আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গুস্তাভের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুইডেনের রঙ্গমঞ্চও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করে। রাজা গুস্তাভের নিকট থেকে প্রেরণা না পেলে সুইডিশ সাহিত্যের অগ্রগতি অনিশ্চিত কালের জন্য রুদ্ধ হয়ে থাকত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে লেখক স্বদেশের বাইরে সমাদৃত হয়েছেন তিনি এমানুয়েল স্বেডেনবর্গ। তিনি অবশ্য কাব্য উপন্যাস বা নাটক রচনা করেননি। বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। ইমার্সন প্রমুখ মনীষীরা তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সুইডিশ লেখকদের মধ্যে বোধহয় স্ট্রীণ্ডবার্গের পরেই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছে।

গুস্তাভের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সুইডিশ সাহিত্যের যে ক্রমোন্নতি শুরু হল তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক প্রতিভাবান কবি ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছিল। স্ট্যাগনেলিয়াস, ফ্রান্‌ৎসেন, রুনেবার্গ, টেগনার, রিডবার্গ, ক্রুসেনটল্‌প, ফ্রেডিকা ব্রেমার, টোপোলিয়াস প্রভৃতি লেখকদের কবিতা ও উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর সুইডিশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই শতকের

একটি উল্লেখযোগ্য বই হল "দি বুক অব দি থর্ন রোজ।" চৌদ্দ খণ্ডের এই গ্রন্থ রোমান্সের সংকলন।

আধুনিক সুইডিশ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতার গৌরব নিঃসন্দেহে অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রাপ্য। ১৮৪৯ সালে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের মধ্যে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। শুধু যে তাঁর জীবন দুই শতাব্দীতে বিস্তৃত তা-ই নয়; তাঁর রচনাও ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত।

গল্প, উপন্যাস ও নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গ সুইডিশ সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। সুইডিশ সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও নাটকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। স্ট্রীণ্ডবার্গ যে উপন্যাস ও নাটকের শাখা পরিমাণে সমৃদ্ধ করলেন তাই নয়, তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বিপ্লব সৃষ্টি করল। তাঁর 'রেড রুম' আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন, 'মাস্টার ওলাফ' সুইডিশ সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক, 'বিবাহিত (১ম ও ২য় ভাগ)'-এর গল্পগুলি সুইডেনের পাঠকদের চমকিত করেছিল। 'দি পীপল অব হেমসো' পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রা অবলম্বনে রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

স্ট্রীণ্ডবার্গের পূর্বে সুইডিশ সাহিত্যে ছিল স্বপ্ন, রোমান্স ও রূপকথার প্রাধান্য। তিনিই প্রথম জীবনের বাস্তবচিত্র সাহিত্যে রূপায়িত করেন। এর ফলে 'রেড রুম' এবং অন্যান্য গ্রন্থের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। আদালতে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল লেখককে। সমালোচকদের তাড়নায় তাঁকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে দীর্ঘকাল।

স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা গল্পে উপন্যাসে ও নাটকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাঁর রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনে বারবার তিনি মেয়েদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন। তার ফলে তাঁর রচনার মধ্যে নারী-বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। সে বিদ্বেষ এত প্রবল যে স্ট্রীণ্ডবার্গকে সুইডেনের শোপেনহাউয়ার বলা হয়ে থাকে।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পূর্বে স্ট্রীণ্ডবার্গ অবচেতন মনের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর নাটকে বাইরের ঘটনার সংঘাত অপেক্ষা মনের দ্বন্দ্ব বড় হয়েছে। আধুনিকতার এটি একটি প্রধান লক্ষণ। 'দি ফাদার', 'মিস জুলি' প্রভৃতি নাটক

বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্ট্রীণ্ডবার্গের 'দি ড্রিম প্লে' একটি সুন্দর ফ্যান্টাসি। ইন্দ্র-তনয়া মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য পৃথিবীতে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন নাটকে তারই কাল্পনিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

য়ুরোপ-আমেরিকার সাহিত্যে স্থইডিশ লেখকদের মধ্যে একমাত্র স্ট্রীণ্ড-বার্গেরই প্রভাব পড়েছে। আর সে প্রভাব তাঁর নাটকের। জার্মান এক্সপ্রেশানিস্ট নাট্যকারদের উপর স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষণীয়। আধুনিক স্থইডিশ লেখকদের রচনার মধ্যেও স্ট্রীণ্ডবার্গের গভীর প্রভাব দেখা যায়। এঁদের রচনায় স্ট্রীণ্ডবার্গের অনেক উক্তি আত্মগোপন করে আছে।

কোনো কোনো সমালোচক বলেন স্ট্রীণ্ডবার্গের আন্তর্জাতিক খ্যাতি শুধু তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার উপর নির্ভর করে না। তিনি নাটকে গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন, গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন, তাই তাঁর বই বিদেশে অনুবাদ হয়ে সমাদৃত হতে পেরেছে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁর নাটক অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। কারণ নাটকে গদ্যের প্রয়োগ তখন ছিল রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর নাটক অনুবাদ করা সহজ হয়েছে।

এই যুক্তির মধ্যে হয়ত খানিকটা সত্য আছে। তা না হলে স্ট্রীণ্ডবার্গের সমসাময়িক প্রতিভাশালী কবি গুস্তাফ ফ্রোডিং-এর নাম স্থইডেনের বাইরে শোনা যায় না কেন? স্যার এডমাণ্ড গস্ এঁর সম্বন্ধে বলেছেন: "One of the few great singing poets whom Europe has produced in the second half of the nineteenth century."

ফ্রোডিং-এর নির্বাচিত কবিতার সংকলন (গীটার অ্যাণ্ড কনসারটিনা, ১৯২৫) ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছিল। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য ধরা না পড়ায় বিদেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু স্থইডেনে এখন পর্যন্ত তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। কবিতায় সঙ্গীতের প্রাধান্য, অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতাবোধ এবং সুদৃঢ় আশাবাদ তাঁকে পাঠকদের নিকট প্রিয় করেছে।

স্ট্রীণ্ডবার্গ এবং তাঁর অনুরাগী লেখকদের বাস্তবতাপ্রীতির প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ভার্নার ফন হেইদেনস্তামের (১৮৫৯-১৯৪০) রচনায়। হেইদেনস্তামের জন্ম হয়েছিল অভিজাত পরিবারে। বয়স যখন প্রায় ষোল তখন ডাক্তার

সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিল তাঁর আয়ু আর বেশী দিন নেই। শেষ চেষ্টা হিসাবে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হল। বরফের দেশ থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল বর্ণসমারোহের পরিবেশে এসে কিশোর হেইদেনস্তামের মন স্বপ্নাভিভূত হয়ে পড়ল। তখন থেকেই তাঁর রোমান্টিক মানসিকতার সূত্রপাত। স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হবার পর দেশে ফিরে প্রকাশ করলেন প্রথম কবিতার বই 'ইয়ার্স অব পিলগ্রিমেজ অ্যাণ্ড ওয়াণ্ডারিং।' প্রাচ্যের বর্ণসুষমা, জীবনের গভীর আনন্দ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ—এই কাব্যসংগ্রহের বৈশিষ্ট্য। তাঁর পরিণত বয়সের কাব্যসাধনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে 'পোয়েমস্' (১৮৯৫) ও 'নিউ পোয়েমস্' (১৯১৫) সংকলন দুটিতে। হেইদেন-স্তাম কথাসাহিত্যেও বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হ্যান্স অ্যালিয়েনাস্' 'কিং চার্লসেস মেন', 'দি ট্রি অব ফোল্‌কুংস' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হেইদেনস্তাম নোবেল পুরস্কার পান। কমিটি তাঁকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করে বলেন যে, তিনি হলেন 'দি লীডার অব এ নিউ এরা ইন আওয়ার লিটারেচার।' এই নবযুগের নেতৃত্ব তিনি করেছেন মোটামুটি তিন উপায়ে। প্রথমত, বিদেশ হতে আমদানী করা বাস্তবতার আতিশয্যকে তিনি প্রতিরোধ করেছেন রোমান্সের প্রবর্তন করে। দ্বিতীয়ত, ক্লাসিক্যাল রীতি প্রয়োগ করে ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সংযত করেছেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় ক্লাসিক্যাল আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তী সুইডিশ লেখকরা অনেকেই এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তৃতীয়ত, সুইডেনের পুরাণ, উপকথা ও ইতিহাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবন নিয়ে কাহিনী রচনা করে সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছেন। তাঁর নায়করা সবাই নীটশের অতি-মানব, তারা সুইডিশ ঐতিহ্যের প্রতীক।

এ ছাড়া সুইডিশ গদ্যরীতি গঠনেও হেইদেনস্তামের দান কম নয়।

হেইদেনস্তামের নাম আমাদের নিকট একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার একজন ফরাসী লেখককে দেওয়া হবে প্রায় স্থির হয়ে গেছে। এমন সময় ইংরেজী গীতাঞ্জলি এসে সুইডেনে পৌঁছল। সমগ্র সুইডেনে তখন বাংলা পড়ে বুঝতে পারতেন একমাত্র অধ্যাপক টেগনার। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে হেইদেনস্তাম মুগ্ধ হলেন। তিনি এক দীর্ঘ

প্রবন্ধে সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, রবীন্দ্রনাথই নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্যতম কবি। হেইদেনস্তামের মতো প্রভাবশালী লেখকের এই অভিমত নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করেছিল।

কবি, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক অস্কার লেভারটিন হেইদেনস্তামের সাহিত্যা-দর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্য পার্থক্যও কম নয়। লেভারটিন সৌন্দর্যের উপাসক, সৌন্দর্য-সাধনা তাঁর কাব্যের প্রধান সুর। তিনি ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিদের বচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তথাপি সমগ্রভাবে বিচার করলে হেইদেনস্তামের প্রভাব লেভারটিনের কাব্যে স্পষ্টই ধরা পড়ে।

প্রগতিবাদী কবি ফ্রোডিং এর কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ কবেছি। তাঁর আঙ্গিকের প্রভাব এরিক অ্যাক্সেল কার্লফেলদতের (১৮৬৪-১৯৩১) প্রথম দিকের রচনায় দেখা যায়। কার্লফেলদৎ তাঁর জন্মস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দযকে কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলত তিনি প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করে কবি তাকে পাঠকের নিকট জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রকৃতির দৈনন্দিন রূপ পরিবর্তন ও ঋতু বদলের চিত্র তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নয়, কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে প্রকৃতির রূপৈশ্বর্যকে কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ছন্দ ও সুষ্ঠু শব্দের প্রয়োগে এবং ধ্বনি-মাধুর্যে কার্লফেলদতের কবিতা সুইডিশ সাহিত্যে অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি করা হয় না। 'ফ্রিডোলিনস 'ব্যালাডস্' এবং 'ফ্রিডোলিনস্ প্লেসার গার্ডেন' তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গাথামূলক দুটি কাব্যগ্রন্থ। নায়ক ফ্রিডোলিনের মধ্যে সহজেই কবিকে চেনা যায়।

কার্লফেলদৎ দীর্ঘকাল সুইডিশ আকাদেমির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পবে তাঁব নামে নোবেল পুবস্কাব ঘোষণা করা হয়।

সুইডিশ সাহিত্যের ইতিহাসে এর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি সেলমা লাগেবলফ (১৮৫৮-১৯৪০)। স্ট্রীণ্ডবার্গ ও ইবসেনের বাস্তবতা একদল তরুণ লেখকের অক্ষমতার ফলে যখন ন্যক্কারজনক হয়ে উঠেছিল তখন শ্রীমতী লাগেরলফ সুইডিশ কথা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নতুন সুরের প্রবর্তন করলেন। তখন পর্যন্ত সুইডিশ উপন্যাস য়ুরোপের অন্যান্য দেশের উপন্যাসের অনুকরণ ছিল মাত্র। সেলমা লাগেরলফ সুইডিশ ঐতিহ্যানুসারী উপন্যাস লিখে পাঠকদের চমকিত করলেন। সুইডেনের সুপ্রচলিত গাথা-সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আধুনিক জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়ে তিনি এক নতুন ধরনের

কাহিনী রচনা করেছেন। কল্পনা ও বাস্তবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। অবৈধ প্রেমিকদের নেকড়ে বাঘ তাড়া করছে, অথবা শয়তানের সঙ্গে নায়কের কথাবার্তা হচ্ছে—এ সবও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় সুইডেনেব পল্লী অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিখুঁত বাস্তব চিত্র।

লাগেরলফ সুইডিশ উপন্যাস-সাহিত্যকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কাহিনীগুলি যদিও সুইডেনের গাথা সাহিত্য কেন্দ্র করে রচিত তথাপি তাদের মধ্যে এমন বিশ্বজনীন আবেদন আছে যার ফলে চৌদ্দ পনেরোটি ভাষায় এদের অনুবাদ হয়েছে। লাগেরলফেব মতো জনপ্রিয়তা বিদেশে অন্য কোনো সুইডিশ লেখক লাভ কবেননি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাগেরলফ নোবেল পুরস্কাব পান। লেখিকাদের মধ্যে তিনিই এই পুবস্কাব প্রথম পেয়েছেন।

পঁচিশ বছব বয়সে রচিত 'গোস্তা বেরলিংস সাগা' লাগেরলফের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নায়ক বেবলিং একটি অদ্ভুত চরিত্রেব লোক। প্রথম থেকেই পাঠককে সে আকৃষ্ট কবে। বায়বনেব ডন জুযান এবং সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মিশ্রণ ঘটেছে এই চরিত্রে। কার্লাইল ও গ্যেটের প্রভাবও পড়েছে, কিন্তু লাগেরলফের ছিল আশ্চর্য আত্মীকরণেব ক্ষমতা। কাহিনীব মধ্যে বহিরাগত ছায়াগুলি সুন্দরভাবে মিশে গেছে, কোথাও বিরোধেব চিহ্ন নেই।

দুই খণ্ডের বড উপন্যাস 'জেরুজালেম', ছেলেদের উপন্যাস 'দি ওয়াণ্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চার অব নিলস্' এবং 'আত্মচরিত'—লাগেরলফের আব তিনটি বিখ্যাত বই। তাঁর রচনায মানসিকতাব উজ্জ্বল দীপ্তি হযত নেই। কিন্তু জনপ্রিয় কাহিনীকার হিসাবে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জীবিত লেখকদেব মধ্যে পার ফেবিয়ান লাগেবকভিস্টের (১৮৯১–) প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সৌন্দর্যতত্ত্বের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ কবেন। তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁব কাব্যগ্রন্থ 'যন্ত্রণা।' মানবতাবিরোধী প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কাযকলাপেব জন্য তরুণ কবির বেদনাবোধ এই কাব্য-সংগ্রহের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

লাগেরকভিস্টেব সাহিত্য জীবন অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। তাঁর প্রথম যুগেব রচনায় আঙ্গিকের উপর বেশী দৃষ্টি পড়েছে। কিউবিস্ট শিল্পী, জার্মান এক্সপ্রেশানিস্ট নাট্যকার এবং তাঁর পূর্বসূরী স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রভাবের ফলে লাগেরকভিস্টের প্রথম পর্বের কাব্য ও নাটকে অভিব্যক্তিবাদ

প্রাধান্য লাভ করেছে। আঙ্গিকের উপর জোর দেওয়ায় এবং প্রতীকের ব্যবহার করায় এই পর্বের রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারেনি। পরবর্তীকালে প্রতীকের অস্পষ্ট জগৎ থেকে তিনি জীবনের কাছাকাছি নেমে এসেছেন; সংকেতময় ভাষার পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষাতেই তাঁর পাত্র-পাত্রীরা কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

লাগেরকভিস্ট তাঁর নাটকগুলি নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায় ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শেষ মানুষ' (১৯১৭) মানবজাতির শোচনীয় পরিণামের ভয়াবহ ইঙ্গিত। ১৯২৫।১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লাগেরকভিস্টের রচনা গভীর নিরাশাবাদ আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেখা যায়। এর পরে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। পৃথিবী থেকে অন্যায় ও অবিচার দূর হয়নি; কিন্তু মানবতাবিরোধী শক্তির আক্রমণ সত্ত্বেও মানুষের শুভবুদ্ধি যে একদিন জয়ী হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর রচনায় নতুন ঔজ্জ্বল্য এনেছে। 'আমাদের বাঁচতে দাও' (১৯৪৯) নাটিকায় এই নতুন আশাবাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। লাগেরকভিস্টের সাম্প্রতিক সাহিত্যসাধনার মূল কথা হল : "good shall at the last triumph, for it is the greatest and the strongest power, however terrifying the world may seem to be"

গল্প-উপন্যাসেও লাগেরকভিস্ট একটি বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বক্তব্যের চাপে পড়ে রসবোধ ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর 'জল্লাদ' একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ। এই প্রতীকধর্মী কাহিনীতে হিটলারই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। 'বামন (১৯৪৪)' উপন্যাসে তথাকথিত সভ্য মানুষের সীমাহীন লোভ ও ভণ্ডামি উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। 'বারাব্বাস' লাগেরকভিস্টের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহুদীরা দস্যু বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়ে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। মুক্তি পেয়ে বারাব্বাস বধ্যভূমিতে এসে যীশুর প্রাণদণ্ড দেখল। যীশুর মহান আত্মত্যাগ বারাব্বাসের মনে গভীর রেখাপাত করলেও নিঃসংশয় বিশ্বাসের আশীর্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয়ে রইল। তার ফলে শুধু বারাব্বাসের জীবনে নয়, তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের জীবনেও, অভিশাপ নেমে এল। মহৎ ও সত্যের প্রতি এই সংশয় আমাদের জীবনও বিষিয়ে তুলেছে।

লাগেরকভিস্টের ছোট গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ এবং সুখপাঠ্য। 'দি ম্যারেজ

ফীস্ট অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' সংকলনে উনিশটি নির্বাচিত গল্পের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যাবে। এই গল্পগুলির মাধ্যমে লেখক সমাজের পাপ ও দুর্নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে 'দি ম্যারেজ ফীস্টের' মতো নিছক গল্পও আছে। বিদেশী পাঠকের নিকট এই সুন্দর গল্পগুলি সমাদর লাভ করবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে লাগেরকভিস্ট নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 'for the artistic power and deep-rooted independence he demonstrates in his writings in seeking an answer to the eternal question of humanity'

সুইডিশ লেখকরা স্বদেশের গাথা, উপকথা এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে রচনার মধ্যে এমন প্রাধান্য দেন যে, বিদেশী পাঠকের পক্ষে তা রসোপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্ট্রীণ্ডবার্গ একমাত্র ব্যতিক্রম। লাগেরকভিস্টও স্ট্রীণ্ডবার্গের মতো জীবনের মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনিই বর্তমান শতকের উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী সুইডিশ লেখক যিনি মানুষের মন নিয়ে কারবার করেছেন। পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে তাঁর রচনা। এই জন্য সকল দেশের বুদ্ধিজীবী পাঠকের নিকট তাঁর রচনা সমাদৃত হবার দাবী রাখে।

১৯০০ সালের শুরু থেকে সুইডিশ সাহিত্যে বিশেষ কোনো ধারা লক্ষ্য করা যায় না। সাহিত্য-গোষ্ঠীর অস্তিত্বও প্রায় নেই বললেই চলে। প্রত্যেক লেখক স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা দেশের ও বিদেশের ভাবধারা সম্বন্ধে উদাসীন নন।

গত পঞ্চাশ বছরে অন্তত ষাটজন প্রতিভাশালী লেখক সুইডিশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের অনেকের বই-ই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি, সুতরাং দেশের বাইরে তাঁরা পরিচিত হতে পারেননি। বর্তমান শতকের সুইডিশ সাহিত্যে স্বভাবতই গল্প-উপন্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। বার্গম্যান, সোয়েদেরবার্গ, বেঙ্গটসন, মোবার্গ প্রভৃতি কয়েকজন কথা-সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁদের বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। সুইডিশ কথা-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য বিষাদ এবং জীবনের অন্ধকার দিকটার উপর জোর দেওয়া। এটা শুধু একালের নয়, সুইডিশ সাহিত্যের চিরদিনের সাধারণ লক্ষণ। কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের

মধ্যে বাস করতে হয় বলে জীবনের হিংস্র দিক সম্বন্ধে সুইডেনবাসীরা সর্বদাই সচেতন। সিগফ্রিড সিওয়ার্তসের 'ডাউনস্ট্রীম' নিরাশাবাদী উপন্যাসের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। জীবনের লঘু দিক নিয়ে যে গল্প উপন্যাস রচিত হয়নি, তা নয়। তাদের সংখ্যা কম এবং অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে প্রচার লাভ করেনি।

বার্গম্যান, হেদবার্গ, সোয়েদেরবার্গ এবং আরও অনেকে সফল নাটক রচনা করেছেন। উপরে যে-সব কবিদের নাম করা হয়েছে তাঁদের ছাড়া আধুনিক সুইডিশ সাহিত্যের আর দু'জন বিশিষ্ট কবি একেলাণ্ড এবং ওস্টারলিং। শক্তিশালী কবি ও ঔপন্যাসিক ড্যান অ্যাণ্ডারসনের কিছু কবিতার অনুবাদ 'চার্কোল বার্নারস ব্যালাড' নাম দিয়ে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সুইডিশ সাহিত্য যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকে ফিনল্যাণ্ডের নাগরিক। জাতিতে ফিনিশ হয়েও তাঁরা লেখেন সুইডিশ ভাষায়। আধুনিক সুইডিশ সাহিত্যে ফিনিশ কবি গ্রিপেনবার্গ ও হেমারের নাম উল্লেখযোগ্য। হেমার ফিনিশ বিপ্লবের (১৯১৭-১৮) ঘটনা অবলম্বন করে একটি চিত্তাকর্ষক বিয়োগান্ত উপন্যাস লিখেছেন। 'এ ফুল অব ফেথ' নাম দিয়ে এই উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে।

সুইডিশ সাহিত্যে এখন পর্যন্ত কাব্যের প্রাধান্য চলছে। কাব্যের মধ্যে আবার রোমান্টিক সুর প্রধান। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে খ্যাতনামা লেখকদের বাস্তববাদী রচনা সুইডিশ লেখকদের বার বার বিক্ষুব্ধ করেছে। ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নতুন নতুন তত্ত্ব সুইডেনেও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে সুইডিশ সাহিত্য এখন পর্যন্ত মূলত লিরিকধর্মী। একথা শুধু কবিতা সম্বন্ধে সত্য নয়, গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য। সুইডিশ সাহিত্যে বাস্তবতা অবশ্যই আছে, কিন্তু বাস্তবতার আতিশয্য নেই। অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় সুইডিশ সাহিত্যের আদর্শপ্রিয়তাও লক্ষণীয়। আদর্শবাদ আছে বলেই প্রতীক ও সংকেত প্রয়োগের এত আধিক্য দেখা যায়। নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতাও ঘোষণা করেছিলেন যে, আদর্শবাদী লেখকের রচনাই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

আমেরিকান সাহিত্যে ভারত

আমেরিকার সঙ্গে প্রাচ্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রথম ঘটেছে চীনের মাধ্যমে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতকে যেভাবে শোষণ করেছে আমেরিকান বণিকরাও ঠিক তেমনি করে চীনে ব্যবসায়ের জাল পেতেছিল। আমেরিকানরাই চীনকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করেছে।

চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা মূলত ছিল ব্যবসায়িক। চীনের প্রাচীন সভ্যতা আমেরিকান জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না। তথাপি প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শন আমেরিকার কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের রচনা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

আমেরিকান পাদ্রিদের প্রথম ভারতে পাঠানো হয় ১৮১৩ সালে। ১৮৩০ সালে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। এই পাদ্রিদের মারফৎ আমেরিকানরা ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেল। তাদের ধারণা হল, ভারত রাজা, নবাব, যোগী, সাপ, বাঘ, কাশ্মীরী শাল ইত্যাদির দেশ। সাধারণ লোক 'ইণ্ডিয়ান' ও 'রেড ইণ্ডিয়ানের' মধ্যে গোলমাল করে ফেলত। তাই ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা উচ্চ ছিল না। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দের আমেরিকা ভ্রমণের পর থেকে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যক যোগ ও বেদান্ত শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে যে এই 'আক্রমণাত্মক হিন্দু অভিযানের' বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আমেরিকানরা বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত পুঁথিপত্র লিখে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ভ্রমণের অনেক পূর্বে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা একদল আমেরিকান মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় তাঁরা লাভ করেছেন প্রধানত ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে। স্যার উইলিয়াম জোন্স, উইলকিন্স, উইলসন, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির রচনাবলী পড়ে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত আমেরিকান ভারতকে জানবার সুযোগ লাভ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণের ফলে আমেরিকান সমাজের সকল

স্তরে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি প্রচারিত হল। আগে থেকে ভারতের কথা আমেরিকান সাহিত্যে স্থান লাভ না করলে বিবেকানন্দের বাণী হয়ত এতটা সমাদৃত হত না।

আমেরিকান লেখক এবং দার্শনিকরা জার্মান সাহিত্য থেকেও প্রাচীন ভারতকে জানবার প্রেরণা পেয়েছেন। জার্মান আইডিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম ভারতীয় মিস্টিসিজমের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। স্লেগেল বলেছেন: The Indians possessed a knowledge of the true God.

ঈশ্বরকে যারা প্রকৃতই জানতে পেরেছিল, তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। শোপেনহাউয়ারও ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে বলেছেন: the ancient Hindus may have had perhaps more to say about philosophy and fundamental truths than many of our modern writers.

জার্মান মনীষীদের এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমেরিকার চিন্তাশীল লেখকদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছিল। আমেরিকায় য়ুরোপের মূল ভূ-খণ্ড থেকে জার্মান এবং অন্যান্য জাতির লোক এসেছিল। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা তারাও মুখে মুখে কিছু প্রচার করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উপর প্রাচীন ভারতের প্রভাব অন্য সকল বৈদেশিক প্রভাব অপেক্ষা বেশী ছিল।

১৮৩৬ সালে নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে কয়েকজন লেখক ও দার্শনিক একটি নতুন গোষ্ঠীর প্রবর্তন করলেন। এঁদের ক্লাবের নাম হল "ট্রানসেনডেনটাল ক্লাব" এবং এঁদের মতবাদ ট্রানসেনডেনটালিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদ নামে পরিচিত হল। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের "ক্রিটিক অব পিউর রীজন"-এর তত্ত্বকে এঁরা মেনে নিতে পারেননি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত এক জগতের অস্তিত্বে ছিল এঁদের বিশ্বাস। সুতরাং মিষ্টিসিজম স্বাভাবিকরূপেই তাঁদের মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারত ও পারস্যের মিষ্টিসিজম অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছিল।

নতুন দেশ আমেরিকা। নতুন জন্মের বেদনা তাকে নানারূপে ভোগ করতে হয়েছে। যন্ত্র-শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে বেদনা আরো বেড়েছে। আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শান্তির সন্ধানে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

অতীন্দ্রিয়বাদী গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন, হেনরি থোরো, ন্যাথানিয়েল হথর্ন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি। এই দলের মুখপত্র "দি ডায়েল" ছিল তদানীন্তন আমেরিকার একটি অন্যতম সাহিত্য পত্র।

র‍্যালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন (১৮০৩-১৮৮২) ছিলেন এই গোষ্ঠীর পুরোধা। ভারতীয় চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনাবলীতে। ছাত্রাবস্থায় ইমার্সনের ভারত সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। তাঁর পিতা ছিলেন পাদ্রি। ইমার্সনেরও উদ্দেশ্য ছিল পাদ্রি হবার। কলেজে ছাত্রদেব নিজের নির্বাচিত বিষয়ের উপর রচনা লিখতে দেওয়া হত। ইমার্সন একবাব লিখেছিলেন, "ভারতীয় কুসংস্কার" নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল যে, গ্রীষ্মের প্রাধান্যের জন্য ভারতবাসীরা এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাদে-র "দি কার্স অফ কেহামা" পড়ে তিনি এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

কলেজ ত্যাগ করবার পর তিনি "এশিয়াটিক মিসেলেনি" ও মনুর শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে পারেননি। হিন্দুধর্ম তাঁর কাছে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁব পিসিমা মেবি প্রায়ই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠি লিখতেন। স্যার উইলিয়াম জোন্সেব অনুবাদ থেকে হিন্দুধর্ম ও কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে দিতেন। পিসিমাব চিঠি পড়ে ধীরে ধীরে তার আগ্রহ জাগতে লাগল। বন্ধু থোবোও এ বিষয়ে খুব উৎসাহী। তাঁর কাছে জোন্স, উইলসন প্রভৃতির অনেক বই ছিল। এ সব বই পড়ে ইমার্সন ক্রমশ ভারতীয় দর্শনের গুণগ্রাহী ভক্ত হয়ে উঠলেন।

ইমার্সনের রচনাবলীব মধ্যে ভারতেব প্রভাব ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ভারতীয় চিন্তাধারা সর্বত্র চিহ্নিত করা যায় না; ইমার্সন ভাবতীয় দর্শনেব মূল তত্ত্বগুলি আত্মস্থ করে নিজেব চিন্তা-ভাবনাব বিশিষ্ট ছাপ দিয়ে তাদের প্রকাশ করেছেন। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আমেরিকা ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানকাব পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: ইমার্সন ও প্রাচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে আমি গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি কাব। ইমার্সন একালের নবলব্ধ সত্যকে প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের বাণীকে নবজীবন দান করেছেন।

ইমার্সনের চিন্তাধারায় "ওভার-সোল" একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই ওভার-সোল আমাদের "পরমাত্মারই" ইংরেজী অনুবাদ। উপনিষদের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মায়া বলে তিনি

সংসারকে উপেক্ষা করেননি। আমাদের মায়াবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও মায়াবাদের উপর তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। মানুষকে মুগ্ধ করাই মায়ার কাজ ; এই দিকটাই ইমার্সনকে আকৃষ্ট করেছে :

Illusion works impenetrable
Weaving webs innumerable,
Her gay pictures never fail,
Crowds each other, veil on veil,
Charmen who will be believed
By man who thirsts to be deceived.

ইমার্সন উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা বহুবার পড়েছেন। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের অনেক জায়গায় এ সব গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। ইমার্সনের বিখ্যাত কবিতা "ব্রহ্ম" কঠোপনিষৎ এবং গীতায় ব্যবহৃত ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ; ইমার্সন প্রথম স্তবকে বলছেন :

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

কঠোপনিষদের সংশ্লিষ্ট অংশের ইংরেজী অনুবাদ থেকে সাদৃশ্যটা স্পষ্ট দেখা যাবে : If the slayer think that he slays, if the slain think that he is slain, neither of them knows the truth.

মনে হয়, ইমার্সন গদ্য অনুবাদকে শুধু পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে :

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং
মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

"ইমর্টালিটি" নামক প্রবন্ধে ইমার্সন, যম ও নচিকেতার প্রশ্নোত্তরের ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন। তাঁর "জার্নালের" অনেক জায়গায় বিষ্ণুপুরাণের কোনো কোনো অংশের আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

হেনরি ডেভিড থোরো (১৮১৭-'৬২) ইমার্সনের বন্ধু এবং ট্রানসেনডেনটাল ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তাঁর মতো পড়ার নেশা ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে আর কারও ছিল না। থোরো বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিকগুলি সবই পড়েছিলেন। ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, মানব সভ্যতার প্রারম্ভে এমন ভাব-সমৃদ্ধ গ্রন্থ যে রচিত হতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না। সন্দেহ হয়, ইংরেজী অনুবাদক নতুন চিন্তা যোগ করে দিয়েছেন। থোরো তাঁর জার্নালে মন্তব্য করেছেন, হিন্দুরা হিব্রু জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী ধার্মিক ছিল এবং তাদের ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ছিল দৃঢ়তর।

থোরোর 'এসে অন সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' টলস্টয় ও গান্ধীকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত বই Walden হল "the spiritual autobiography of a rebel wearied by the machine age." এই দুটি রচনার মধ্যেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে 'ওয়াল্ডেন'-এ থোরো নিজের জীবনচর্যাকে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের আলোকে বিচার করে দেখেছেন। একাদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়গুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। থোরো বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, কালিদাস ও কবীরের রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে থোরো বলছেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি গীতা পাঠ করেন, তার ফলে বুদ্ধিবৃত্তির শুচিস্নান হয়ঃ

In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagvat-Geeta, since whose composition years of the gods have elapsed, and in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial ; and I doubt if that philosophy is not to be referred to a previous state of existence, so remote is its sublimity from our conceptions.

পৃথিবীর মহৎ চিন্তাধারার মিশ্রণের দ্বারাই জীবনের সম্মুখে এক মহত্তর আদর্শ লাভ করা যেতে পারে। থোরো নিজের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ভারতের জীবনদর্শন একাত্ম করতে পেরেছিলেন। সংসারের কোলাহল থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বাস করতেন ওয়াল্ডেন হ্রদের তীরে। ওয়াল্ডেনের জলের সঙ্গে গঙ্গার

জল মেশাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন: The pure Walden water is mingled with the sacred water of the Ganges.

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে অধ্যাপক রামতীর্থের বাড়ীতে ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯-'৯২) Leaves of Grass দেখতে পান। এ বই পড়ে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন—তিনি বলতেন, হুইটম্যান আমেরিকান সন্ন্যাসী। যে কোনো রসজ্ঞ পাঠকই 'লীভস অব গ্র্যাস' পড়ে ভারতীয় ভাব-ধারার প্রগাঢ় প্রভাব উপলব্ধি করবেন। কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন:

This is no book ;
Who touches this, touches a man.

পাঠক 'লীভস অব গ্র্যাস' পড়ে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর হৃদয় স্পর্শ করবেন।

১৮৫৬ সালে থোরো 'লীভ্‌স্ অব গ্র্যাস' পড়ে মন্তব্য করেছিলেন : Wonderful like the orientals. হুইটম্যান যে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছেন, একথা থোরোর কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু পরে 'এ ব্যাকওয়ার্ড গ্ল্যান্স'-এ তিনি স্বীকার করেছেন যে 'লীভ্‌স্ অব গ্র্যাস্' লেখার আগে প্রাচীন হিন্দু কাব্যগ্রন্থ পড়েছেন। এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার তাঁর 'ডেজ উইথ ওয়াল্ট হুইটম্যান' গ্রন্থে উপনিষদের সঙ্গে 'লীভ্‌স্ অব গ্র্যাস্' এর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। হুইটম্যানের 'সঙ্গ অব মাইসেল্‌ফ' শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দেবার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে হুইটম্যানের 'সেল্‌ফ'ও সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর 'মি', 'মাইসেল্‌ফ' ও 'আই' অমর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আমাদের শাস্ত্রে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে। ইমার্সন পরমাত্মা বা ওভার-সোলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হুইটম্যানের 'আমি' জীবাত্মা,—ব্রহ্মের যে অংশটি মানুষের মধ্যে বাস করে ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ রক্ষা করে চলে।

আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর Buddha and the Gospel of Buddhism গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত চার প্রকার ব্রহ্মবিহারের (মেত্তা, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) দৃষ্টান্ত হুইটম্যানের কবিতায় পাওয়া যায়। কুমারস্বামী উদ্ধৃতি সহ তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং আরও ঐশ্বর্য আহরণের দুর্নিবার লোভ জাতির আত্মিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করবে বলে আমেরিকান মনীষীদের আশঙ্কা হয়েছিল। ইমার্সন, থোরো

এবং হুইটম্যান বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলে অর্থের জন্য উন্মত্ততা হয়ত কমবে।

সুয়েজ ক্যানেল ও প্যাসিফিক রেল রোডের কাজ সমাপ্ত হবার পর হুইট-ম্যান আমেরিকার সঙ্গে প্রাচ্যের যোগাযোগের পথ মুক্ত হবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এই উপলক্ষে ১৮৭১ সালে তাঁর কবিতা 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। তাঁর কাছে সুয়েজ বণিকের লোভের প্রকাশ নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে যে মহান বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এটা তারই সূচনা। মানবাত্মার জন্মভূমি ভারতে যাবার পথ সহজ হওয়ায় বিভ্রান্ত প্রতীচ্য আত্মস্থ হবার সুযোগ পাবে। হুইটম্যান ভারতের বন্দনা করে বলেছেন :

ভারত-পথ যাত্রী।
মানুষ যেখানে ভূমিষ্ঠ সেই
সুদূর ককেশাসের শীতল বায়ু স্রোত
ইউফ্রেটিস-এর প্রবাহ,
পুনর্দীপ্ত অতীত।
হে হৃদয়, দেখো সেই বিগত দিন
আবার তোমার সামনে মেলা।
সবচেয়ে জনাকীর্ণ ধনাঢ্যতম সব পৃথিবীর প্রাচীন দেশ
সিন্ধু আর গঙ্গার অসংখ্য ধারা
(আমেরিকার তীরে আমি ভ্রাম্যমাণ
আমার চোখে সব কিছুই আজ প্রতিভাত)
সমরাভিযাত্রী সেকেন্দারের আকস্মিক মৃত্যু
একদিকে চীনা আর একদিকে পারস্য ও আরব
দক্ষিণের সেই বিশাল সমুদ্র ; বঙ্গোপসাগর
প্রবহমান সাহিত্য, মহান সব মহাকাব্য, ধর্মান্দোলন, জাতির পাঁতি,
আদি দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম, অনন্ত অতীতে,
নবীন করুণা কোমল বুদ্ধ
কেন্দ্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের সব সাম্রাজ্য
তাদের সম্পদ ও অধীশ্বর,

তৈমুরলঙের সংগ্রাম, আওরঙ্গজেবের শাসনকাল
বণিক, শাসক, পর্যটক...

* * *

হে হৃদয় চলো
সেই আদিম মননে
শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়।
সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায়
জীবন বেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
সেইখানে, প্রাণের তারুণ্যে ও পুষ্পোদ্গমে।

অনুবাদঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইমার্সন, থোরো ও হুইটম্যানের বর্তমান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক প্রাচীন ভারতের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি। যাঁরা করেছেন তাঁরা ভারতবিদ্যা বিশারদ, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা নেই। সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে রোমাণ্টিক যুগ পর্যন্ত ইংরেজ লেখকরা ভারতের ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ভীষণতার কথাই বলেছেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর থেকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তার প্রভাব সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যেও পড়েছে। কিপলিং-এর রচনায় ভারত-বিদ্বেষ এবং বিশেষ করে হিন্দু-বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। কিপলিং-এর রচনা আমেরিকায় প্রচার লাভ করেছিল। কিপলিং-এর গল্প এবং ভারত-বিদ্বেষমূলক অন্যান্য কাহিনী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সিনেমায় রূপান্তরিত হয়ে আমেরিকায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আমেরিকান সাংবাদিক মিস ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসার এক অভূতপূর্ব দলিল। লুই ব্রমফিল্ডের 'দি রেইনস কেম্' ও 'নাইট ইন বম্বে' এবং অন্যান্য লেখকের এই জাতীয় উপন্যাস সিনেমার দিকে চোখ রেখে লেখা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকানরা ভারতকে প্রধানত ইংরেজী সাহিত্যের ও বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে দেখেছে।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। বিদেশে ভারত সম্বন্ধে আজকাল অধিকাংশ বই প্রকাশিত হয় আমেরিকায়। বিচিত্র বিষয়ের বই। এ থেকে ভারতের প্রতি আমেরিকার গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইমার্সন-থোরো-হুইট-ম্যানের মতো একান্ত নিঃস্বার্থ আগ্রহ নয়। ভারতের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা একমাত্র জার্মান পণ্ডিত ও লেখকদের ভারত-প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতের উপর আমেরিকায় অনেক বই লেখা হলেও সাহিত্য গ্রন্থের সংখ্যা কম। তথ্যমূলক বইয়ের প্রাধান্যটাই চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত আমেরিকান সাহিত্যে এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বই পার্ল বাকের 'কাম, মাই বিলাভেড'। আমেরিকান মিশনারী ভারতে এসেছে বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে। তিন পুরুষ যাবৎ তারা ভারতের সেবা করছে, স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ বরণ করে এদেশের জীবনযাত্রা হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। তৃতীয় পুরুষ থিওডোরের মেয়ে লিভি ভালোবাসল এ দেশের এক ডাক্তারকে। তাকে বিয়ে করতে চাইল। এবার থিওডোর পড়ল চরম পরীক্ষায়। ভারতের সেবার জন্য অকাতরে সে অর্থ দিয়েছে, নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এবার এল শ্রেষ্ঠ দানের আহ্বান : শাদা মানুষের রক্তের সঙ্গে কালো মানুষেব রক্তের মিলনের দাবী। এ দাবী সে মেনে নিতে পারল না, রক্তের শ্রেষ্ঠত্ববোধের সংস্কার তাকে বাধা দিল। থিওডোর সপরিবারে ভারত ত্যাগ করে সমস্যা এড়াল।

পার্ল বাক দেখিয়েছেন, শ্বেতকায়দের সঙ্গে ভারতের এতদিন যাবৎ যোগাযোগ হলেও স্থায়ী মিলন ঘটেনি দুই জাতির মধ্যে। মিলনের এত বড় সুযোগটা ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ, পাশ্চাত্ত্যের শ্বেতকায় জাতি মিলনের জন্য রক্তের কৌলিন্য ত্যাগ করতে সম্মত হয়নি। থোরো ওয়াল্ডেন ও গঙ্গার জল মিশিয়ে এক মহান নতুন সভ্যতা পত্তন করবাব কথা বলেছিলেন। সুয়েজ ক্যানেল ভারত ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক সংযোগের সহায়ক হবে বলে হুইটম্যান বিশ্বাস করতেন। থোরো ও হুইটম্যানের এই আশা পূর্ণ হয়নি। কেন হয়নি পার্ল বাক তার উত্তর দিয়েছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে ভারত

ইংরেজী সাহিত্যে ভারতের প্রভাবকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত। এ পর্বে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কম ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আসবার পূর্বে ভারত সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকরা বিবরণ সংগ্রহ করেছেন য়ুরোপীয় (মূল ভূখণ্ডের) ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত থেকে। আরব বণিকদের মৌখিক বিবরণও য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সব পরোক্ষ বিবরণ থেকে ইংরেজ লেখকরা ভারতকে মনে করতেন স্বপ্নের দেশ।

দ্বিতীয় পর্বে—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল। কিন্তু সে পরিচয় তখনো নিবিড় হয়নি। নতুন পরিবেশ, অপরিচিত আচার ব্যবহার, ভাষার বৈচিত্র্য প্রভৃতি অতিক্রম করে ভারত সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা গড়ে ওঠবার সময় তখনো আসেনি। কেউ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ভারতকে উপেক্ষা করেছে, কেউ বা মানবিকতাবোধের প্রেরণায় কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সাতান্ন-বিপ্লবের পর ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল। স্বার্থের সংঘর্ষ বাধল বটে, তবে পরিচয় হল নিবিড়। অবশ্য নানা কারণে শাসকের জাতি হিসাবে ইংরেজের মন আচ্ছন্ন ছিল। তাই দুই দেশের পরিচয় হয়েছে, কিন্তু সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আলডুস হাক্সলি বা সমারসেট মম দৈনন্দিন জীবনের উর্ধ্বে ভারতের শাশ্বত বাণীকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক এবং কথাসাহিত্যিক ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের বহু মনীষী প্রাচীন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। তথাপি একথা স্বীকার করতে হবে যে নিরপেক্ষতা সাহিত্য রচনা ও বিচারের প্রধান শর্ত। আমাদের স্বাজাত্যবোধ এবং ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনের দ্বন্দ্ব নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ লেখকের প্রকৃত সমালোচনাকেও আমরা বিদ্বেষপ্রসূত মনে করেছি। আবার সত্যকে বিকৃত করে ভারতকে হেয় করবার প্রবৃত্তিও অনেক ইংরেজ লেখকের

মধ্যে দেখা গেছে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা-প্রজার সম্পর্কের তিক্ত স্মৃতিটা যতদিন একেবারে দূর হয়ে না যাবে ততদিন ভারতের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে যথোপযুক্ত স্থান লাভ করা সম্ভব হবে না। ফরাসী বা জার্মান সাহিত্যে ভারত যে স্থান অধিকার করে আছে ইংরেজী সাহিত্যে সে স্থান পেতে এখনো অনেক বিলম্ব হবে।

তৃতীয় পর্বের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত বলে এখানে আমরা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব না। মোটামুটি সাতান্ন-বিপ্লব পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করলেই মূল ধারাটির পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম পর্বের সাহিত্যে ভারত সম্বন্ধে শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়। অস্পষ্টতার কারণ এই যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতেব তখনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেনি। ভারত সম্বন্ধে যা-কিছু সংবাদ তা আসত লোকের মুখে মুখে। কখনো বা ইটালীয়ান ও পোর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকেও কিছু কিছু খবর পাওয়া যেত। এসব ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কাল্পনিক কাহিনীব নীচে তথ্য প্রায়ই অপ্রধান হয়ে পড়ত।

স্যার ফিলিপ সিড্‌নির (১৫৫৪-'৮৬) Defence of Poesie (1595)-তে ভারত সম্বন্ধে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বোধহয় প্রথম ভারত ইংরেজী সাহিত্যে স্থান লাভ করল। এডমাণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-'৯৯) তাঁর রচনায় ভারত এবং গঙ্গা ও সিন্ধু নদের কথা বার ছয়েক উল্লেখ করেছেন।

ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-'৯৩) ইংবেজী সাহিত্যের প্রথম লেখক যিনি ভারতের নাম অনেকবার উল্লেখ করেছেন। Tamberlaine, Dr. Faustus, The Jew of Malta প্রভৃতি নাটকে মার্লো ভাবতবর্ষের নাম বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। মার্লো ভারতকে দেখিয়েছেন ঐশ্বর্যের দেশ হিসাবে। পরবর্তী এলিজাবেথীয় লেখকরা ভারতের এই রূপকেই গ্রহণ করেছেন।

মার্লোর ফস্টাস এমন ক্ষমতা লাভ করেছে যে যখন ইচ্ছা সে দানবদের ডেকে এনে আদেশ করতে পারে। যা চাইবে তা এনে দেবে। প্রথম অঙ্কেই ফস্টাস বলছে:

I'll have them fly to India for gold, ..

সেক্সপীয়রও (১৫৬৪-১৬১৬) ভারতের ঐশ্বর্যের দিকটাই দেখেছেন।

Antony and Cleopatra, As you Like It, Henry VIII, The Merry Wives of Windsor প্রভৃতি নাটকে ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মিল্টনও (১৬০৮-'৭৪) ভারতকে দেখেছেন ঐশ্বর্য ও উর্বরতার উৎস হিসাবে। 'প্যারাডাইজ-লস্ট'-এর প্রথম খণ্ডে ভারত থেকে জাহাজ বোঝাই ধনরত্ন আসছে এমনি একটি ছবি আছে।

স্যার টমাস ব্রাউন (১৬০৫-'৮২) এবং জন গে (১৬৮৫-১৭৩২) ভারতের নাম উল্লেখ করেছেন। কবি অ্যালেকজাণ্ডার পোপই (১৬৮৮-১৭৪৪) বোধহয় প্রথম ঐশ্বর্য ব্যতীত ভারতের অন্য রূপও দেখতে পেয়েছিলেন। প্রকৃতি-পূজক ভারতবাসী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

. whose untutored mind
Sees God in clouds or hears Him in the wind,

"Essay on Man"-এ তিনি বলছেন: "Lo, the poor Indian!" এ পর্যন্ত ভারত সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন ভাবে এখানে-ওখানে উল্লেখ পাওয়া গেছে। ভারতকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বই রচনা করবার প্রথম কৃতিত্ব বোধহয় জন ড্রাইডেনের (১৬৩১-১৭০০)। তাঁর 'ঔরঙ্গজেব' রেস্টোরেশান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি। রোমান্সের সন্ধানেই যে ড্রাইডেন ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জেমস টমসনের (১৭০০-'৪৮) 'দি সীজনস' কবিতায় ভারতের পশ্চিম উপকূলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডক্টর স্যামুয়েল জনসন-ই (১৭০৯-'৮৪) প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক যিনি সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনসনের পরিচিত লোক ভারতে এসেছে দেশ শাসনের জন্য। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকে চিঠি পান! জনসন মনে করতেন ভারতে ইংরেজদের যে অসুবিধা এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেই তুলনায় উপার্জিত অর্থের পরিমাণ বেশী নয়। জনসনের ধারণা ছিল ভারতবাসীরা বর্বর। দেশ শাসন করবার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত: "I am clear that the best plan for India is a despotick government.. "

স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মনীষীদের সাধনার ফলে ভারতের সভ্যতা ও

সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বই বেরোতে আরম্ভ হয়েছে। আমাদের শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও ইংলণ্ডের পাঠকদের হাতে পৌঁছেছে। বইয়ের মধ্য দিয়ে একটি জাতিকে চেনার কাজ খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হয় এবং তা প্রধানত সমাজের উচ্চ স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। বই অপেক্ষা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত কাহিনীর আকর্ষণ অনেক বেশী। কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যারা ভারত ঘুরে এসেছে তাদের কাছ থেকে গল্প শুনে এদেশ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা খুব ভালো হয়নি।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপ এবং তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত অভিযোগ এডমাণ্ড বার্কের (১৭২৯-'৯৭) অপূর্ব বাগ্মীতার ফলে ইংলণ্ডে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতে স্বাধীন মন নিয়ে কেউ বসবাস করতে পারে না। ভারতবাসীরা ইংরেজদের চেয়ে ধর্ম, নীতি, কিংবা সভ্যতায় ছোট নয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "...I challenge the world to show, in any modern European book, more true morality and wisdom than is to be found in the writing of Asiatic men in high trust "

এতদিন যাবৎ ভারত ইংরেজের কাছে ছিল শুধুই ধনরত্ন ও রোমান্সের দেশ। বার্ক এবং শেরিডানের (১৭৫১-১৮১৬) বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে ইংলণ্ড সচেতন হয়ে উঠল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল অর্ধশিক্ষিত কর্মচারী ভারতকে সভ্যতাবিবর্জিত কুসংস্কারাচ্ছান্ন দেশ বলে চিত্রিত করেছে। কিন্তু বার্কের বক্তৃতায় অনেকেরই ভুল ভাঙ্গল।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের যুগ। এই যুগের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতার জন্য উন্মাদনা এবং রোমান্সপ্রিয়তা। কোনো কোনো লেখক রোমান্সের জন্য ভারতীয় পটভূমিকা এবং বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রবার্ট সাদে র (১৭৭৪-১৮৪৩) নাম। তাঁর The Curse of Kehama হিন্দু পুরাণ ও উদ্ভট কল্পনামিশ্রিত প্রতিশোধমূলক এক কাহিনী। প্রকৃত ভারত এখানে অনুপস্থিত। সাদে-র ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "of all false religions (it) is the most monstrous". টমাস মুর (১৭৭৯-১৮৫২)-এর Lalla

Rookh এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঔরঙ্গজেবের কাল্পনিক কন্যার প্রেমের কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য।

স্যার ওয়ালটার স্কট-ই (১৭৭১-১৮৩২) প্রথম ইংরেজ ঔপন্যাসিক যিনি ভারতের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস The Surgeon's Daughter-এর নায়িকা সেনি গ্রে চক্রান্তকারীর জালে পড়ে ভারতে এসে কি বিপদে পড়েছিল তারই কাহিনী বলেছেন লেখক। টিপু সুলতান এবং তাঁর পিতা হায়দার আলিকে এই উপন্যাসে দেখা যায়। স্কট ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। থ্যাকারের (১৮১১-'৬৩) 'Newcomer' উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র ভারতের সহিত সম্পর্কান্বিত। থ্যাকারের যদিও কলকাতায় জন্ম হয়েছে তথাপি স্কটের উপন্যাসে ভারতের উপস্থিতি যেমন প্রত্যক্ষ তাঁর উপন্যাসে তেমন নয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ইংলণ্ডকে উদ্দেশ করে বলেছেন:

> If for Greece, Egypt, India, Africa
> Aught good were destined
> thou wouldst step between.

ভারত সম্বন্ধে কবি এর চেয়ে বেশী কিছু ভাবেননি।

কীটস (১৭৯৫-১৮২১) গোলকুণ্ডার স্বর্ণখনি ও মণিমুক্তার কল্পনায় মুগ্ধ হয়েছেন। কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) তাঁর Fears in Solitude-এ এবং বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) The Curse of Minerva-তে ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। বায়রন বলেছেন:

> Look to the East, where Ganges' swarthy race
> Shall shake your tyrant empire to its base,
> Lo! there Rebellion rears her ghastly head,
> And glares the Nemesis of native dead,
> Till Indus rolls a deep purpureal flood
> And claims his long arrear of northern blood.

শেলী (১৭৯২-১৮২২) ভারতের নাম উল্লেখ করেছেন কোথাও কোথাও। তাঁর Lines to an Indian Air কবিতার সঙ্গে ভারতের যোগ সামান্যই আছে।

মেকলে (১৮০০-'৫৯) প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজ লেখক যিনি ভারতে

এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এ দেশের লোকদের প্রতি অবজ্ঞা তিনি সুস্পষ্টরূপে তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কলঙ্কজনক। তাঁর মতে বাঙ্গালী পরাধীন হয়ে থাকবার জন্যই জন্ম নিয়েছে। "There never perhaps existed a people so thoroughly fitted by nature and by habit for a foreign yoke."

শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতের কোনো লোকই স্বাধীনতার যোগ্য নয়। "We know that India cannot have a free government. But she may have the next best thing—a firm and impartial despotism."

ভারত যাতে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সে জন্য তিনি কাজ করেছেন। রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০) ও টেনিসন (১৮০৯-'৯২) সাতান্ন-বিপ্লবের পটভূমিকায় ভারতকে দেখেছেন। তাই ভারতের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির অভাব আছে। টেনিসন Defence of Lucknow কবিতায় ইংরেজের বীরত্বের বন্দনা করেছেন। রাস্কিন বলেছেন, ভারতবাসীরা হল "childish, or restricted in intellect, and similarly childish or restricted in their philosophies or faiths."

বহু স্বল্পখ্যাত লেখক ভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প উপন্যাস ও কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিনি। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা স্থান লাভ করেছেন তাঁরা ভারতকে কোন্ চোখে দেখেছেন তারই একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে ইংরেজ লেখকদের পরিচয় বিশ্লেষণ করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রোমান্টিক যুগের যে-সব কবিদের আমরা বিদ্রোহী এবং স্বাধীনতার পূজারী বলে জানি এবং যাঁদের কাব্য স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাব্দীকাল যাবৎ পড়ে আসছি, তাঁরা ভারতের জন্য সামান্যই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। রোমান্টিক যুগের কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা-প্রীতি। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর রচনায় বহু স্থানে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক স্বাধীনতার জয়গান করেছেন। Venetian Republic-এর পতন উপলক্ষে তিনি যে সনেট রচনা করেছেন তার শেষ দুটি লাইন হল :

Men are we, and must grieve when even the shade
Of that which once was great is pass'd away.

কিন্তু তাঁর দেশবাসীরা বহু শতাব্দীর সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের স্বাধীনতা হরণ করায় একবারও বেদনা প্রকাশ করেননি। বায়রন গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনিও ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়ে ভারতের প্রতি তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। গডউইনের শিষ্য, 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড'-এর ও 'ওড্ টু লিবার্টি'র লেখক শেলীও ভারতের বন্ধনদশাকে কাব্যে রূপায়িত করবার প্রেরণা পাননি। 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড'-এ দেখতে পাই নির্বাসিতা এশিয়া ভারতের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে নতুন দিনের অপেক্ষা করছে। ভারত সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে কিছু বলা হয়নি।

আদর্শবাদী কবিরাও হয়ত জাতীয় স্বার্থের প্রভাব থেকে সহজে মুক্তি লাভ করতে পারে না।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন ও শেলীর তুলনায় কুপার (Cowper, ১৭৩১-১৮০০) ও টমাস ক্যামবেলের (১৭৭৭-১৮৪৪) কবি-খ্যাতি উপেক্ষণীয়। তথাপি এঁরা দু'জন ভারতের দুর্ভাগ্যের জন্য যেরূপ অকুণ্ঠ সমবেদনা প্রকাশ করেছেন অন্য কেউ তা করেনি। কুপারের বিখ্যাত কবিতা 'Task'-এ দেখছি ভারতের স্বাধীনতা লাভের খবর শোনাবার জন্য কবি উদগ্রীব হয়ে আছেন। ডাকপিয়ন ভারতের কী খবর এনেছে ?

Is India free ? and does she wear her plumed
And jewelled turban with a smile of peace
Or do we grind her still ?

স্কটল্যাণ্ডের কবি ক্যাম্বেলের The Pleasures of Hope সম্বন্ধে বায়রন বলেছেন : The best didactic poem in the English language. গ্যেটেও ক্যাম্বেলের রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৭০ সালের মধ্যেই এই কাব্যের শতাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যের প্রথম খণ্ডে পরাধীন পোল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও ভারতের জন্য কবি গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে কবি দেখিয়েছেন, ভারত প্রথম হল মুসলমান শক্তির অধীন ; তারপর এল ব্রিটিশ শক্তি ; তারা ভারতকে মুক্তি না দিয়ে আরো বেশী করে বন্দী করল। তার উপর আরম্ভ হল ব্রিটিশ বণিকদের

অত্যাচার। কবি উদাত্ত স্বরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। স্বয়ং কল্কি অবতীর্ণ হয়ে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবেন।

কূপার ও ক্যাম্‌বেল কবি হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবেন না। কিন্তু ভারতের প্রতি এমন গভীর সহানুভূতি আর কোনো ইংরেজ কবির রচনায় পাওয়া যায় না। এঁদের রচনার সঙ্গে আমাদেব পরিচিত হওয়া উচিত।

জার্মান সাহিত্যে ভারত

মধ্যযুগের য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিদেশী বণিকদের মারফৎ ভারত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হয়েছিল। প্রাচীন লেখক প্লিনি, স্ট্র্যাবো, টলেমি প্রভৃতি তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ভারতের বর্ণনা দিয়েছেন। কোনো কোনো লেখক এমন কথাও লিখেছেন যে, ভারতবাসীরা নিজেদের ভাষায় হোমারের কাব্য আবৃত্তি করে। অর্থাৎ ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে অধিকাংশ য়ুরোপীয় লেখকেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করবার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগের য়ুরোপ ভারতের নদী, পর্বত, ফুল, ফল, শহর, মণি মুক্তা ইত্যাদি সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের বাহ্যিক রূপটাই য়ুরোপকে আকৃষ্ট করেছে, তার ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। থাকলেও জানবার উপায় কই? প্রয়োজনীয় বই তখনো লেখা হয়নি।

১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের জলপথ আবিষ্কার করবার পর য়ুরোপের বণিক, ধর্মযাজক ও ভ্রমণকারীরা একে একে এদেশে আসতে লাগল। ১৫০৯ সালে পর্তুগীজ সৈন্য গোয়া অধিকার করতে সক্ষম হওয়ায় সমগ্র দেশ-জয়ের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল আগন্তুকের দল। রাজ্য ও বাণিজ্যের লোভ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল, তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজ। ইংরেজ ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে জগতের সঙ্গে ভারতের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করল। আমাদের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা গবেষণামূলক বই লিখলেন। এসব গ্রন্থের সাহায্যে শুধু যে য়ুরোপ ভারতের সঙ্গে পরিচিত হল তাই নয়, আমরাও নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জানলাম।

ইংরেজের ভারত-চর্চার সঙ্গে স্বার্থের যোগ ছিল। কিন্তু জার্মানীর ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে আকর্ষণ, তা স্বার্থ-কলঙ্কিত নয়। জার্মানী ভারত-জয়ের অভিযানে বের হয়নি; এদেশে তার বাণিজ্য বিস্তার কিংবা খ্রীষ্টধর্ম

প্রচারের প্রচেষ্টাও উপেক্ষণীয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহা ও সাহিত্যপ্রীতির প্রেরণা জার্মানীতে ভারত-চর্চার মূল উৎস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্মান কবি Rudolph Von Ems-এর রচিত কাব্য-কাহিনী 'Barlaam and Josaphat' ভারতের সঙ্গে মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্যের যোগাযোগের প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বারলাম কেমন করে হিন্দু রাজকুমার জোসাফাটকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, এই কাব্যে তারই গল্প বলা হয়েছে। আসলে এটি খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী। সপ্তম শতাব্দীতে এই কাহিনী প্রথম রচিত হয়।

ওলন্দাজ ধর্মযাজক আব্রাহাম রোজার ভর্তৃহরির 'নীতি শতক' ও 'বৈরাগ্য শতক' থেকে প্রায় দু'শ শ্লোক ডাচ ভাষায় অনুবাদ করে ১৬৫৯ সালে লাইডেন থেকে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে য়ুরোপের এই বোধহয় প্রথম পরিচয়। অর্থাৎ অনুবাদেব মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যকে জানবার সুযোগ হল এই প্রথম। এর পুর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ লোকের মুখে মুখে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গল্প য়ুরোপে প্রচারিত হয়েছে। ডাচ ভাষা থেকে ভর্তৃহরির শ্লোকগুলির জার্মান অনুবাদ হয় ১৬৬৩ সালে।

এব পর দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতেব সঙ্গে জার্মান সাহিত্যেব যোগাযোগের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নেই। এদিকে ভারতে কয়েকজন সুশিক্ষিত উদারচেতা ইংরেজ কর্মচারী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় চার্লস উইলকিন্স ১৭৮৫ সালে গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ১৭৮৯ সালে উইলিয়াম জোন্স করলেন কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ। এই দুটি অনুবাদ য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজের নিকট এক নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। যে দেশ এতদিন জাদুর দেশ বলে পরিচিত ছিল, তার এক অভাবিত পরিচয় পাওয়া গেল।

জোন্সেব ইংরেজী অনুবাদ থেকে জর্জ ফরস্টার ১৭৯১ সালে শকুন্তলার জার্মান গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদগ্রন্থ জার্মান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। কালিদাস সমসাময়িক লেখক নন; শকুন্তলার কাহিনী ও পরিবেশ জার্মান পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি উন্নতমান সংস্কৃতিসম্পন্ন জার্মান জাতি শকুন্তলার অনুবাদ যেভাবে গ্রহণ করেছে, তার তুলনা আছে বলে জানি না।

জার্মান অনুবাদক ফরস্টার শকুন্তলার জনপ্রিয়তার কারণ ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন: নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শকুন্তলা প্রমাণ করেছে যে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও শাশ্বত অনুভূতিগুলি গঙ্গাতীরবর্তী ভারতীয়েরা রাইন অথবা টাইবার নদীতীরবর্তী শ্বেতকায়দের মতোই সমান দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে।

ফরস্টার তাঁর অনুবাদের এক কপি উপহার হিসাবে গ্যেটেকে (১৭৪৯-১৮৩২) পাঠিয়েছিলেন। 'শকুন্তলা' পড়ে গ্যেটে উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখেন:

If in one word of blooms of early and fruits of riper years,
Of excitement and enchantment I should tell,
Of fulfilment and content, of Heaven and Earth,
Then will I but say 'Sakuntala' and have said all.

ঐ বৎসরই (১৭৯১) এই লাইন কটি 'জার্মান মাসিক পত্রিকায়' (Deutsche Monatsschrift) প্রকাশিত হয়। গ্যেটে ও হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) তখন হ্বেইমারে থাকেন। হার্ডার গ্যেটের কাছ থেকে 'শকুন্তলা' নিয়ে পড়লেন। 'শকুন্তলা' হার্ডারকেও মুগ্ধ করল। ১৭৯২ সালের প্রথম ভাগে 'প্রাচ্যের নাটক' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধের প্রথমেই ছাপানো হয়েছিল গ্যেটের উপরোক্ত লাইন কটি।

১৭৯৮ সালে গ্যেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে আবার মন্তব্য করেন: 'যেহেতু শকুন্তলাকে ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে এযাবৎ আমরা পেয়েছি, এইজন্য এর রস একটু একটু করে চেখে দেখতে ভালো লাগে। শকুন্তলার মতো রত্ন অদূর ভবিষ্যতে আমরা ভারত থেকে আরো পাব বলে আশা করি।'

শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উৎসাহ কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পংক্তির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। 'ফাউস্টের' প্রস্তাবনার অংশটি 'শকুন্তলার' প্রস্তাবনার আদর্শে রচিত। সংস্কৃত নাটকের প্রথমেই থাকে সূত্রধার ও নটীর নাটক সম্বন্ধে কথোপকথন। য়ুরোপীয় নাটকে এই রীতি ছিল না। কালিদাসের প্রস্তাবনা পড়ে গ্যেটে 'ফাউস্টের' প্রস্তাবনা লেখার প্রেরণা লাভ করেছেন। ভাবের দিক থেকে নয়, কিন্তু আঙ্গিকের জন্য গ্যেটে কালিদাসের নিকট ঋণী। প্রস্তাবনাটি 'ফাউস্টের' অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

উইলসনের অনুবাদের মাধ্যমে গ্যেটে কালিদাসের 'মেঘদূতের' সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'What more pleasant could man wish ?
Sakuntala, Nala, these must one kiss !
And Meghaduta, the cloud messenger,
Who would not send him a soul sister !'

'শকুন্তলার' সহিত পরিচিত হবার প্রায় কুড়ি বছর পুর্বে গ্যেটে 'Dapper's Travels' থেকে রামায়ণেব গল্প পডেন। তখন তিনি আইন ক্লাসের ছাত্র। সহপাঠীদের নিকট বামায়ণের গল্প বলে তাদের আনন্দ দিয়েছেন। মানুষের বিকৃত রূপ হনুমানকে তাঁর ভালো লাগেনি।

গ্যেটে ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে দুটি গাথা রচনা করেছেন। কিন্তু এদের বিষয়বস্তু সরাসরি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পাননি। বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি 'Der Gott und die Bajadere' ও অন্যটি 'Der Paria'. এ দুটি যথাক্রমে ১৭৯৭ ও ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'পারিয়া' কাব্যটি দুটি অংশে বিভক্ত। একটিতে জমদগ্নি ঋষি ও রেণুকার গল্প ; দ্বিতীয়টি 'বেতাল-পঞ্চবিংশতির' ষষ্ঠ কাহিনী, মদনসুন্দরী কেমন করে স্বামীর কর্তিত মুণ্ড বদল করেছিল, সেই গল্প।

গ্যেটে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের'ও ভক্ত ছিলেন। জার্মান ভাষায় 'গীত-গোবিন্দের' অনুবাদ কববাব অভিপ্রায় তাঁর ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

জার্মান সাহিত্যের Sturm und Drang আন্দোলনের নেতা ছিলেন হার্ডার। তরুণ লেখকরা তাঁর কাছে আসতেন নানা বিষয় আলোচনা করতে। হার্ডার ও গ্যেটে দু'জনেই সংস্কৃত সাহিত্যের, এবং বিশেষ করে শকুন্তলার, গুণগ্রাহী ছিলেন। হার্ডার নিজে অনুবাদ করেছিলেন 'হিতোপদেশ' ও 'ভবগদ্গীতার' কোনো কোনো অংশ এবং ভর্তৃহরির কয়েকটি শ্লোক। তাঁর 'Indian' কবিতায় আছে ভারত ও 'শকুন্তলার' প্রশংসা। ১৮০৩ সালে হার্ডারের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ফরস্টারের 'শকুন্তলার' একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গ্যেটের মতো হার্ডারও 'শকুন্তলার' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভারতের

অসংখ্য ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে তিনি চেয়েছেন 'শকুন্তলার' মতো বই। কারণ 'শকুন্তলার' মধ্যে একটি জাতির যে প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে বেদ উপনিষদ পুরাণ পড়ে তা পাওয়া যাবে না।

শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) 'শকুন্তলার' গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। কালিদাসের নাটক নিয়ে গ্যেটের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। শকুন্তলা জার্মান রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পুরণ হয়নি।

হার্ডার, গ্যেটে ও শিলার সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রসাস্বাদন করেই তৃপ্ত ছিলেন। শীঘ্রই একদল জার্মান পণ্ডিত শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর না করে সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফ্রীডরিখ ফন শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)। লাইপজিগ মেলায় ফরস্টারের 'শকুন্তলা' তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে-ভাষায় এমন বই লেখা হয়েছে, সে-ভাষা শেখার জন্য তিনি সংকল্প করেন। প্যারিস চলে গেলেন সংস্কৃত শিখতে। সেখান থেকে ফিরে এসে শ্লেগেল জার্মানীতে ভারতীয়বিদ্যার সূত্রপাত করেন। ১৮০৮ সালে তাঁর একটি ছোট বই 'ভারতের ভাষা ও প্রজ্ঞা' প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও মনুস্মৃতি থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন। জার্মান ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য রাখবার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটি জার্মানীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'হিতোপদেশের' কয়েকটি গল্প এবং ভর্তৃহরির কতকগুলি শ্লোকও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীয় বিষয়-বস্তুর উপর রচিত তাঁর কয়েকটি কবিতাও আছে।

তাঁর দাদা বিখ্যাত সেক্সপীয়র সমালোচক ও অনুবাদক আউগুস্ট ভিল্‌হেলম ফন শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) ১৮১৮ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জার্মানীতে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ এই প্রথম সৃষ্টি হল। ১৮২৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'গীতার' অনুবাদ শেষ হয়। গীতার এই সংস্করণ পড়ে ভিল্‌হেলম ফন হিউমবোল্‌ট্‌ (১৭৬৭-১৮৩৫) বলেছিলেন :

.. this episode of the Mahabharata was the most beautiful, nay perhaps, the only true philosophical poem which all the literatures known to us can show."

এঁদের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে একে একে ফ্রানট্স বোপ্ (১৭৯১-

১৮৬৭), রাডল্‌ফ্‌ রোট্‌ (১৮২১-'৯৫), আলব্রেখ্‌ট ভেবর (১৮২৫-১৯০১), ভিনটারনিট্‌জ (১৮৬৩—১৯৩৭) ম্যাক্স মুয়েলার (১৮৩২-১৯০০), প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন। এসব গ্রন্থ মূলত সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে না বলে এখানে আমরা তাদের আলোচনা করব না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ক্রিস্টিয়ান লাস্সেন (১৮০০-'৭৬)-এর কথা একটু আলাদা। তাঁর 'গীতগোবিন্দ' ও 'মালতী মাধবের' অনুবাদ কাব্যগুণ-সম্পন্ন; অনেক জার্মান লেখক এই দুটি অনুবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বিখ্যাত সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস্‌ (১৮৪২-১৯২৭) 'মেইন কারেন্ট্‌স্‌ অব য়ুরোপীয়ান লিটারেচার' গ্রন্থে হেনরিখ্‌ হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি নিজে জার্মানীতে বাস করলেও তাঁর আত্মা বাস করত গঙ্গার তীরে। এ কথা অনেকাংশে সত্য। গ্যেটে জার্মানীতে বসে 'শকুন্তলার' মাধুর্য উপভোগ করেই তৃপ্ত। কিন্তু হাইনের কবিতায় ভারতের প্রতি একটা প্রবল রোমান্টিক আকর্ষণ দেখতে পাই। আউগুস্ট শ্লেগেল বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। হাইনে তাঁর লেখা পড়ে এবং আলোচনা শুনে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। সংস্কৃত কাব্যের উপমা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা ইত্যাদি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তিনি। চাঁদের প্রণয়িনী কুমুদ ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। এর উপর তিনি কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করেছেন। নারিকেলকুঞ্জ, মুকুলিত আম্র কানন, পদ্মফুল, নৃত্যরত হরিণ ও ময়ুর, কোকিলের গান, গঙ্গার তীর—এসব হাইনের কবিতায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত তাঁর কাছে স্বপ্নের দেশ। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে গঙ্গাতীরবর্তী কুঞ্জবনে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। একটি কবিতা তিনি শুরু করেছেন এইভাবে:

Oh, I would bear thee, my love, my bride,
Afar on the wings of song,
To a fairy spot by the Ganges side,
I have known and and have loved it long.

তারপর সেখানে কী মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখা যাবে একে একে তা প্রিয়তমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

ভারতের প্রেরণায় হাইনে যতগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন অন্য কোনো জার্মান কবির কাছ থেকে আমরা তা পাইনি। হাইনের গদ্য রচনাতেও সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত সুরস্রস্টা ও লেখক রিখার্ট ভাগ্‌নার (১৮১৩-'৮৩) একটি বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে তাঁর সর্বশেষ নাটক 'Parsifal' রচনা করেছেন। 'পার্সিফল' রচনার কয়েক বছর পূর্বে ভাগ্‌নার 'বিজয়ী' নামে একটি বৌদ্ধ নাটকের খসড়া করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করেননি। আনন্দ ছিলেন সেই খসড়া নাটকের নায়ক। তাঁর আত্মা বিশুদ্ধ; প্রেমের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে তিনি যখন দূরে সরে গেছেন তখন হল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়। প্রকৃতি তাঁকে ভালোবাসল, সংসারে ফিরিয়ে আনতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হল তার সকল চেষ্টা। অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও জাগতিক প্রেমের আকর্ষণ কাটিয়ে পরিশুদ্ধ হতে সক্ষম হল। আনন্দ ও প্রকৃতির ছায়া অবলম্বন করে ভাগ্‌নার তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের নায়ক-নায়িকা পার্সিফল ও কুন্দ্রির চরিত্র এঁকেছেন। বৌদ্ধ কাহিনীর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ আকস্মিক নয়। তিনি এক বন্ধুকে একবার লিখেছিলেন : আমি নিজের অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি।

১৮৮৭ সালে রেডেনশটেট (১৮১৯-'৯২) শকুন্তলার কাহিনী অবলম্বনে পাঁচ সর্গ বিশিষ্ট একটি রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন। মহাভারতের উপাখ্যান ও কালিদাসের নাটক ব্যবহার করলেও কবি নিজে অনেক নতুন ঘটনা সৃষ্টি করেছেন এবং কোথাও কোথাও প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন করেছেন।

এর পূর্বে ফ্রীডরিখ রুকার্ট (১৭৮৮-১৮৬৬) Brahmanische Erzalungen নামে কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহটি বের হয় ১৮৩৯ সালে। লেখক প্রাচ্যবিদ্ এবং কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভারতের সাহিত্য, পুরাণ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের উপর অনেকগুলি কবিতা এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতের গল্প যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি প্রতাপসিংহ, চাঁদবিবি, আকবর, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও তিনি কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন। আর কোনো জার্মান কবি ভারতের এত বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

জার্মান দর্শনের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার কি প্রভাব পড়েছে এখানে

আমাদের তা আলোচ্য নয়। তথাপি শোপেনহাউয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) ও নীটশের (১৮৪৪-১৯০০) অনেক রচনা দর্শনের গণ্ডি অতিক্রম করে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে, যাবা নিছক সাহিত্যপাঠক তাঁরাও এঁদের রচনা পড়ে আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং এঁদের উপর ভারতেব প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

শোপেনহাউয়াবের দর্শন বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনেব দ্বারা কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছড়িযে আছে। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রাচ্যেব মতবাদ পাশ্চাত্ত্য অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। শোপেনহাউযাব বলেছেন, উপনিষদ তাঁব জীবনেব শান্তি ও মৃত্যুকালের সান্ত্বনা।

নীটশে তাঁর Antichrist গ্রন্থে মনুস্মৃতি সম্বন্ধে বলেছেন: a work which is spiritual and superior beyond comparison, which even only to name in one breath with the Bible would be a sin against the Holy spirit

সমাজের উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর লোকদেব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এমন সমর্থন মনুস্মৃতির মধ্যে পাওয়া যায়, এই বিশ্বাসে নীটশে উপরোক্ত মন্তব্য কবেছেন। কারণ তিনি সুপারম্যানেব পূজারী, সুপারম্যান গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। অ্যারিস্টোক্র্যাসিই সুপাবম্যানেব লালনভূমি হতে পাবে। অ্যারিস্টোক্র্যাসির সমর্থন থাকায় মনুস্মৃতির মধ্যে তিনি পেযেছেন জীবনশক্তির সুদৃঢ় স্বীকৃতি। অবশ্য নীটশেব মনুস্মৃতিব ব্যাখ্যা নির্ভুল নয।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয কাহিনী নিযে দুটি উপন্যাস বচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান কাব্যসাহিত্যে ভাবতের যে প্রভাব পড়েছে তাব বহু দৃষ্টান্ত পাওযা যায়। কিন্তু জার্মান কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায বিংশ শতাব্দীতে।

নোবেল পুবস্কার-প্রাপ্ত লেখক হেরমান হেসের (১৮৭৭ ১৯৬২) 'সিদ্ধার্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালে। 'সিদ্ধার্থে'ব কাহিনী, পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ ও জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ভারতীয়। বুদ্ধের সমসাময়িক এক ব্রাহ্মণকুমার অতৃপ্ত জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিল। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করল বাঁচবার রহস্য এবং দুঃখজয়ের ইঙ্গিত। কাব্যময় ভাষায়

রচিত দার্শনিক উপন্যাস একজন বিদেশী লেখকের হাতে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে বিস্মিত হতে হয়।

১৯৪৫ সালে হেসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Das Glasperlenspiel প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরেজীতে এর অনুবাদ হয়েছে Magister Ludi বা 'প্রধান পুরোহিত' নামে। উপন্যাসের নায়ক ক্যাস্টেলিয়ার প্রধান পুরোহিত জোসেফ ক্নেখ্‌ট। এঁর জীবনের কাহিনী পাই এই উপন্যাসে। জোসেফের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তিনটি কাল্পনিক রচনা পাওয়া গেল। জোসেফের পূর্ববর্তী তিন জীবনের গল্প। তৃতীয় বার তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ভারতের এক হিন্দু রাজপুত্র হয়ে। এই জন্মের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। এটি ভারতীয় মায়াবাদ সম্বন্ধে একটি অনবদ্য উপাখ্যান।

এর পর ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস পেয়েছি টমাস মানের (১৮৭২-১৯৫৫) কাছ থেকে। হেসের মধ্যে আমরা প্রাচ্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করি ; কিন্তু টমাস মানের রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস Die Vertauschten Kopfe-কে যেন অনেকটা আকস্মিক মনে হয়।

সীতা, শ্রীদমন ও নন্দ,—এই তিনজনকে নিয়ে কাহিনী। শ্রীদমন ও নন্দ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু তাদের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। শ্রীদমন শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ; কিন্তু তার দেহ কোমল। নন্দ লেখাপড়া শেখেনি ; তার বলদীপ্ত চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নন্দর সহায়তায় শ্রীদমন সীতাকে বিয়ে করেছে। সীতা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নন্দর সুঠাম দেহের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একবার দূরদেশে যাত্রার পথে বনের মধ্যে চণ্ডীর মন্দিরে দুই বন্ধু অবস্থা বিপাকে আত্মহত্যা করে। দেবী সীতার দুঃখে বিগলিত হয়ে বর দেন যে কর্তিত মুণ্ড ধড়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই স্বামী ও তার বন্ধু বেঁচে উঠবে। সীতা ব্যগ্র হয়ে মাথা লাগাতে গিয়ে স্বামীর মাথা নন্দর ও নন্দর মাথা স্বামীর দেহে লাগিয়ে ফেলল। এরপর তিনজনের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল তা সমাধানের জন্য সকলে মিলে আত্মহত্যা করল।

কাহিনীর কাঠামোটি মান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে নিয়েছেন। হয়ত গ্যেটের 'পারিয়া' গাথা-কাব্যটি তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু তার সঙ্গে মনোবিশ্লেষণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যোগ করে মান এই পুরনো কাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছেন। সীতা ব্যস্ততার জন্যই মাথার ওলট-পালট করেছিল, না তার অবচেতন মনে নন্দর দেহের প্রতি আকর্ষণজাত এই ভুল? মান সাদাসিধে গল্পটিকে ইঙ্গিতময় ও গভীর করে তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য জার্মান সাহিত্যিকদের রচনায়ও ভারতের উল্লেখ আছে। স্টেফান জর্জ (১৮৬৮-১৯৩৩) 'Gelle Rose'-এ যে মায়াবিনীর কথা বলেছেন সে এক অজ্ঞাতনামা হিন্দু দেবী। গঙ্গা থেকে সে উঠে এসেছে, মোমের পুতুলের মতো দেখতে, ঘনপক্ষ্ম চোখের পাতা নাড়লে শুধু মনে হয় তার প্রাণ আছে।

হিউগো ফন হফ্‌মান্‌স্টাল (১৮৭৪-১৯২৯)-এর নাটক 'Die Hochziet der Sobeide' (সোবেইডের বিয়ে) একটি ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন এবং সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী এই নাটকে বলা হয়েছে।

ম্যাক্সমিলিয়ান ডাউটেন্‌ডের (১৮৬৭-১৯১৮) দুটি গল্প সংগ্রহে ভারত ও পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প আছে।

প্রতিষ্ঠাবান লেখক ফোয়খ্‌টভাগনার (১৮৮৪-১৯৫৯) ১৯১৭ সালে জার্মান রঙ্গমঞ্চের জন্য কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌'-এর কাহিনীকে 'রাজা ও নর্তকী' নাম দিয়ে নবরূপ দান করেছেন।

হেরমান জুডাবমানের (১৮৫৭-১৯২৮) 'ইণ্ডিয়ান লিলি'-র নায়ক নিয়েবেল-ডিঙ্গকের অভ্যাস এই যে কোনো মহিলা তাকে আত্মদান করলে পরদিন সকালে সে এক গুচ্ছ ফুল সেই মহিলাকে পাঠিয়ে দেবে। রাত্রিযাপনের পর এই ফুল উপহার দেবার ইঙ্গিতার্থ:

In spite of what has taken place you are as lofty and as sacred in my eyes as these pallid, alien flowers (Indian lilies) whose home is beside the Ganges.

স্টেফান ৎস্‌ভাইক (১৮৮১-১৯৪২) আধুনিক জার্মান সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও জীবনী লেখক। প্রাচীন ভারতের জীবন নিয়ে তিনি একটি অনবদ্য গল্প লিখেছেন। গল্পটির নাম Virata or the Eyes of the Undying Brother.

বুদ্ধের জন্মের পূর্বে রাজপুতানা অঞ্চলে বিরাট নামে একজন চরিত্রবান লোক বাস করত। সে ছিল কুশলী যোদ্ধা। একবার বিদ্রোহী সেনা রাজ্য আক্রমণ করবার পর বিরাট রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে শত্রু শিবির ধ্বংস করল। যুদ্ধ হয়েছে রাত্রে; সকালবেলা মৃত শত্রুসেনার স্তূপের মধ্যে আবিষ্কার করল তার দাদার মৃতদেহ। সে জানত না যে দাদা শত্রুপক্ষের নেতা ছিলেন। দাদার বিস্ফারিত চোখের অপলক দৃষ্টিতে যেন ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছে। সব মানুষই ভাইয়ের মতো। বিরাট, তুমি তাদের হত্যা করে পাপ করেছ। মৃত চোখের দৃষ্টি বিরাটের বুকে বিদ্ধ হল।

রাজা খুশি হয়ে তাকে সেনাপতি করতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট তো আর কখনো যুদ্ধ করবে না। তাই সে চেয়ে নিল বিচারকের পদ। বিচারক হিসাবে রাজ্যের সর্বত্র তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এমন সময় এক ম্লেচ্ছ যুবককে ধরে আনা হল বিচারের জন্যে। প্রণয়মূলক কলহে মত্ত হয়ে সে অনেকগুলি খুন করেছে। বিরাট রায় দিল, যুবককে ভূগর্ভের অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ রাখতে এবং তাকে চাবুক মারতে। যুবক রায় শুনে বলল, হে বিচারক, আমি উন্মত্ত হয়ে খুন করেছি; কিন্তু তুমি সুস্থচিত্তে আমাকে হত্যা করবার আদেশ দিলে। কারাগারের নারকীয় জীবন তুমি ভোগ করোনি, জানো না কী তার বেদনা, অথচ বিচারকের আসন থেকে সেই নরকে আমাকে নিক্ষেপ করতে তোমার দ্বিধা নেই। এই কি বিচার?—বিরাট ম্লেচ্ছ যুবকের চোখে দেখতে পেল দাদার তিরস্কারপূর্ণ চোখ। বিচারকের পদ ছেড়ে সে সন্ন্যাসী হল। বনে এসে শুরু করল তপস্যা।

সাধক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল কিছুদিনের মধ্যে। উপদেশ শুনতে ভিড় হয়। একদিন এক রমণী এসে অভিযোগ করল: হে সন্ন্যাসী, তোমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। তার ফলে অনাহারে থেকে আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের দুর্দশার জন্য তুমিই দায়ী। বিরাট এই রমণীর চোখে দাদার মৃত চোখের ভর্ৎসনা দেখে চমকে উঠল।

এখন সে উপলব্ধি করল, তার দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ, বিচারক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভের অভীপ্সা কামনাজড়িত ছিল বলেই সে অপরের দুঃখের কারণ হয়েছে। যাকে বিশুদ্ধ কামনা বলা হয়, তার মধ্যেও পাপের বীজ থাকে। একমাত্র সেবা কারো জীবনে অমঙ্গলের কারণ

হয় না। তাই বিরাট রাজধানীতে ফিরে এসে রাজপ্রাসাদের কুকুরশালার ভার চেয়ে নিল। অবশিষ্ট জীবন কুকুরের সেবা করে কাটিয়ে দিল।

জীবনের গভীর তত্ত্ব একটি রসসমৃদ্ধ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কেমন সুষ্টুভাবে বলা যায়, এই গল্পটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা উৎসাহের সঙ্গে চলছে। 'শকুন্তলার' অভিনয় আজও জনপ্রিয়। নাৎসী অত্যাচার শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর হাজার হাজার কপি জার্মানীতে বিক্রি হয়েছে। ভারতীয়বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান বই আমরা এখনো জার্মানী থেকে পাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য পর্যালোচনা কবলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন ভারতই জার্মান লেখকদের আকৃষ্ট করেছে, বর্তমান ভাবত নয়। বর্তমান শতকের লেখকরাও প্রাচীন ভারতকে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। ডাউনটেন্‌ডের কয়েকটি গল্প এব উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। জার্মান সাহিত্যে বোমাণ্টিক ধারা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। এর অস্পষ্ট কাব্যময় পরিচয় জার্মান লেখকদের মন থেকে এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

যে সব জার্মান লেখকের বর্তমান ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, তাঁরাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রকাশ করেছেন। ভাল্‌ডেমার বনসেলস্ (১৮৮১-১৯৫২) এর 'Indienfahrt (ভারতযাত্রা)' জার্মানীতে এক নতুন ধারাব ভ্রমণ সাহিত্যের প্রবর্তন করে। আধুনিক জার্মান সাহিত্যের এটি একটি জনপ্রিয় বই। কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনার সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন ভারতে একদিকে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সমারোহ, অন্যদিকে মানুষের চরিত্রে নিদারুণ দৈন্য. হেরমান হেসে এবং স্টেফান ৎস্‌ভাইগও ভারত ভ্রমণ করে হতাশ হয়েছেন। প্রাচীন ভারতে জীবনের যে বৈশিষ্ট্য বিদেশীদের যুগে যুগে আকৃষ্ট করেছে, তা আর নেই। ভারত এখন য়ুরোপেরই নিকৃষ্ট সংস্করণ।

এঁদের স্বপ্ন-ভঙ্গের হতাশা বিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজন্মের বেদনা উপলব্ধি করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্যপত্রিকা

সাহিত্যপত্রের দুর্দিন শুধু আমাদের দেশে দেখা দেয়নি। বিদেশেও সাহিত্যপত্র পরিচালনায় সংকট দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এদের মধ্যে দু'একটির প্রচার-সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বই-এর কাটতি বাড়ছে, তবু সাহিত্যপত্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছে কেন তার উত্তরে সাহিত্যের রূপান্তর সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিলেই যথেষ্ট হবে না। যুগধর্মের প্রভাবে সাহিত্যের যে রূপান্তর ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ অনাদর নয়। অন্তত ব্যবসার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এখন একটি চলনসই বইয়ের যত কাটতি হয়, পূর্বে কখনো তা হত না। লেখকদের আয় বেড়েছে, প্রকাশকদের ব্যবসা বিস্তার লাভ করছে, নবপ্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বেড়ে চলেছে, কিন্তু সাহিত্যপত্রের দিগন্তে কোন স্বর্ণরেখার আভাস নেই।

তার কারণ, সাহিত্যপত্রের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে, এসব সমস্যা সাহিত্যগ্রন্থকে স্পর্শ করতে পারে না।

একটা বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্যই সাময়িক পত্রিকার শুরু হয়। যে-সব রচনা বই হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে না, সংবাদপত্রেরও উপযোগী নয়, তাদের জন্যই সাময়িক পত্রিকা। ছোট গল্প, গীতি কবিতা এবং নিবন্ধ রচিত হতে লাগল মানুষের ব্যস্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। লেখকদের পক্ষে মহাকাব্যের পরিকল্পনা অসম্ভব হয়ে পড়ল। পাঠকদেরও সময় সংকুচিত হয়েছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েক পাতার রচনা পড়া সম্ভব, বড় বই পড়বার মতো সময় ও ধৈর্য খুবই কম। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে যে রূপান্তর দেখা দিল সাময়িক পত্রিকার মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠল। লেখকরা আশ্চর্য স্বাধীনতা পেলেন; যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে কিছু গুছিয়ে বলতে পারলেই তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে আর বাধা রইল না। অসংখ্য নতুন লেখক সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জন আস্ত একটা বই লিখতে বসবে না। তবু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ব্যক্তিগত চিন্তার ঝলক প্রকাশ করবার সুযোগ

পেল এরা। গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের এরূপ সুযোগ অত্যাবশ্যক।

'ম্যাগাজিন সাহিত্য' পাঠকদের মন সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বৈচিত্র্য দিয়ে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রচনা একটি পত্রিকার মধ্যে পড়বার সুযোগ পাওয়া কম সুবিধার কথা নয়। ইংরেজী 'ম্যাগাজিন' কথাটি এসেছে আরবী ভাষা থেকে, যার গোড়ার কথা হল গুদামঘর। সাময়িক পত্রিকা সত্যি গুদামের মতো। বর্তমান পাঠক এবং ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য নানা বিষয়ের আলোচনা সংকলন করা হয় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। বইয়ের মধ্যে যে-সব বিষয় পাওয়া যায় না, তাদের আলোচনা হয়ত পাওয়া যাবে পুরানো পত্রিকার কোনো এক খণ্ডে। ১৮৫০ সালের গ্রন্থাগারের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ব্রিটেনে তখন সাময়িক পত্রিকার বাঁধানো খণ্ডগুলি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

সাময়িক পত্র যখন প্রথম বেরুলো তখন তাদের মূল্য সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটই ছিল খুব বেশী। তখন একই পত্রিকায় সংবাদ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ইত্যাদি সকল বিষয় স্থান পেত। ক্রমশ সংবাদ পরিবেশনের জন্য জন্ম হল সংবাদপত্রের। তারপর এলো বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে একে একে স্থাপিত হতে লাগল নানা ধরনের সমিতি। বিজ্ঞানের সমস্যা এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার প্রয়োজন দেখা দিল। সমাজে শ্রম-বিভাগের ফলে গড়ে উঠল বিভিন্ন বৃত্তিগোষ্ঠী। বৃত্তিকে উন্নত করবার জন্য মুখপাত্রের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করা দরকার। আজকাল হাজার হাজার বৃত্তিমূলক পত্রিকা বের হয়।

এমনি করে ধীরে ধীরে সকল বিষয় আলোচনা করবার মতো সাধারণ সাময়িক পত্রিকা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এটা বিশেষজ্ঞের যুগ, বিশেষ জ্ঞান নিয়ে তাঁদের কারবার, সুতরাং যুগের তাগিদে বিশেষ-বিষয়ক পত্রিকাগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

একমাত্র সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে এমন কাগজের সংখ্যা সকল দেশেই কম। সাহিত্যের সংজ্ঞা এখন ব্যাপক হয়েছে। সুতরাং সাহিত্যপত্রের পরিধি অনায়াসেই একটু বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। যে কাগজ হিউম্যানিটিজ নিয়ে আলোচনা করে—তাকেই আজকের দিনে অন্তত সাহিত্যপত্র বলা যায়। কিন্তু

একটি শর্তে : পত্রিকার প্রধান ঝোঁক থাকবে সাহিত্যের উপর। মানবতা সম্বন্ধীয় যে-কোনো বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লেখা হতে পারে, কিন্তু তার প্রকাশ হবে সাহিত্যের রসে সমৃদ্ধ। জনপ্রিয়তা সাহিত্যপত্রের লক্ষ্য নয়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ক্যারাক্টার গড়ে তোলাই সাহিত্যপত্রের উদ্দেশ্য। এই বৈশিষ্ট্য যে সকল ক্ষেত্রে মহৎ ও আদর্শস্থানীয় হবে তেমন কোনো কথা নেই। আর পাঁচটি কাগজের ভিড়ে যে পত্রিকা হারিয়ে যায় তাকে সাহিত্যপত্র বলা চলে না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যপত্রের প্রাণ। এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করবার জন্য সাহিত্যিক সম্পাদক চাই। অন্তত তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরসিক হতে হবে। আর চাই সম্পাদকের রুচিবোধের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য না থাকলে পত্রিকার ক্যারেকটার ফুটে উঠবে কি করে? বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, সবুজপত্র, কল্লোল, পরিচয় প্রভৃতি উপরোক্ত উক্তি সমর্থন করবে। বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব না হলে সাহিত্যরসিক সম্পাদক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। বৈশিষ্ট্য হারানোই সাহিত্যপত্রের মৃত্যু ; তারপর পত্রিকা বের করবার কোনো অর্থ হয় না। এই লক্ষণটির মধ্যেই সাহিত্যপত্রের অকালমৃত্যুর কারণ নিহিত আছে। সাহিত্যপত্রের প্রধান নির্ভরস্থল সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির উপর যা নির্ভরশীল তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তাই সকল দেশেই সাহিত্যপত্র স্বল্পায়ু। লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পত্রিকা রুটিনমাফিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে কাগজ বের হয় যান্ত্রিক নিয়মে। তার পরমায়ুর নির্দিষ্ট সীমা নেই। ক্ষীণস্বাস্থ্য সন্তানের জননীর মতো সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদককে প্রথম থেকেই যে শঙ্কা অনুভব করতে হয়, লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জনপ্রিয় পত্রিকার পরিচালক তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

সাহিত্যপত্রিকা স্বল্পায়ু বলে ক্ষোভের কারণ নেই। অল্পকালের মধ্যেই সে তার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে। এক-একটি সাহিত্যপত্র দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তন করে, সৃষ্টি করে নতুন উদ্দীপনা, তৈরী করে নতুন লেখক। সাহিত্যপত্রিকার আসরে অবারিত আহ্বান থাকে না। সম্পাদক তাঁর লেখকদের খুঁজে নেন, কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান লেখকের সঙ্গে স্থান দেন প্রতিশ্রুতিবান নবীন লেখকদের। যে-সব লেখক কাগজের আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের রচনা কাগজের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে—সম্পাদক শুধু

তাঁদেরই আমন্ত্রণ করেন। লেখকরাও লেখেন পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে অন্তরের যোগ অনুভব করেন বলে, পারিশ্রমিকের লোভে নয়।

প্রতিপত্তিশালী সাহিত্যপত্রিকা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে তোলে। স্বল্পায়ু হলেও ক্ষতি ছিল না, একটি বন্ধ হলে আর একটি আরম্ভ হত। এমনি করেই আমরা এতদিন সাহিত্যপত্রেব দান পেয়ে এসেছি। কিন্তু এখন সাহিত্যপত্রের আঁতুড়েই মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে; নতুন সাহিত্যপত্র প্রকাশের পরিকল্পনাকে দুঃসাহস ছাডা আর কিছু ভাবতে পারি না। এই সংকটের কারণ কি? সাধারণ ভাবে সাহিত্যের যে সমস্যা, সাহিত্যপত্রকেও সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার নিজস্ব সমস্যাগুলিব মধ্যে প্রধান হল সংবাদপত্রের সাময়িকীব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটি পত্রিকার চারটি রবিবাসরীয় সংখ্যা যত পাঠ্যবস্তু পরিবেশন করতে পারে মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যায় নির্দিষ্ট মূল্যে তা দেওয়া সম্ভব নয়। সংবাদপত্রের সাময়িকীর জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। নগদ দক্ষিণা দিয়ে সাহিত্যপত্র কেনার ঔৎসুক্য কম লোকেরই আছে, কিন্তু সংবাদপত্র না হলে জীবন অচল। সংবাদপত্র কিনলে বিনামূল্যে ফাউ পাওয়া যায় সাহিত্য-সাময়িকী। কর্মব্যস্ত সাধারণ মানুষের সাহিত্য-তৃষ্ণা এতেই অনেকটা তৃপ্ত হয়। নতুন সাহিত্যপত্রিকা কেনার উৎসাহ থাকে না।

আজকাল ছাপা-বাঁধাই-কাগজের মূল্য বেড়ে চলেছে, তার ফলে শুধু পত্রিকা বিক্রয়ের অর্থের উপর নির্ভর করে কাগজ বের করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দাঁডিয়েছে। সাহিত্যপত্রের গ্রাহক-সংখ্যা স্বভাবতই কম, সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতারা সাহিত্যপত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আগে পাঁচমিশালী সাময়িক পত্রিকায় সকল পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। এখন বিশেষ-বিষয়ক পত্রিকায় বিশেষ পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকায় ঔষধ প্রস্তুতকাবকরা সাগ্রহে বিজ্ঞাপন দেবে। সাহিত্যপত্রে বিজ্ঞাপন দেবার আগ্রহ তাদের না থাকাই স্বাভাবিক। সাহিত্যপত্র বিশেষরূপে দাবী করতে পারে পুস্তকের বিজ্ঞাপন। বিদেশের প্রকাশকরা দেখেছে, সাহিত্যপত্রের পাঠকরাই সবচেয়ে বেশি বই কেনে। যে পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা অনেক তার পাঠকদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক পাঠকই পুস্তকের প্রতি আগ্রহশীল। সুতরাং বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহিত্যপত্র বাঁচিয়ে বাখবার জন্য বিদেশের পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশকরা যত্নবান।

পূর্বে সাময়িক পত্রিকায় এমন কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হত যা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার ফলে সাময়িক পত্রিকার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এখন যে কোনো চলনসই রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রম্য রচনা, লঘু ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বইয়ের আকারে আজকাল পাওয়া সম্ভব হয়েছে প্রকাশকদের ব্যবসায় বিস্তৃতির ফলে। সাহিত্যপত্রের পৃষ্ঠায় না পড়তে পারলেও ক্ষতি নেই, বই হয়ে বেরুলে পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এনে পড়া যাবে। শস্তা কাগজের মলাটের বইও সাহিত্যপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সংখ্যা পত্রিকার যে দাম, সেই দামে কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের সম্পূর্ণ একটি বই পাওয়া গেলে লোভ দমন করা সহজ নয়। তাছাড়া, আমাদের সংস্কৃতি গ্রীক্ পুরাণোক্ত দু'মুখো দেবতার মতো, স্বদেশের সংস্কৃতির পরিচয় তো রাখতেই হবে, আবার পাশ্চাত্যের কথাও জানা চাই। শুধু বাঙলা পুঁথিপত্র পড়লে যথেষ্ট হয় না, ইংরেজী পত্রিকা ও বই না হলে নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। তার ফলে পুঁথিপত্র কেনার যৎসামান্য ব্যক্তিগত বরাদ্দ দু'ভাগ হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, বাঙলার অংশটা অপেক্ষাকৃত ছোট।

সাহিত্যপত্রের বেঁচে থাকবার আর একটি প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত লেখকের অভাব। প্রত্যেক লেখককেই আগে কয়েক বছর শিক্ষানবিশী করতে হত সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। শিক্ষানবিশীর যুগ উঠে গেছে দুটো কারণে—প্রথমত, জীবন বড় কঠোর হয়েছে; বাবা কিংবা দাদার উপার্জনের উপর নির্ভর করে কয়েক বছর সাহিত্যচর্চার সুযোগ আর পাওয়া যায় না। এখন চাকরি জীবন আরম্ভ করতে হয় ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, দ্বিতীয়ত, প্রকাশকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন লেখকের মধ্যে একটু প্রতিশ্রুতির চিহ্ন দেখলেই তাকে দিয়ে বই লেখানোর তাগিদ শুরু হয়। লোভী ব্যবসায়ীর জাঁক দিয়ে কাঁচা ফল পাকানোর মতো অবস্থা দাঁড়ায়। নবীন লেখক প্রকাশকের কৃপায় হঠাৎ বিখ্যাত লেখক হয়ে ওঠে। সাহিত্যপত্রের চেয়ে প্রকাশকের আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনেক বড়।

বিদেশে সাহিত্যপত্রের জন্য প্রবন্ধসাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ পাওয়া যায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন অধ্যাপক লেখেন? সাহিত্যপত্রের প্রবন্ধ তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তির উপর রচিত হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপকদের নিকট আমরা

নিঃসন্দেহে এই যোগ্যতা আশা করতে পারি। তাঁদের অবকাশ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের অধ্যাপকরা সাধারণ বাঙালী লেখকদের মতো দারিদ্র্যক্লিষ্টও নন। অধ্যাপকরা যদি নিজেদের বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ লিখতেন তাহলে বাঙলাদেশের পত্রিকাগুলির, বিশেষ করে সাহিত্যপত্রের, মান উন্নত হতে পারত, দূর হতে পারত উপযুক্ত রচনার দুর্ভিক্ষ।

সাহিত্যপত্র নতুন লেখক আবিষ্কার করে, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় সাহিত্যপত্রের পৃষ্ঠায়, প্রকাশকদের সুযোগ দেয় নতুন প্রতিভা খোঁজবার, সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করে রাখে, রচনাবৈচিত্র্য দিয়ে সাহিত্যপাঠককে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচায়। সাহিত্যপত্রের সংকট সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকটের ইঙ্গিত। এই সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণব্রতী ফাউণ্ডেশান সাহিত্যপত্র পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সাহিত্য শুধু লেখকদের জন্য নয়, তা সকলের জন্য। যা সকলের জন্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী এগিয়ে আসে না। চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখবার দায় চিকিৎসকদের, তাই সে পত্রিকা প্রায়ই বাঁচে, এবং ভাল করেই বাঁচে। 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'—এই বাঙলা প্রবাদের মতো সাহিত্যের অবস্থা। সাহিত্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, শিক্ষক, সকল শ্রেণীর জন্য। তাই কোনো শ্রেণীরই সাহিত্যপত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ দায়িত্ব নেই।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য

সমীক্ষার স্থবিধার জন্য সকল দেশের ইতিহাসকেই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে। কবে এক যুগের শুরু এবং কবে আর একটি যুগের শেষ হল তার নির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একটি যুগ শেষ হবার আগেই আর একটি যুগের অলক্ষ্য পদক্ষেপ আরম্ভ হয়ে যায়। য়ুরোপের মধ্যযুগের কাল নির্দেশ পণ্ডিতরা যেরূপ সুস্পষ্টরূপে করে থাকেন অন্য দেশ সম্পর্কে তেমন নজির পাওয়া যায় না। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথ বা পশ্চিম গথরা রোম অধিকার করে। মধ্যযুগের সূত্রপাত তখন থেকে। আর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল তুরস্কের অধিকারে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের সমাপ্তি। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে রোম সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খ্রীঃ অঃ) এবং রেনেসাঁসের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী প্রায় এক হাজার বছর য়ুরোপের মধ্যযুগ।

এই হাজার বছরের দীর্ঘ যুগকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম পাঁচশ বছরকে বলা হয় 'অন্ধকার পর্ব'। প্রথমার্ধে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে পণ্ডিতরা একে 'অন্ধকার পর্ব' আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য পূর্বে সমগ্র মধ্যযুগকেই অবজ্ঞার চোখে দেখা হত। তখন ধারণা ছিল মধ্যযুগ বন্ধ্যা, নব নব সৃষ্টির প্রেরণা ছিল না সে যুগে। পরবর্তী-কালে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যযুগ বন্ধ্যা বা অন্ধকার নয়। প্রধানত এটা প্রস্তুতির যুগ। বর্তমান কালের জন্য প্রস্তুতি। শিল্পে, সাহিত্যে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিকতার সূত্রপাত মধ্যযুগেই হয়েছে। কোথাও নতুনের ঘোষণা সুস্পষ্ট, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যের অনেকগুলি লক্ষণ নিশ্চিতরূপে চেনা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে একালের সাহিত্যের উপলব্ধি পূর্ণতর হবে। মধ্যযুগে যে ধারার শুরু হয়েছে তারই পরিণতি ঘটেছে আধুনিক সাহিত্যে।

সেদিনকার সাহিত্য যে পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল প্রথমে তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

রোম সাম্রাজ্যের দাপটে য়ুরোপের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে

ঐক্যানুভূতি বিবাজ কবত। রোম মূলত গ্রীক সভ্যতার ধাবা অনুসরণ করবার ফলে প্রাচীন যুবোপেব সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও রোম পিছিয়ে ছিল না। বোম সাম্রাজ্যেব পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার লাভ কবেছিল, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হযেছিল নানা দেশেব সঙ্গে। আব সেই সূত্রে দেশান্তবেব শিক্ষা ও সংস্কৃতিব নতুন নতুন ধাবা এসে যুবোপেব মনোজগতকে সমৃদ্ধ করেছে।

বোম সাম্রাজ্য পতনেব পব দেখা গেল যুবোপেব ঐক্য দৃঢসংবদ্ধ নয। সমগ্র যুবোপ টুকবো টুকবো হযে গেল স্থানীয প্রতাপশালী জমিদাবদেব অধীনে। দেখা গেল, যুবোপেব সকল অঞ্চলে সভ্যতাব মান এক নয। জার্মানীর বর্বব দল যুবোপেব বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করে পর্যুদস্ত কবতে লাগল। আর্থিক, সামাজিক ও বাজনৈতিক অনিশ্চযতাব মধ্যে পডে সাধাবণ নাগবিকের জীবন অসহনীয হযে উঠল। এই সুযোগে বোমান ক্যাথলিক চার্চ অধিকাব কবল বোম সাম্রাজ্যেব স্থান। ধর্মেব অনুশাসন যুবোপে খানিকটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা কবতে সক্ষম হল। কিন্তু জীবন বাঁধা পডল ধর্মেব খোঁটায। পদে পদে গির্জাব কর্তৃপক্ষেব নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য কবা হল। জীবনেব স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বহুলাংশে রুদ্ধ হযে গেল।

মধ্যযুগেব দ্বিতীযার্ধে দেখছি জার্মানীব ববব উপজাতিগুলি ক্রমাগত উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবেছে। আঞ্চলিক ফিউডাল শাসকদেব শক্তি বৃদ্ধি পাওযায চার্চেব সঙ্গে প্রাযই ক্ষমতাব লডাই বাধছে। বোমেব একাধিপত্য লোপ পাবাব ফলে আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নতুন প্রেরণা লাভ কবেছে। কিছু কিছু নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব সহাযতায উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, সৃষ্টি হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীব। পত্তন হতে লাগল নতুন নতুন নগবেব।

চার্চ ব্যতীত ক্রুজেড বা ধর্মযুদ্ধ যুবোপেব সাংস্কৃতিক ও ভাবগত ঐক্য বিধানে সহাযতা কবেছে। যুবোপেব সকল অঞ্চলে ব লোকই মুসলমানদেব বিরুদ্ধেযু দ্ধ কবতে বেবিযেছে অন্তবেব প্রেবণায। দূব ভ্রমণ এবং বিদেশে মৃত্যুব মুখোমুখি জীবন যাপনেব সুযোগে পবস্পবেব মধ্যে ভাবেব আদান-প্রদান খুব সহজে সম্ভব হয়েছে। তাই রাজনৈতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যুবোপেব সাংস্কৃতিক জীবনেব পটভূমিকা সর্বত্রই মোটামুটি এক প্রকাব। য়ুরোপীয়

সাহিত্য সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। প্রধান ব্যতিক্রম আধুনিক রাশিয়ান সাহিত্য।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যে দুটি প্রধান ধারা দেখা যায়। একটি চার্চ ও খ্রীষ্ট ধর্ম কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের এই শাখার যোগাযোগ ছিল অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ। আর একটি ধারা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে লাগল আঞ্চলিক ভাষা ও জীবনকে কেন্দ্র করে। এতদিন য়ুরোপীয় সাহিত্যে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ছিল সাহিত্যের ভাষা। ক্লাসিকসের যুগ পার হবার পরও ঐ দুটি ভাষা ব্যবহার করবার ফলে সাহিত্য প্রাণহীন হয়ে পড়ল। ভাষার বাধা সাধারণ লোকের পক্ষে সাহিত্য উপভোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ পাঠকের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হতে লাগল গান, গাথা, নাটিকা ও কাহিনী। ক্রমশ ল্যাটিন ভাষার আধিপত্য আর রইল না। উপেক্ষিত আঞ্চলিক ভাষাগুলিই ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে মর্যাদা দিয়ে যুগোপযোগী নতুন সাহিত্য রচনার সূত্রপাতই মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় দান।

গির্জা শুধু ধর্মকেন্দ্র ছিল না, বিদ্যাচর্চারও ছিল পীঠস্থান। প্রাচীন বিদ্যার চর্চা হত সেখানে। আরব সভ্যতার তখন স্বর্ণযুগ। আরব সংস্কৃতির প্রভাব থেকে চার্চের বিদ্যানুশীলন মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের য়ুরোপের নিকট আরবই ছিল একমাত্র জানালা যার মধ্য দিয়ে বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। চার্চ-সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে আরবের প্রভাব সামান্যই পড়েছে। আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই চেনা যায়। বিশেষ করে আরব্য উপন্যাস ও ওমর খৈয়মের রুবাইতের আদর্শ অনেক লেখকের রচনা প্রভাবান্বিত করেছে।

চার্চ-সংশ্লিষ্ট রচনার পরিমাণ বৃহৎ কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করবার মতো বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ধর্ম, যীশুর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা, ইত্যাদি বিষয় নিয়েই অধিকাংশ পুঁথিপত্র রচিত হত। এসব রচনার আবেদন সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেণ্ট অগাষ্টিনের (৩৫৪-৪৩ খ্রী:) 'দি কনফেশানস্' কিংবা 'স্বীকারোক্তি'। লেখক এই গ্রন্থে অকপটে

নিজের জীবনের কাহিনী বলেছেন। প্রথম জীবনে অনেক পাপকার্য করে শেষে কি ভাবে তিনি সৎপথে এসেছিলেন তার দৃষ্টান্ত দিয়ে অগাস্টিন তাঁর পাঠকদের ধর্মপথে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের আন্তরিকতা, রচনাকৌশল ইত্যাদি গুণে 'কনফেশান্‌স' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য আত্মচরিত। ক্লাসিক্‌সের ব্যক্তিনিরপেক্ষতার ধারা এড়িয়ে অগাস্টিন হঠাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনী রচনা করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা। মধ্যযুগের শুরুতেই 'কনফেশান্‌স'-এ এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সেণ্ট অগাস্টিনের আর একটি বই 'দি সিটি অব গড'ও মধ্যযুগের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। 'আত্মচরিতে' ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যগুণ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। এখানে ধর্মই প্রধান। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতনের পর চার্চ বা 'সিটি অব গড' রোম সাম্রাজ্যের স্থান অধিকার করবে, এই স্বপ্ন তিনি য়ুরোপের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। বিশ্বাস, যুক্তি ও বিশ্লেষণের গুণে অগাস্টিন তদানীন্তন পাঠক-সমাজকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

সেণ্ট অগাস্টিনের পরেই নাম করতে হয় বোইথিউসের (Boethius—c. 475—525). তাঁর 'কনসোলেশান অব ফিলজফি' (Consolation of Philosophy) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্যাগান দর্শনই এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে এ বই সেতুর কাজ করেছে। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বোইথিউসের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় তিনি এই বই লিখেছেন, এবং মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চারশ বছর পরে চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেণ্ট হিসাবে গণ্য করেন। এই দুটি কারণে 'কনসোলেশান অব ফিলজফি' অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত একটি রোমান্স—Barlaam and Josaphat—মধ্যযুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। এক হিন্দু রাজকুমার জোসাফাতকে সন্ন্যাসী বারলাম কেমন করে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল এটি তারই কাহিনী। লোকমুখে প্রচলিত এই কাহিনী সেণ্ট জন অব দামাস্কাস অষ্টম শতকে লিপিবদ্ধ করেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি (১১৮২-১২২৬) এবং সেণ্ট টমাস অ্যাকুই-নাসের (১২২৫-১২৭৪) রচনাবলীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

আঞ্চলিক ফিউডাল শাসকদের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ল্যাটিন ভাষার জ্ঞান এঁদের অনেকেরই ছিল না। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষার সঙ্গে এঁরা পরিচিত ছিলেন। সুতরাং তাঁরা আঞ্চলিক ভাষার লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিরা এতদিন লোকের মুখে মুখে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল তাদের অক্ষরের কারাগারে বন্দী করবার জন্য উৎসাহ পেলেন। অর্ধ-সভ্য য়ুরোপীয় উপজাতিগুলির মধ্যে এরূপ কাহিনী, গাথা ও উপকথার অভাব ছিল না। মধ্যযুগের ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য এই জাতীয় রচনা দিয়েই শুরু হল। ল্যাটিন সাহিত্য ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করায় তা দূর হয়ে গেল। সাহিত্য এখন সাধারণ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হল। এর মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত হয়েছিল।

জনসাধারণের ভাষায় সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনা প্রথম পাওয়া যায় স্ক্যাণ্ডি-নাভিয়ান অঞ্চলে। এখানকার এডা ও সাগা মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ যে-সব গাথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তাদের লিপিবদ্ধ করা হয়। এডা সাধারণত পদ্যে রচিত। গদ্যে রচিত এডাও আছে। গদ্য এডা সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন Snorri Sturluson (১১৭৯-১২৪১)। এডা স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ার পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ধারণা প্রচলিত ছিল গদ্যে-পদ্যে লিখিত এডা তার একমাত্র দলিল।

ভাইকিং বীরদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী নিয়ে প্রথমে সাগা রচিত হত। ক্রমশ প্রাচীন রাজবংশ এবং অভিজাত পরিবারের ইতিহাসও সাগার বিষয়বস্তু হল। সাগার কাহিনীতে দুর্ধর্ষ বীরদের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। নারীর কোমল নমনীয় রূপ এখানে প্রায় অনুপস্থিত। নায়কের নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি এবং ভোগবিলাসের প্রতি আদিম আকর্ষণ সাগার জনপ্রিয়তা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক একই কাহিনী অবলম্বন করে সাগা রচনা করেছেন। বর্তমান কালের লেখক ও পাঠকের নিকটও সাগার আবেদন শেষ হয়ে যায়নি।

স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ার 'ভলসাঙ্গ' সাগা অবলম্বনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্মান

ভাষায় Nibelungenlied গাথা রচিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী সাগা প্রভৃতির তুলনায় এই কাহিনী অনেক বেশী সমৃদ্ধ। সুন্দরী রাজকন্যা ক্রিয়েমহিল্ড এবং রাজপুত্র সীগফ্রিডের গল্প য়ুরোপের সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল। ভাগনার এই সাগার একটি ঘটনা অবলম্বন করে অপেরা রচনা করেছিলেন।

আইসল্যাণ্ডকে সাগার জন্মভূমি বলা চলে। Najal Saga ও Heimskringla ওদেশের দুটি বিখ্যাত সাগা। নাজাল সাগা বাস্তবধর্মী এবং বেশ কৌতুকজনক। দ্বাদশ শতকে আইসল্যাণ্ডের এক বিচারক ন্যায় বিচারের দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিচারক নিজের ঝগড়াটে স্ত্রীকে কিছুতেই কলহ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। গল্পটি একালের পাঠকও পড়ে আনন্দ পাবেন।

শার্লিমানের ভাগ্নে Roland বা Orlando-র বীরত্বের কাহিনী নিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে কতকগুলি কাব্য রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে Chanson de Roland এবং Orlando Furioso-র নাম য়ুরোপীয় সাহিত্যের পাঠকের নিকট পরিচিত। নায়কের শৌর্য, জিঘাংসা, প্রেমোন্মাদনা, নেতার প্রতি আনুগত্য প্রভৃতির উপর কবিরা জোর দিয়েছেন। নায়ক মূলত এক হলেও বিভিন্ন কাব্যে কাহিনীর পার্থক্য আছে।

শার্লিমানকে কেন্দ্র করে য়ুরোপীয় সাহিত্যে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফরাসী সাহিত্যের এই রোলাঁ মহাকাব্য। যুদ্ধক্ষেত্রে রোলাঁ ফ্রান্সের সম্মান রক্ষার জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন তার মধ্যে আঞ্চলিক স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূবে সাধারণত রোম সাম্রাজ্য কিংবা চার্চের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেত।

স্প্যানিশ গাথা Poem of the Cid-এর মধ্যেও দেশাত্মবোধের লক্ষণ আছে। নায়ক রোদ্রিগো দিয়াজের নেতৃত্বে স্পেন মুর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কিরূপ সংগ্রাম করেছে তারই কাহিনী এই গাথায় পাওয়া যাবে। দিয়াজকে বলা হত Cid বা প্রভু। সিড মুসলমান শব্দ সৈয়দের অপভ্রংশ। দিয়াজ আসলে ছিল দস্যু। কখনো কখনো সে খ্রীষ্টানদের পক্ষে লড়াই করত। কিন্তু খ্রীষ্টানদের বাড়িঘর লুঠ করতে তার দ্বিধা ছিল না। সিডের মৃত্যুর (১০৯৯ খ্রীঃ অঃ) পর লোকে কুকীর্তিগুলি ভুলে তাকে জাতির আদর্শ বীর হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ল্যাটিন প্রভাবমুক্ত আঞ্চলিক সাহিত্যে দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স বিশেষরূপে সমৃদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে বিশ হাজার লাইনের রূপক কাব্য Le Roman de la Rose উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে Guillaume de Lorris আরম্ভ করেন, এবং সমাপ্ত করেন Jean de Meung. কবির সঙ্গে দেখা হল কুমারী আলস্যের, সে তাকে নিয়ে গেল প্রমোদ ভবনে। সেখানে কবির সঙ্গে দেখা হল গোলাপ বা প্রণয়িনীর। এর পরে বলা হয়েছে দয়িতাকে জয় করবার গল্প। জটিলতা সত্ত্বেও এই কাব্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

ফ্রান্সের আঞ্চলিক সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল প্রোভাঁসাল উপভাষায় রচিত গীতিকবিতা। এই সব কবিতা রচিত হত ফিউডাল শাসকদের রাজসভায় গাইবার জন্য। যাঁরা গান রচনা করতেন তাঁরা ত্রুবাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে চারশতের অধিক ত্রুবাদুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে। রোমান্টিক প্রেম এবং বীরত্বের কাহিনী অবলম্বন করে গানগুলি রচিত হত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য না থাকায় এই জাতীয় কবিতা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। তথাপি য়ুরোপীয় গীতিকবিতার অগ্রদূত হিসাবে ত্রুবাদুর কবিদের রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

মধ্যযুগের শেষভাগে ফরাসী সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন কবি Francois Villon (১৪৩১-?)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু কবি ও ঔপন্যাসিক ভিলোঁকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন। ফ্রান্সের বাহিরে অনেক ভাষায় তাঁর কাব্যের অনুবাদ হয়েছে এবং ভিক্টর হুগো, স্টিভেন্সন প্রভৃতি লেখকরা ভিলোঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবন উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। খুব দরিদ্রের ঘরে জন্ম হলেও ভিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবন যাপন করতেন। হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। পরে প্রাণদণ্ড মকুব করে দশ বছরের জন্য তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ফ্রান্সের বাহিরে চলে যাবার পর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সমৃদ্ধ কল্পনা, গভীর বেদনাবোধ, প্রকাশের সৌকর্য এবং সঙ্গীতধর্মিতা ভিলোঁর কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর জীবন ও কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বায়রনের কথা মনে পড়ে। "But where are the snows of

yester-year ?" প্রভৃতি বহু বিখ্যাত এবং প্রায়শ ব্যবহৃত বাক্য ভিলোঁর রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

সুইনবার্ন ভিলোঁ সম্বন্ধে যা বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য :

Prince of sweet songs made out of tears and fire,
A harlot was thy nurse, a God thy sire ;
Shame soiled thy song, and song assoiled thy shame
But from thy feet now death has washed the mire,
Love reads out first at head of all our quire,
Villon, our sad bad glad mad brother's name.

মধ্যযুগের ইটালিয়ান সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেছেন দান্তে, পেত্রার্ক ও বোক্কাচ্চো। দান্তে ও বোক্কাচো ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে ইটালিয়ান ভাষায় সাহিত্য রচনা করে একটি আঞ্চলিক ভাষাকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা অন্য কেউ পারেনি।

দান্তে আলিগিয়ারির (১২৬৫-১৩২১) বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি' পরলোকে কাল্পনিক ভ্রমণের বিবরণ। এই কাব্য ইনফার্নো, পারগাটোরিও এবং প্যারাডিসো—এই তিন অংশে বিভক্ত। তৃতীয় বা স্বর্গ পর্বে দেখা হল প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক তাঁর মানসী বিয়াত্রিচের সঙ্গে। ডিভাইন কমেডি মধ্যযুগের দর্পণ স্বরূপ। সে যুগের লোকের চিন্তা, আশা ও কল্পনা রূপ পেয়েছে এই কাব্যের মধ্যে। গ্রীক ও রোমান ক্লাসিকসের চিন্তাধারাও 'ডিভাইন কমেডিতে' প্রতিফলিত হয়েছে।

'ডিভাইন কমেডি' অবহেলিত আঞ্চলিক ভাষার শক্তি প্রমাণিত করেছে। এমন সুন্দর কাব্য ইটালিয়ান ভাষায় রচনা করা সম্ভব দেখে লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি পড়ল অবজ্ঞাত আঞ্চলিক ভাষার উপর। আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধা জাগ্রত করা দান্তের অন্যতম কীর্তি।

বোক্কাচ্চোর (১৩১৩-১৩৭৫) খ্যাতি নির্ভর করে 'ডিকামেরনের' উপর। তাঁর ইলিয়াড ও ওডিসির অনুবাদ এবং অন্যান্য রচনার কথা কেউ আর উল্লেখ করে না। ডিকামেরনে বোক্কাচ্চোর রচিত ১০০টি গল্প আছে। গল্পগুলি ইটালিয়ান ভাষায় লেখা। ইটালিয়ান গদ্যের সর্বপ্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। চসার এবং অন্যান্য বহু লেখক ডিকামেরন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্য

রচনা করেছেন। আধুনিক ছোট গল্প রচনার অগ্রদূত হিসাবে বোক্কাচ্চো চিরদিনই আমাদের শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

বোক্কাচ্চোর বন্ধু ফ্রান্সেসকো পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) রোমান ক্লাসিকসের চর্চা শুরু করেছিলেন নতুন করে। পুরানো সাহিত্য ও দর্শন আলোচনায় তিনিই অগ্রণী। ল্যাটিন ভাষায় তিনি অনেক সনেট ও গান রচনা করেছেন। রোমাণ্টিক প্রেমের অনুভূতি তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এত বেশী যে তাঁকে রেনেসাঁসের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে।

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের দু'টি কাব্য ইংরেজী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে Beowulf কে ফোক-এপিক বলা হয়ে থাকে। বেওউলফের যে সর্বপ্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি এখন পাওয়া যায় তার বয়স প্রায় হাজার বছর। কিন্তু লিখিতরূপ লাভের অনেক আগে থেকেই এই কাব্য লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ইংলণ্ডে আসবার পূর্বেই রচিত হওয়া সম্ভব। কাহিনীর পটভূমিকা ডেনমার্ক অথবা সুইডেন। প্রতি রাত্রে রাজা হ্রথ্‌গারের প্রাসাদ আক্রমণ করে ভীতির সঞ্চার করত গ্রেণ্ডেল। বেওউলফ এগিয়ে এল গ্রেণ্ডেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এই কাব্য সেই দীর্ঘ সংগ্রাম ও বেওউলফের বীরত্বের কাহিনী।

আর একটি অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্য Widsith বা দূর-যাত্রী। এটি প্রাচীনতম ইংরেজী কবিতার নিদর্শন। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। এক চারণ কবির ভ্রমণ কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে রাজা আর্থার এবং তাঁর গোলটেবিলের কল্পনামূলক কাহিনী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজা আর্থার বহু কাব্যকাহিনীর নায়ক। আর্থারের সহচর এবং বন্ধুরাও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। আর্থার নাকি ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে ব্রিটেনের রাজা ছিলেন এবং তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে তাঁকে আদর্শ নাইট (Knight) ও আদর্শ বীর হিসাবে দেখতে পাই।

রাজা আর্থারকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় স্যার টমাস ম্যালরির (১৪৩০ ?—১৪৭১) Le Morte d' Arthur যদিও

এ বইটি মধ্যযুগের নির্দিষ্ট তারিখের পরে প্রকাশিত হয়েছে তথাপি সেকালের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। জিওফ্রে অব মনমাউথের (১১০০ ?—১১৫৪) Historia Regum Britanniae আর্থার কাহিনীর আকর হিসাবে পরবর্তী লেখকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্থার কাহিনী কেন্দ্র করে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে কাব্যগুণে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ Sir Gawain and the Green Knight. আনুমানিক ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। লেখকের নাম অজ্ঞাত। আর্থারের ভ্রাতুষ্পুত্র স্যার গাওয়ানের বীরত্বের কাহিনী এই রূপক কাব্যে বলা হয়েছে। আদর্শ নাইটের জীবন ও চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত তা দেখানোই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।

জিওফ্রে চসার (১৩৪০ ?—১৪০০) শুধু যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক তাই নয়। তার রচনার মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাতও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চসার কর্মজীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন; য়ুরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে হয়েছে তাঁকে; ফরাসী ও ইটালিয়ান সাহিত্যের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। সুতরাং চসারের রচনায় ভূয়োদর্শিতার ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাই। তাঁর 'ক্যান্টারবারি টেলস'-এ তীর্থযাত্রীদের যে সুন্দর চরিত্রচিত্রণ আছে তা থেকে চসারের মানব-চরিত্র সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ক্যান্টারবারি টেলস'-এর গল্পে বাস্তবঘনিষ্ঠ কবিমানসের ছাপ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। লণ্ডন অঞ্চলের যে উপভাষা চসার ব্যবহার করেছেন তাকে ভিত্তি করেই আধুনিক ইংরেজী ভাষা গড়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য The Vision of Piers Plowman. ব্যঙ্গাত্মক অংশ সমন্বিত এই রূপক কাব্যটি ১৩৬২ থেকে ১৩৯৯ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। এতদিন যাবৎ উইলিয়াম ল্যাংল্যাণ্ডকে 'পিয়ার্স প্লাউম্যানের' লেখক হিসাবে মেনে নেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে কাব্যটি একাধিক কবির রচনা। কবি একদিন পাহাড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নানা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ঘুমের মধ্যে। সকল স্বপ্নদৃশ্যের কেন্দ্র পিয়ার্স,—এক দরিদ্র ইংরেজ শ্রমিক। কাব্যের শেষভাগে পিয়ার্সকেই যীশুখ্রীষ্ট হিসাবে দেখতে পাই। কাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, কবি তদানীন্তন সামাজিক অত্যাচার অবিচারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মধ্যযুগের প্রধান প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ আমরা করেছি। এদের সাহিত্যমূল্য আলোচনা করলে সে যুগের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যেতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যে সেতু রচনা করেছে মধ্যযুগ। তাই প্রাচীন ও বর্তমান কালের চিন্তা-ভাবনা মধ্যযুগে আমরা পাশাপাশি দেখতে পাই। প্রথমার্ধের সাহিত্যে ক্লাসিক্‌স্‌ এবং ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গাথাকাহিনী ও সঙ্গীত প্রভৃতি তখন পর্যন্ত লোকে মুখে মুখে আবৃত্তি করত, তাদের লিপিবদ্ধ করবার মতো মর্যাদা আঞ্চলিক ভাষা তখনো পায়নি। আর এই জন্যই আঞ্চলিক ভাষার কবিদের নাম ১৩০০ সাল পর্যন্ত জানা যায় না। ঐ সময় পর্যন্ত রচিত আঞ্চলিক ভাষার পুঁথিপত্রের লেখকদের নাম আমাদের জানবার উপায় নেই।

জীবনে ও সাহিত্যে ধর্মের প্রাধান্য মধ্যযুগের আর একটি লক্ষণ। রোম সাম্রাজ্য পতনের পর চার্চ সেই স্থান অধিকার করতে তৎপর হয়ে উঠল। বারবার মুসলমানদের আক্রমণের ফলে সাধারণ লোক দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য নির্ভর করল চার্চের উপর। মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মের প্রাধান্য নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে একটি হল রূপকের প্রাচুর্য। যে সংসারে বাস করছি আসলে তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। দৃশ্যাতীত এক মহত্তর লোকের প্রতিফলন আমাদের এই সংসার। তেমনি কবি তাঁর বক্তব্য সরাসরি না বলে রূপকের মাধ্যমে ইঙ্গিতময় করে তোলেন। নাটকেও তাই Mystery ও Miracle-এর প্রাধান্য ছিল। ধর্মের প্রভাবেই স্বর্গ ও নরকের ছবি মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। রোম সাম্রাজ্য পতনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ফিউডাল লর্ডদের আবির্ভাব হল। এদের কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য নতুন মর্যাদা লাভ করল এবং আঞ্চলিক স্বদেশপ্রীতির সূত্রপাতও পাওয়া যাবে ফিউডাল লর্ডদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যে। যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। তাই নাইট ও বন্দিনী রাজকন্যার কাহিনী প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, আঞ্চলিক স্বদেশপ্রীতি এবং সাহিত্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান লাভ একালের য়ুরোপীয় সাহিত্যগুলি বিকাশের সূত্রপাত করেছে। সেণ্ট অগাস্টিনের 'কনফেশান্‌স'-এ আধুনিক সাহিত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার শুরু দেখা যায়। বোক্কাচ্চোর 'ডিকামেরন'কে

ছোট গল্পের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। আধুনিক গীতিকবিতারও সূত্রপাত হয়েছে মধ্যযুগের প্রোভাঁশাল কবিদের রচনায়। ফিউডাল রাজসভার প্রাধান্য থাকলেও মধ্যযুগেই আমরা সাধারণ নরনারীকে সাহিত্যের আসরে দেখতে পাই। সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের বাস্তবধর্মী চিত্র এঁকেছেন চসার। 'ক্যাণ্টারবারি টেলস'-এ সাধারণ লোকের আনন্দমুখর জীবনের ছবি আছে। 'পিয়ার্স প্লাউম্যান'-এ নীচুতলার লোকের দুঃখময় জীবনের কথা পাই। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত রূপককাব্য 'রেনার্ড দি ফক্স'-এ ফিউডাল শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। এই কাব্য য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। রবিন হুডের কাহিনী গণতান্ত্রিক আদর্শে পূর্ণ। অত্যাচারিত দুঃখী ও দরিদ্র লোকদের জন্য রবিন হুডের গভীর দরদ এখনও মন স্পর্শ করে। সুতরাং য়ুরোপের মধ্যযুগ বন্ধ্যা ছিল, এমন অভিযোগ যুক্তিসহ নয়।

আলবেয়ার কামু

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসকে কামু দুদিক থেকে চিহ্নিত করে গেলেন। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন অত্যন্ত কম বয়সে ; আর, এত কম বয়সে মনে হয় কোনো নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের মৃত্যু হয়নি। সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৬০) মোটর দুর্ঘটনায় কামু পরলোকগমন করেছেন। ৬ই নভেম্বর তাঁর ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর আলজিরিয়ার অন্তর্গত মোন্‌দোভিতে আলবেয়ার কামু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভূমিহীন কৃষিমজুর। খুব কষ্টের সংসার। তবু চলছিল একরকম। কিন্তু কামুর বয়স এক বছর পূর্ণ না হতেই বাবার মৃত্যু হয় প্রথম মহাযুদ্ধে। সুতরাং জন্মের কিছুদিন পর থেকেই কামুর জীবনের কঠোর দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে। নির্মম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৯৩৬ সালে কামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র।

সাংস্কৃতিক জীবনে কামুর প্রথম প্রবেশ অ্যালজিয়ার্স শহরে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনকারী হিসাবে। বহু খ্যাতনামা লেখকের নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন এবং নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে কামু আলজিরিয়ায় এবং ফ্রান্সে সংবাদপত্রের আপিসে চাকরি করেছেন। জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের পতনের পর কামু আলজিরিয়ায় এসে স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। স্কুলের শান্ত পরিবেশে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। ১৯৪২ সালে কামু প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ আন্দোলন সফল করবার জন্য তিনি দিবারাত্র কাজ করেছেন।

১৯৫৭ সালে কামুকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় : 'for his important literary work which illuminates with penetrating pur posiveness, the problems of the human conscience in the contemporary world.'

ঐ বছর নোবেল কমিটি আঁদ্রে, মালরো, সাঁ-জ' পের্স এবং নিকোস কাজাণ্টজাকিসের দাবিও বিচার করেছিলেন। পুরস্কারের খবর পেয়ে কামু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'Had I been a judge, I would have voted for Andre Malraux.'

এই উক্তি থেকে কামুর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা বলতে হয় যে, কামু মালরোর ভক্ত, সাহিত্য সাধনায় তাঁর নিকট ঋণ স্বীকার করতে কামু কখনো কুণ্ঠিত হননি।

১৯৩৭ সালে কামুর প্রথম প্রবন্ধপুস্তক বের হয়। মাত্র একশ কপি ছাপা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী বই Noces প্রকাশিত হয় দু বছর পরে। এ-বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে তরুণ মনের রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও এখানেই প্রথম লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালে বের হল 'দি আউট-সাইডার' বা 'দি স্ট্রেঞ্জার'। এই উপন্যাস য়ুরোপ আমেরিকায় অল্পদিনের মধ্যে আশ্চর্য সমাদর লাভ করে। মানুষ এই পৃথিবীতে আগন্তুকের মতো কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসে। সংসারের অন্ধ নির্মম নিয়মের সঙ্গে মানুষের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মিলন নেই। তাই তাকে সারাজীবন নিষ্ফল সংগ্রাম করে যেতে হয়। য়ুরোপের সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মনের প্রতিফলন পাওয়া যাবে এই কাহিনীতে। ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয় 'দি মিথ অব সিসিফাস।' 'দি আউটসাইডারে' যা বলেছেন, প্রবন্ধ-পুস্তক 'দি মিথ অব সিসিফাসে' সেই তত্ত্বকেই আরও বিশদরূপে আলোচনা করা হয়েছে। করিন্থের রাজা সিসিফাসকে দেবতার অভিশাপে বিরাট এক প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুদূর তোলবার পর পাথর গড়িয়ে নীচে নামে, আবার সিসিফাস পেছনে পেছনে ছুটে এসে ঠেলতে আরম্ভ করে। অবিশ্রাম এই অসম্ভব চেষ্টা চলছে। মানুষের ভাগ্যও তেমনি। জন্মের পরে দেখতে পায় সে 'অ্যাবসার্ডের' প্রাচীরে বন্দী। সারাজীবন তাকে অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয়।

দু বছর পরে 'ক্রস পারপাসেস' এবং 'ক্যালিগুলা' নামে দুটি নাটক বের হল। প্রথমটিতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত প্রবাসী নায়ককে চিনতে না পেরে মা ও বোন কি করে তাকে হত্যা করল, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী বলা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রতীকী নাটক। যথার্থ পরিচয় না পেয়ে আত্মীয়-বন্ধুদেরও

আমরা কেমন করে নির্যাতন করি, মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা দেই—এই নাটকে কামু তা বোঝাতে চেয়েছেন। 'ক্যালিগুলা' এক তরুণ রোমান সম্রাটের কাহিনী উপলক্ষ্য করে রাজার হাতে ন্যস্ত চরম ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণের সার্থক প্রচেষ্টা।

১৯৪৭ সালে পাওয়া গেল আর একটি উপন্যাস—'দি প্লেগ'। আলজিরিয়ার ওরাঁ বন্দর প্লেগের মড়কে আক্রান্ত হয়েছে। ডাঃ বেরনার রিয়োর নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক মড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহর রোগমুক্ত করল। এটিও প্রতীকধর্মী উপন্যাস। ডিক্টেটরের শাসন প্লেগের মতো ভয়াবহ। লেখক ও পাঠকের মনে ছিল হিটলারের কথা। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে এই ভয়াবহ অবস্থাকেও ঠেকানো যেতে পারে।

পরবর্তী প্রবন্ধপুস্তক 'দি রিবেল (১৯৫১)'-এ কামু য়ুরোপে বিগত দুশ বছরে যত রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করে বর্তমানে বাঁচবার পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

কামু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'দি ফল (১৯৫৬)'-এ নতুন পথ ধরেছেন। এতদিন তিনি বাহিরের বাধা এবং অন্ধ অদৃশ্যশক্তির বিরুদ্ধাচরণের জন্যই মানুষের আদর্শের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু 'দি ফল'-এর নায়ক জাঁ-ব্যাপ্টিস্ত ক্লামেন্স উপলব্ধি করেছে তার পতনের জন্য সে নিজেই দায়ী।

ইংরেজী অনুবাদে কামুর সবশেষ বই Exile and the Kingdom (১৯৫৭)। একটি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি স্বাতন্ত্র্য এবং একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে বিবেকের যাতনাই এই ঐক্যসূত্র। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প 'ব্যভিচারিণী'।

কামুর অনেকগুলি বই এখনো ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল না। তিনি কোয়েসলারের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রাণদণ্ড রহিত করবার পক্ষে একটি বই লিখেছেন। এটি বোধ হয় তাঁর শেষ রচনা।

সাহিত্য-রসিকের নিকট কামুর অকাল মৃত্যু বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তাঁর রচনা এখনো পরিণতি লাভ করেনি। 'আউটসাইডার' থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বইয়ে তিনি নতুন পথে চলেছেন। কামুর রচনার আঙ্গিক ও মানসিকতার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়। 'আউটসাইডারের'

নায়ক মারসো নিঃসঙ্গ, পৃথিবীতে সে নিজেকে আগন্তুক মনে করে। কিন্তু 'দি প্লেগের' ডাঃ রিয়োর জীবনে তেমন নিঃসঙ্গতা নেই। রিয়ো অনেকের সঙ্গে মিলিতভাবে জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনায় সমসাময়িক ঘটনা ও চিন্তাধারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই প্রথম পর্বে জীবনে সাফল্যলাভের অন্তরায় হিসাবে বাইরের ঘটনাকেই বড করে দেখিয়েছেন কামু। আর এই পর্বে আমরা তাঁর লেখায় মেলভিল, হেমিংওয়ে, জিদ, মালরো এবং প্রাচীন গ্রীক লেখকদের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। 'দি ফল'-এই কামুর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। তাঁর নায়ককে এখানে শুধুই পরিবেশের ক্রীডনক হিসাবে পাই না, পাই মানুষ হিসাবে। নায়কের মানসিকতা তাই পরিবেশের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। কামুর রচনাবলী পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, কীর্তির চেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাই ছিল মহত্তর।

কামু নিজেও একথা উপলব্ধি করেছিলেন। উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করে তিনি তাঁর তিনটি কাহিনীর একটিকেও প্রকৃত উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেননি। তাঁর মতে 'আউটসাইডার' ও 'দি ফল' শুধু recit বা ধারাবিবরণী; 'দি প্লেগ' হল chronique বা রিপোর্ট। এগুলিকে মহৎ উপন্যাস রচনার খসডা বলা যেতে পারে। কামু 'দি ফার্স্ট ম্যান' নামে একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। নায়কের জন্ম থেকে বড হওয়া পর্যন্ত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এতে থাকবে, এই ছিল তার পরিকল্পনা। এই উপন্যাস তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

কামু জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর কথা বেশী বলেছেন, তিনি জীবনবিলাসী নন, মৃত্যুবিলাসী—এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ যথার্থ নয়। মৃত্যুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তিনি জীবনকে আরো নিবিডভাবে আঁকডে ধরেছেন। মৃত্যু এবং দারিদ্র্যের ছায়া কামুর জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশ বছর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শিশুকালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর ডাক্তার বলল, তাঁর যক্ষা হয়েছে— ক'বছর চলেছে জীবন-মৃত্যুর টানাপড়েন। তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হয়েছে কয়েক বছর। মৃত্যু ছাডা আছে অন্ধ নিয়তির পীড়ন। যা অসম্ভব ও

অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর নিষ্ফল সংগ্রাম করতে হয়। কামু তাঁর প্রধান প্রধান রচনাগুলিতে মানুষের বন্দীদশার কথা বলেছেন। মানুষের আত্মা দেহের মধ্যে বন্দী ; মানুষ নিজে বন্দী সমাজের যুক্তিহীন অন্যায় রীতি-নীতির মধ্যে। 'আউটসাইডারের' নায়ক সমাজের নিয়মে খুনের দায়ে বন্দী, ওঁরা শহরের অধিবাসীরা বন্দী প্লেগের প্রকোপে, 'দি ফল'-এর নায়ক বিবেক-যন্ত্রণার শৃঙ্খলে বন্দী। মানুষের এই ভাগ্য উপলব্ধি করেও কামু জীবনবিদ্বেষী হননি। তিনি বলেছেন: "In the midst of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer."

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ তিনি জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যার কথা বাতিল করে দিয়েছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা সত্ত্বেও বাঁচতে হবে ; অবিশ্রাম সংগ্রাম করতে হবে জীবনের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করে প্রত্যক্ষ কোন ফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা সকলে রুখে দাঁড়ালে জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলি প্রবল হতে পারবে না। তাই কামু বলেন, ফলের আশা না করে লড়াই করে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের নিষ্কাম কর্মবাদের কথা মনে পড়ে।

অন্য কোন আশা যখন নেই, তখন বেঁচে থাকার অনুভূতিটাই সবচেয়ে বড় কথা। তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচা নয়, অ্যাবসাডের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। বর্তমানে ধর্ম, প্রেম, সত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের চিরাগত আদর্শবাদের ব্যর্থতা দেখছি। এই পরিবেশে কামু এবং অস্তিত্ববাদীদের জীবন-দর্শনই মানুষকে চরম হতাশা থেকে রক্ষা করতে পাবে। কামু অস্তিত্ববাদী কিনা সেই তর্ক না তুলেও বলা যেতে পারে তাঁর ভাবধারা অস্তিত্ববাদের সগোত্র। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বহু উন্নত হয়েও যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হল—এই একান্ত অযৌক্তিক কারণসঞ্জাত অভিমান থেকেই ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের প্রসার ঘটেছে।

কামু যে মৃত্যুবিলাসী নন তার আর একটি প্রমাণ তাঁর বিদ্রোহের সমর্থন। 'দি রিবেল' গ্রন্থে কামু বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রতি যাদের গভীর আসক্তি তারাই বিদ্রোহ করে। আদর্শ জীবনকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন। শিল্পী, লেখক ও দার্শনিকের বিদ্রোহ স্বার্থকলঙ্কিত নয়। তাঁদের বিদ্রোহ ভাবগত ও

আদর্শগত, তাই বিশুদ্ধ। কামু বলেন: The greatest style in art is expression of most passionate rebellion. সুতরাং "We have art in order not to die from truth."

শিল্পের বিদ্রোহ মৃত্যু, বিস্মৃতি ও অসত্যের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী লেখক হিসাবে কামু তাই মৃত্যুবিলাসী হতে পারেন না। মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি উদাসীন; কিন্তু সুষ্ঠু জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের শেষ নেই। 'ক্যালিগুলায়' তিনি বলেছেন:

"To lose one's life is a little thing. But to see the sense of this life dissipated, to see our reason for existence disappear: that is what is insupportable."

জীবন এবং শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা:

"The end of art, the end of each life, can only be to add to the sum of freedom and responsibility, that is in every heart and in the world."

কামু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানুষ হিসাবে সংগ্রামের মধ্যেই আমাদের কর্তব্যের শেষ। ফলের আশা নেই দেখে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনুচিত। কর্মই মানুষের ধর্ম।

কামুর কর্মবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে গভীর মানব-প্রীতি। শুধু প্রতীক ও আদর্শের জগতে তিনি বিচরণ করেননি। মানবিকতাবোধ তাঁর আদর্শবাদকে স্নিগ্ধ করেছে। এই জন্যই কামু কম লিখেও অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন। সার্ত্রের প্রতিভাশালী লেখক হয়েও আশানুরূপ জনপ্রিয় হতে পারেননি; কারণ তাঁর রচনায় মানব-প্রীতির তেমন সহজ প্রকাশ নেই। তাঁর মঙ্গল-কামনা প্রধানত তত্ত্বের জগতে আবদ্ধ; তা দরদের রূপ নিয়ে মানুষের অন্তর স্পর্শ করে কদাচিৎ।

পৃথিবীতে 'অ্যাবসার্ডের' পীড়নের কথা কামুর মতো এত জোর দিয়ে আর কেউ সম্প্রতি বলেননি। তথাপি নিরাশাবাদী নন তিনি। ১৯৪৫ সালে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "…we refuse to despair of mankind. Without having the unreasonable ambition to save men, we still want to serve them."

মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা হয়ত দুরাশা, কিন্তু মানুষের সেবা করবার অধিকার তো সকলেরই আছে।

কামুর মানবিকতাবোধ ধর্মনিরপেক্ষ। 'দি প্লেগ'-এ ডাঃ রিয়ো এবং তারোর আলোচনা থেকে এর আভাস পাওয়া যাবে। তারো বলছেন: "How to be a saint without God : that is the only concrete problem I understand today."

টমাস মানের শিল্পাদর্শ

আদিম সমাজে শিল্পীর কোন পৃথক সত্তা ছিল না। শিল্পী ছিল দেবতার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ছবি আঁকায় তুলির এবং কাব্য রচনায় কলমের যতটুকু কৃতিত্ব, শিল্পীর কৃতিত্ব তার বেশী নয়। শিল্পী কখনো উপলব্ধি করবার সুযোগ পায়নি যে, সে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী,—সৃষ্টির প্রতিভা রয়েছে তার মধ্যে। কেন না, সমাজ এই সৃষ্টির প্রতিভাকে মর্যাদা দেয়নি। শিল্পসৃষ্টির কারণ নির্দেশ করা হত দেবতার লীলা বলে।

মানুষ যখন শিল্প-সচেতন হল, এবং সমাজের নিরেট বন্ধনের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে পৃথক ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, তখন থেকেই শিল্পীর বিশেষ মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি। অবশ্য শিল্পপ্রতিভা যে দৈবানুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, সমাজে এ বিশ্বাস তখনও দৃঢ় ছিল। তবু এই বিশ্বাসের পশ্চাতে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনটা লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে শিল্পীর নিষ্ক্রিয়তা এবং দৈবানুগ্রহের সক্রিয়তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে পরবর্তী কালে। দৈবানুগ্রহকে প্রাধান্য দিলেও শিল্পীর স্বকীয় প্রতিভাকে একেবারে অস্বীকার করা হয়নি। শিল্পীর নিজস্ব কোন গুণ না থাকলে সে দৈবানুগ্রহ লাভ করবে কেন? সবাই তো ছবি আঁকতে, গান করতে, অথবা কাব্য রচনা করতে পারে না! সুতরাং এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য শিল্পী সমাজের কাছ থেকে মর্যাদা লাভ করেছে।

এর সঙ্গে দৈবানুগ্রহের ধারণাটা জড়িত বলে শিল্পীর স্থান সমাজে বেশ উঁচু ছিল। শিল্পী সাধারণ লোক নয়, সুতরাং তার জীবনও সমাজের আর পাঁচজনের মত সাধারণ হতে পারে না। সকলের পক্ষে যে-সব রীতিনীতি অবশ্য পালনীয়, শিল্পী তাদের না মেনে চললেও সাধারণত সমাজ কোন শাস্তির ব্যবস্থা করত না। শিল্পীর মর্যাদা যে কত বড় ছিল এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন কার্যত সমাজই ছিল সরকার। আর সেই প্রতাপান্বিত সমাজের রীতিনীতির প্রতি শৈথিল্য দেখিয়েও সসম্মানে বাস করতে পারা কম কথা নয়।

শিল্পী এই সামাজিক সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। প্রচলিত জীবন ধারা থেকে একটু দূরে সরে নিজের খুশি অনুসারে সে গড়ে তুলেছে আপন জগৎ।

জীবনকে দেখবার জন্যই জীবন থেকে একটু দূরে যাবার প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু এর ফলে ক্রমশ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেহিসাবী খেয়ালিপনা শিল্পীর অবিচ্ছেদ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কবির জন্য স্থান নির্দেশ করেননি। কবির উচ্ছৃঙ্খলতা সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রের জীবনধারাকে ব্যাহত করবে, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাবার আশঙ্কা দেখা দিল। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এনেছে শিল্পবিপ্লব, যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ; বিপুল পরিমাণ পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার অধিকার করতে বণিকের দল হন্যে হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশে সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মের প্রভাব কমে গেল। অর্থলোলুপ সমাজে তাদেরই প্রাধান্য হল, যারা পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করতে সক্ষম। সমাজে সমাদর লাভ করল বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ ও ব্যবসায়ী, শিল্পীকে আপাতত ভুললেও ক্ষতি নেই।

অর্থ ছাড়া আর একটি বিষয় সমাজের মন আচ্ছন্ন করল। তা হল রাজনীতি। এতদিন রাজনীতি প্রধানতঃ রাজসভার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ফরাসী বিপ্লব জনসাধারণকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভাবতে শেখাল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হল জনচিত্ত। বিজ্ঞানের যুগে দৈবানুগ্রহের ধারণা গেল দূর হয়ে, গণতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার। সমাজের কাছ থেকে শিল্পী যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের যুগে তা আর রইল না। রাষ্ট্রে ও সমাজে সকল মানুষেরই সমান অধিকার। কেউ বিশেষ অধিকার লাভ করলে তা গণতন্ত্রের প্রতিপন্থী হবে।

শিল্পী এতদিন জীবনের আবর্ত থেকে একটু দূরে সরে থাকলেও সমাজে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। আর এই প্রতিষ্ঠা ছিল বলেই দূরে থাকাটা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগে বিশেষ সুবিধা দূর হয়ে যাবার ফলে শিল্পীকে এসে দাঁড়াতে হল দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলের মধ্যে। এ জীবনে অর্থের প্রাধান্য এবং জীবনের স্থূল দিকটার প্রতি আকর্ষণ প্রবল। নতুন শিল্প-সভ্যতার গ্লানি ধীরে ধীরে সর্বব্যাপী হতে আরম্ভ করেছে। এই পরিবেশে সাহিত্য ও ললিতকলার রসোপলব্ধি সম্ভব নয়, এবং এই পরিবেশ শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিরও অনুকূল নয়। যে জীবনে শিল্পের স্থান নেই সেখানে শিল্পীর মৃত্যু। সুতরাং

শিল্পী ব্যগ্র হয়ে উঠল যন্ত্রযুগের স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে চলে যাবার জন্য। ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত হয়েছিল তবু এদের প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল পরবর্তী শতাব্দীতে।

জীবনকে এড়াবার দুটি পথ। এক, সমাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া। দ্বিতীয় উপায়, স্বাভাবিক জীবন ত্যাগ করে বিকৃত জীবন গ্রহণ করা। কিন্তু সমাজকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়া যায় না। কারণ, শিল্পী আগে মানুষ, পরে শিল্পী। বেঁচে থাকবার জন্য সমাজের সহায়তা চাই। শিল্পী দৈবানুগ্রহের অধিকারী—এই পুরনো বিশ্বাস বজায় থাকলে সমাজকে উপেক্ষা করেও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল। যেমন, জীবনের দুঃখ ভুলবার জন্য কেউ কেউ মাতাল হয়। জীবনকে বিকৃত করতে পারে নানাবিধ রোগ এবং অস্বাভাবিক কামনা। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এই রুগ্ন বিকৃত জীবন গ্রহণ করে স্বাভাবিক জীবনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। অবক্ষয় যুগের বৈশিষ্ট্যই হল প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের বিরোধ। শিল্প মানুষের সৃষ্টি, প্রকৃতির নয়। সুতরাং শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির এবং স্বাভাবিক জীবনের যে বিরোধ থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি।

অবক্ষয়ের পরিচয় শুধু যে শিল্পকর্মের মধ্যেই নিবদ্ধ তা নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনেও অবক্ষয়ের আদর্শ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ক্লাইস্ট, শীলার, নোভালিস, কীটস্, বায়রন, শেলী পুশকিন, লিয়ারমনটফ শোপেনহাউয়ার, নীট্‌শে, বোদ্‌লেয়ার, মালার্মে, র‍্যাঁবো, ফ্লোবেয়ার, ওয়াইলড, টলস্টয়, ডস্টয়েভ্‌স্কি, গগোল, মোপাসাঁ, ভ্যান গগ, গগাঁ প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জীবন স্বাভাবিক ছিল না। কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ প্রেমের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে প্রাণ দিয়েছেন, কারও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, কেউ বা দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ খ্যাতিমান শিল্পী ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে এক-একটি দৃষ্টান্ত। বিগত শতাব্দীর শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে একে এক বিস্ময়কর লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমাজে মর্যাদা হ্রাসের ক্ষোভ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাণহীন যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, শিল্পীদের স্বাভাবিক জীবনের পথ ত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছে। তাছাড়া রোমান্টিসিজমের দুঃখবিলাসও জীবনের উজ্জ্বল দিকটার প্রতি এঁদের বিরূপ করেছিল।

উপরে আমরা বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথা বলেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই শিল্পীর জীবনদর্শনের মধ্যে বৃহৎ পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজে মর্যাদা হ্রাসের ক্ষোভ সে ভুলতে পেরেছে, স্বীকার করে নিয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের জীবন। সুতরাং জীবনকে এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন আর ওঠে না। একজন নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের ও জীবনের সমস্যা তাকেও স্পর্শ করে, এবং এর প্রভাব পড়ে তার শিল্প-সাধনায়।

দুই শতাব্দীর এই দুই আদর্শের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন টমাস মান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মানের জন্ম, এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বুডেনব্রুক্স' প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও মান কালবিচারে বিংশ শতাব্দীর লেখক, তথাপি তাঁর প্রথমার্ধের রচনা উনবিংশ শতাব্দীর লক্ষণাক্রান্ত। শেষার্ধ যে এই লক্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছে তা নয়। কিন্তু মান-এর জীবনবিমুখ সাহিত্যমানস শেষের দিকে বহুলাংশে জীবন-সচেতন হয়ে উঠেছে।

মানের ব্যক্তিগত জীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অধিকাংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মতো সমাজবিরোধী ছিল না। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু এবং কিছুকাল অসুস্থ থাকা ব্যতীত তাঁর এমন কোন কঠিন রোগ কিংবা চারিত্রিক বিকৃতি ছিল না যা তাঁকে স্বাভাবিক জীবনের প্রতি বিমুখ করে তুলতে পারে। বরং তিনি অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এত লাভ করেছিলেন যা কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। প্রথম জীবনেও ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার পথে তিনি বড় রকমের কোন বাধা পাননি। সুতরাং হাতের মুঠোয় যে জীবনকে পাওয়া যায়, সেই নিকট ও সহজ জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ভাবজীবনে তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান রোমান্টিক ও ডিকাডেন্ট গোষ্ঠীর মানসপুত্র। নীট্‌শে, শোপেনহাউয়ার, ভাগনার, নোভালিস প্রভৃতির প্রভাব থেকে মানের মন কখনো মুক্ত হতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর জীবন মান দেখতে আরম্ভ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর চোখ দিয়ে।

মানের সমগ্র রচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিনি জীবনের একটি সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে সমস্যাটি শিল্পীর সঙ্গে সমাজের বিরোধ। শিল্পী যেমন বস্তুবাদী সমাজের পরিবেশকে শিল্পসৃষ্টির পরিপন্থী মনে করে, সমাজও তেমনি শিল্পীকে বিকৃতমনা, উচ্ছৃঙ্খল এবং সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের

অনুপযুক্ত বলে ভাবে। সমাজের উপেক্ষা শিল্পীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে মান তা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। শিল্পী ও সমাজের মধ্যে এই বিরোধের ফলে যে সমস্যা দেখা দেয় মান তার সমাধান অনেক ক্ষেত্রে করেছেন মৃত্যুর সাহায্যে। শিল্পী শুধু যে মৃত্যুর মধ্যে বিরোধ থেকে মুক্তি পায় তাই নয়, মৃত্যু এক বৃহত্তর জীবনেরও ইঙ্গিত দেয়। মানের রচনায় মৃত্যুর বড আধিক্য, যেখানে মৃত্যু অনুপস্থিত সেখানেও মৃত্যু কিংবা রোগের কালো ছায়া পড়ে। মানের সাহিত্যে জীবনের উজ্জ্বল দিকটা নেই বললেও চলে।

বলা বাহুল্য, শিল্পীর সঙ্গে সমাজেব দ্বন্দ্বে মানের সকল সহানুভূতি শিল্পীর উপর। যে-সব চরিত্র সমাজের প্রতিভূ তাদের রুচি স্থূল, হৃদয়বত্তা দুর্বল এবং এদের হাতে শিল্পী লাঞ্ছিত হলেও মনে হবে পরাজয় এদেরই হয়েছে।

মানের প্রায় সাতান্ন বছরেব দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্য-সাধনায় যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হযেছে প্রধানত শিল্পীর সঙ্গে সমাজেব সম্পর্ক কেন্দ্র করে। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় শিল্পী ও সমাজেব মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানটা দেখা যায়, শেষের দিকে সেই ব্যবধান সংকীর্ণ হয়েছে, মান নিজে যেমন জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেননি তাঁর শিল্প-সাধক নায়করাও তেমনি শেষ পযন্ত জীবনের কাছাকাছি এসেছে, যদিও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি।

মানের সাহিত্য-জীবনকে ক্রমবিবর্তনের দিক থেকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পযন্ত যে স্তবটি বিস্তৃত, তার মধ্যে শিল্পী ও সমাজের বিরোধটা তীব্র। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা কতকগুলি ছোটগল্প এবং প্রথম উপন্যাস 'বুডেনব্রুক্‌স্'। দ্বিতীয় পর্যায় 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' যুগ। তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তরে মান বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়েছেন। এই সচেতনতা এনেছে নাৎসীবাদের নির্মমতা। তাঁব 'জোসেফ' প্রভৃতি পৌরাণিক উপন্যাসগুলি এই সময়ে রচিত। বর্তমান জীবনের সমস্যা পৌরাণিক যুগের জীবনাদর্শ দিযে সমাধান করা যায় কি না, মান হয়ত তারই পরীক্ষা করছিলেন।

মানের প্রথম পর্বের রচনায় তাঁর ছোটগল্পের স্থান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ছোটগল্পগুলি থেকে আমরা মানের সাহিত্যাদর্শের পরিচয় পাই। সমাজ ও শিল্পীর মধ্যে যে বিরোধ তা এই প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলিতে যেমন স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে এমন আর কোথাও নয়। তাঁর গল্পের নায়করা জীবন-বিদ্বেষী, তারা রুগ্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম, এরা অসাধারণ নয়, অদ্ভুত।

'বুডেনব্রুক্‌স্' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। এর তিন বৎসর পূর্বে প্রথম ছোটগল্প 'লিটল হের ফ্রীডমান' প্রকাশিত হয়। সুতরাং অন্যান্য রচনা অপেক্ষা প্রথম পর্বের গল্পগুলির ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সম্পর্ক নিকটতম।

হের ফ্রীডমানের জন্মের অল্প কয়েকদিন পূর্বে তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। তার বয়স যখন মাসখানেক তখন কৌচ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পায়। সেই আঘাতের ফলে ফ্রীডমানের চেহারা বিকৃত হয়ে ওঠে। বড় হবার পর দেখা গেল, পিঠে বেশ বড় এক কুঁজ উঁচু হয়ে উঠেছে। সেই পরিমাণে বুকটা হয়েছে সংকীর্ণ এবং মনে হয়, কে যেন এক প্রচণ্ড ঘুঁষি দিয়ে বুকটা পিঠের দিকে অনেকখানি ঠেলে দিয়েছে। তার হাত দুটির দৈর্ঘ্য অসঙ্গতিজনক, হাঁটুরও নীচে নেমে আসে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থপ্ থপ্ করে ফ্রীডমান যখন পথ চলে, তখন সকলেরই মনে হয় সৃষ্টির সে ব্যতিক্রম। জ্ঞান হবার পর থেকেই ফ্রীডমানও তার বিকৃত দেহাবয়ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তাই সে সকলের কাছ থেকে নিজেকে ঢেকে রাখতে চায়। বিদ্যালয়ে তার সঙ্গী নেই, পাড়ায় বন্ধু নেই, খেলার মাঠের প্রতি আকর্ষণ নেই। সমবয়সী ছেলেরা ভালবাসে মেয়েদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু ফ্রীডমান ফুটবল খেলার মতোই মেয়েদের সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ ত্যাগ করেছে।

তবু বিচিত্র মানুষের এই মন। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মনের পাহারা দূর হয়ে গেল। একটি মেয়ে সেই ফাঁকে তাকে আকৃষ্ট করল। কিন্তু কদিনের জন্যই বা! সেই মেয়েটি আর একটি সুস্থ সবল সুন্দর তরুণের সাহচর্য পছন্দ করে তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল।

ফ্রীডমান বেহালা বাজিয়ে এই বেদনা ভুলতে চেষ্টা করল। সতেরো বছর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করে ব্যবসা শুরু করেছে। একুশ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হল। মাতৃশোক নিঃসঙ্গ শূন্য জীবনের অনেকখানি পূর্ণ করে তাকে বাঁচাল। বাকী সময়টা সে কাটাত বেহালা বাজিয়ে ও থিয়েটার দেখে। এমনি করেই ফ্রীডমানের জীবনের ত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল।

এমন সময় তাদের শহরে নতুন জেলা-সেনাপতি ফন রিনলিন্‌গেন বদলি হয়ে

এলেন। তাঁর স্ত্রী গার্দা চব্বিশ বছরের তরুণী। পূর্ণযৌবনা। এখনও সন্তানাদি হয়নি।

কয়েক দিনের মধ্যেই গার্দার পোশাক, চালচলন ইত্যাদি নিয়ে শহরের ঘরে ঘরে আলোচনা শুরু হল। গার্দার এমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল যা সকলকেই আকৃষ্ট করে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রীডমানও আকৃষ্ট হল। একদিন অপেরায় দেখা, তার ঠিক পরের আসনেই বসেছে গার্দা। আশ্চর্য, অভিনয়ের চেয়ে তাকেই বেশী করে দেখছে গার্দা। কি দেখছে? হয়ত দেখছে মানুষ কত কুশ্রী হতে পারে! হয়ত তার দৃষ্টিতে শুধুই নারীসুলভ সহানুভূতি! ফ্রীডমান কিছুই জানে না। তবুও গার্দার প্রতি তার আকর্ষণ হল দুর্নিবার। মনের তাগিদে দেহের অক্ষমতার কথা সে ভুলে গেল। প্রায়ই গার্দার বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সোফার উপরে পাশাপাশি বসে, আর সর্বদেহে অনুভব করে গার্দার সেই আশ্চর্য দৃষ্টির স্পর্শ। গার্দা যখন তাকে বেহালা বাজাতে বলে তখন সে স্বর্গসুখ অনুভব করে। তন্ময় হয়ে বেহালা শোনায়।

একদিন গার্দা তাকে নিয়ে বাগানের এক নির্জন কোণে গিয়ে বসল। জানতে চাইল তার জীবনের ইতিহাস। ফ্রীডমানের বয়স হয়েছে ত্রিশ, এ কথা শুনে গার্দা বিস্মিত হয়ে গেল। দেহের বিকৃতি ও মনের বেদনা তাকে বাড়তে দেয়নি। চেহারা দেখে মনে হবে, তার এখন কৈশোর চলছে। গার্দা বলল, ত্রিশ বছর ধরে আপনি এই কষ্টকর জীবন যাপন করছেন?

কী গভীর মমতা! এমন করে তাকে কেউ সহানুভূতি জানায়নি। ফ্রীডমান আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না। গার্দার দুই হাত ধরে সে অসংলগ্নভাবে বলতে লাগল, তুমি বুঝবে আমার দুঃখ· আমি আর পারছি না··। তারপর গার্দার কোলে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল গার্দা। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে ওই ছোট্ট দেহটাকে এক ঝাপ্টা দিয়ে মাটির উপর ফেলে দিল। যেন একটা বিশ্রী পোকা তার গা বেয়ে উঠছিল।

কুকুরকে খাবার দেখিয়ে ডেকে এনে চাবুক মেরে তাড়াবার মতো। কিছুক্ষণ সে হতজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ নিজের উপরে গভীর বিতৃষ্ণায় তার মন পূর্ণ হয়ে গেল, এই মুহূর্তে এই দেহটাকে হাজারো টুকরো না করতে পারলে বুঝি শান্তি নেই। নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করতে পারলে তার মুক্তি।

একটু দূরে কালো জলের গভীর ডোবা। ওঠবার শক্তি নেই। সরীসৃপের মত বুকের উপর ভর দিয়ে একটু একটু করে সে এগিয়ে চলল। প্রথম মাথা, তারপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ দেহটা ডুবে গেল ডোবার গভীর কালো জলে।

মান তখন মাত্র লিখতে শুরু করেছেন। হাত তখনো পাকেনি। তাই শিল্পী ফ্রীডমানের অস্বাভাবিক জীবন দেখাবার জন্য তাকে বিকলাঙ্গ করতে হয়েছে। অথচ এর প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল না। মনের বিকৃতির সঙ্গে দেহের বিকৃতি যে সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে এমন কোন কথা নেই। প্রথম পর্বের আর একটি কাহিনী 'রয়েল হাইনেসে'র (১৯০৯) নায়ক ক্লস হাইনরিকও বিকলাঙ্গ। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মান তাঁর পাত্র-পাত্রীদের দৈহিক বিকৃতি যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন।

মানের প্রথম যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প 'টোনিও ক্রোগার' (১৯০৩) এবং 'ডেথ ইন ভেনিস' (১৯১১)। এ দুটি গল্পের আলোচনা করলে মানের সাহিত্যাদর্শের পরিচয় পাওয়া যাবে।

টোনিও স্কুলে পড়বার সময় থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছে। সাহিত্য-চর্চায় সে উৎসাহ পায় তার মায়ের কাছ থেকে। মা দক্ষিণ য়ুরোপের মেয়ে; পিয়ানো ও ম্যাণ্ডোলিন বাজান চমৎকার, সাহিত্যপ্রীতিও কম নয়।

টোনিও স্কুলে যায়, কিন্তু সে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে সহজ হতে পারে না। টোনিও নিজেই এ সম্বন্ধে সচেতন। তাই সর্বদাই নিজেকে অস্বাভাবিক মনে হয়; সহপাঠীদের মধ্যেও সে অপরিচিতের মত থাকে। তার একমাত্র বন্ধু হ্যান্‌স্। ঠিক উল্টোপ্রকৃতির ছেলে। সে ছাত্র ও শিক্ষক সকলের প্রিয়। লেখাপড়া, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রভৃতি সব-কিছুতেই তার সমান উৎসাহ। টোনিওর মত সে নিজেকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি, ছড়িয়ে দিয়েছে পরিচিত সকলের মধ্যে। তাই সে এত সহজ, সকলের এত প্রিয়। বিপরীত-প্রকৃতির বলেই হ্যান্‌স্ টোনিওকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। টোনিওর নিবিড় ভালবাসার যথার্থ প্রতিদান হ্যান্‌স্ দিতে পারে না। কারণ হ্যান্‌সের অনেক বন্ধু, টোনিওর একমাত্র হ্যান্‌স্। ষোল বছর বয়সে টোনিও ইঙ্গেলবর্গ হোল্‌মের প্রেমে পড়ল। টোনিও তার প্রণয়িনীর সঙ্গেও সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারল না। তার ভালবাসার মধ্যে কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা আছে; সে মাত্রা ছাড়িয়ে ভালবাসে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মাত্রা ছাড়াবার

শান্তি আছে। ভালবাসার ক্ষেত্রেও তা সত্য। যে অত্যধিক বেশী ভালবাসে তার ভালবাসা সার্থক হয় না, মাত্রা লঙ্ঘনের জন্য সে দুঃখ পায়। টোনিওর সেই দুঃখ।

একদিন বাবার মৃত্যু হল। পৈতৃক ব্যবসা ও বসতবাটি বিক্রি হয়ে গেল। বিদেশী এক সুরশিল্পীকে বিয়ে করে মা কোথায় চলে গেলেন। এবার টোনিও অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ একা। সে পথে বেরিয়ে পড়ল। তার প্রেমহীন হৃদয় মৃত, একমাত্র সম্বল দেহ। সুতরাং শরীরের উপর চলল দীর্ঘকাল ধরে নানা অত্যাচার। নিজের উপর তার ঘৃণার শেষ নেই। কিন্তু কী করবে? হৃদয়ের উত্তাপ যার নেই, শুধু ইন্দ্রিয়ের উত্তাপে সে বাঁচতে চায়।

দেহ ভেঙে পড়তে দেরী হল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, শরীর যখন দুর্বল হয়ে পড়ল, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যখন স্তিমিত হয়ে এল, তখন অকস্মাৎ পুনরুজ্জীবিত হল তার ছাত্র-জীবনের রচনাশক্তি। অসুস্থ শরীরে লেখা যে রচনা প্রথম বেরুল, পাঠকমহলে তা বিস্ময়কর সমাদর লাভ করল। এক নতুন প্রতিভার উদয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে টোনিও বুঝতে পেরেছে বুকভরা অকৃত্রিম অনুভূতির পূর্ণতা থাকলে কেউ শিল্পী হতে পারে না। শিল্পীর অনুভূতির উচ্ছ্বাস থাকলে চলবে না। তার মনে একটা অস্বস্তিকর বিরক্তি সর্বদা কাঁটার মত বিঁধবে। স্নায়বিক বিকার যার নেই সে কখনো শিল্পী হতে পারে না। শিল্পীকে হতে হবে অ-মানুষ, অতি-মানুষ এবং তার সঙ্গে সমাজের একটা দুর্বোধ্য দূরত্বের সম্বন্ধ থাকবে। যার শরীর ও মনের গঠন স্বাভাবিক, যে স্বাস্থ্যবান এবং যে সমাজের একজন ভদ্র নাগরিক, সে কখনো লেখে না, অভিনয় করে না, সুরের সাধনা করে না, অথবা ছবি আঁকে না। টোনিও তার অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, "The kingdom of art increases and that of health and innocence declines on this earth." স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে শিল্পের শত্রুতা। শিল্পের সাম্রাজ্য যতই বাড়বে, সুস্থ অনাবিল জীবনের পরিধি ততই কমবে।

মানের বিখ্যাত গল্প 'ডেথ ইন ভেনিস-এ'র (১৯১১) নায়ক গুস্তাভ আশেনবাকও একজন লেখক। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তার জন্মেছে মায়ের উৎসাহে। মা ছিলেন একজন সুরকারের মেয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই আশেনবাক রুগ্ন। এত অসুস্থ যে ডাক্তারের পরামর্শে

তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। লেখাপড়া শিখেছে বাড়ীতে। বড় হবার পরও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেনি। আশেনবাক লেখে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কথা। প্রদীপ নিবে যাবার পূর্বে একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনি যারা ক্ষয়িষ্ণু, যারা মরতে বসেছে, তাদের মধ্যেও এক ধরনের শক্তির বিকাশ দেখা যায়। দুর্বলতা থেকেই এই শক্তির জন্ম। আশেনবাক তার রচনায় এই শক্তির বন্দনা করেছে।

আশেনবাকের বয়স এখন চল্লিশ: বিপত্নীক। সংসারের একমাত্র বন্ধন একটি মেয়ে। বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সেবার আশেনবাক একা এসেছে ভেনিসে। উঠেছে শহরতলীর এক হোটেলে। সেই হোটেলে চৌদ্দ বছরের কিশোর তাদ্‌ৎসিওকে দেখে সে মুগ্ধ হল। তাদ্‌ৎসিও তার মা ও বোনদের সঙ্গে ভেনিস বেড়াতে এসেছে। আশেনবাকের মনে হল, তাদ্‌ৎসিও যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া কিশোর মদনের অপূর্ব সুন্দর জীবন্ত মূর্তি। যে সৌন্দর্যের আদর্শ এতদিন কল্পনায় ছিল, আজ তা রূপ পরিগ্রহ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আশেনবাক ভুলে গেল লেখক হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা। ভুলে গেল তার বয়সের মর্যাদা, ওই কিশোরের একটু স্পর্শ লাভের জন্য সে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এই প্রৌঢ় বয়সে সযত্নে রূপসজ্জা করে তাদ্‌ৎসিওর পিছু পিছু সে ঘোরে ভেনিসের অলিতে-গলিতে। তাদ্‌ৎসিওর সৌন্দর্যের মধ্যে এমন এক মোহ ছিল, যা নীচের দিকে টানে, উপরে তোলে না। সেই মোহ বন্দী করেছে আশেনবাককে।

ভেনিস শহরে হঠাৎ প্লেগ মহামারী দেখা দিল। লোকে পালাতে শুরু করল প্রাণের ভয়ে। তাদ্‌ৎসিওদের ভেনিস ত্যাগ করে যাওয়া নানা কারণে বিলম্বিত হতে লাগল। যতদিন তাদ্‌ৎসিও আছে ততদিন আশেনবাকের ভেনিস ছেড়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের অবৈধ কামনা সুস্থ সমাজে সফল হবার আশা নেই। মহামারীর আক্রমণে সমাজ যখন বিপর্যস্ত তখনই মনের কালো আকাঙ্ক্ষাগুলি সফল হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আশেনবাক যদিও প্লেগ ভয় করে, তবু তার মনের গভীরে এক কুটিল আশা প্রবল হয়ে উঠল। এবার সে হয়ত তাদ্‌ৎসিওকে পাবে।

কিন্তু পেল না। যেদিন তাদ্‌ৎসিওর ভেনিস থেকে চলে যাবার কথা সেদিনই আশেনবাকের মৃত্যু হল।

মানের আদর্শানুযায়ী আশেনবাক শৈশবে স্বাস্থ্যহীন ছিল, যারা দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু, আশেনবাকের নায়ক-নায়িকা ছিল তারাই, প্রৌঢ় বয়সে তাদৎসিওর জন্য অস্বাভাবিক কামনা এবং আত্মীয়পরিজনহীন বিদেশে শোচনীয় মৃত্যু—এই সব লক্ষণই মানের শিল্পী-নায়কের উপযোগী।

মানের প্রথম উপন্যাস 'বুডেনব্রুক্‌স্'ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যানুসারী। একটি সমৃদ্ধ অভিজাত জার্মান পরিবার চার পুরুষ ধরে একটু একটু করে কি ভাবে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে গেল এই উপন্যাসে মান সেই অবক্ষয়ের কাহিনী বলেছেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জোহান বুডেনব্রুকের আমলে পরিবারের সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের সময় ছিল। জোহানের ছেলে টমাস যখন পৈতৃক ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব লাভ করল তখন থেকেই শুরু হল ক্রমাবনতি। টমাসের সাহিত্য-প্রীতি এর জন্য দায়ী। জোহানের দিনের ধ্যান ও রাত্রির স্বপ্ন ছিল অর্থোপার্জন। টমাসের কাছে অর্থোপার্জনটা ছিল একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য মাত্র। প্রাণের যোগ ছিল সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে। টমাসের সাহিত্যপ্রীতির মধ্যেই পাওয়া যায় বুডেনব্রুক্‌স্-পরিবারের ধ্বংসের বীজ। টমাস জীবনবিদ্বেষী এবং স্নায়ুদৌর্বল্যের রোগী ছিল। এদিক থেকেও সে মানের অন্যান্য চরিত্রের সগোত্র।

বুডেনব্রুক্‌স্-পরিবারের সর্বশেষ বংশধর হ্যান্নোর স্বাস্থ্যহীনতাও ইঙ্গিতময়। হ্যান্নো যদিও কেবল রোগে ভুগত, তবুও অল্প বয়সেই সে সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য সঙ্গীতশিল্পীর চরিত্রটি মানের নির্দিষ্ট ছক অনুসারেই আঁকা হয়েছে। শিল্পী হ্যান্নোর বাস্তব জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হবার মত দৈহিক ও মানসিক শক্তি ছিলনা। হ্যান্নোর অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুডেনব্রুক্‌স্-পরিবারের ধারা লুপ্ত হয়ে গেল। একটি পরিবারের উত্থান ও পতনের কাহিনী অবলম্বন করে আরও অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে। মানের কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি আসক্তিকে পরিবারের ধ্বংসের কারণ বলে দেখানো হয়েছে। শিল্পের সঙ্গে সাংসারিক সমৃদ্ধির বিরোধটা যে কত প্রবল মান তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের নৃশংসতা মানকে গভীরভাবে আঘাত দিয়ে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল। শিল্পী ও সাহিত্যিক জীবনের ঘূর্ণি থেকে দূরে বসে শিল্প রচনা করবে—এই ছিল মানের বিশ্বাস। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের তিনি এই

আদর্শে সৃষ্টি করেছেন, এবং নিজের জীবনেও এই নীতি অনুসরণ করতেন। যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় এনেছিল, মান তার প্রভাব স্বভাবতঃই এড়াতে পারেননি। স্বদেশের দুর্দশার দিনে জার্মান ঐতিহ্য তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর রচনায় জার্মান ঐতিহ্যের প্রাধান্যের সূচনা এ সময় থেকে শুরু হয়।

দুর্দিন শুধু জার্মানীর নয়। মান দেখলেন, সমগ্র য়ুরোপের জীবনে ঘুণ ধরেছে। জার্মানীর সমস্যা পৃথকভাবে বিচার করে লাভ নেই। রুগ্ন য়ুরোপ সুস্থ হয়ে না উঠলে জার্মানী একা কি করে সার্থকতা লাভ করবে? তাই তাঁর 'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর (১৯২৪) মধ্যে যুরোপের সকল দেশের পাত্রপাত্রী ভিড় করে এসেছে। আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের চূড়ায় যক্ষ্মা-স্বাস্থ্যাবাস, য়ুরোপের সকল দেশের লোক এসেছে সেখানে থেকে সুস্থ হবার আশায়। এই স্বাস্থ্যাবাস লোকালয় থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত, সুতরাং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সেখানে পৌঁছতে পারে না। স্বাস্থ্যাবাসে খাবার চিন্তা নেই, কোন কাজ নেই; শুধু খেলা ও গল্পের জীবন। তবু রোগ কঠিন। চিকিৎসক বেহ্‌রেন্স নিজেই রোগগ্রস্ত, সুতরাং সে স্বাস্থ্যাবাসের রোগীদের চিকিৎসা করবার উপযুক্ত নয়। যেমন রাজনীতিক ও সামাজিক নেতাদের নির্দেশ জাতীয় সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম। কারণ, নেতারা নিজেরাই তো অসুস্থ।

'ম্যাজিক মাউন্টেনে'র নায়ক হ্যান্‌স্‌ ক্যাস্টরপ এই স্বাস্থ্যাবাসে এক রোগীকে দেখতে এসে হঠাৎ জানতে পারল সেও রোগমুক্ত নয়। সে স্বাস্থ্যলাভের জন্য ওখানেই থেকে গেল। সুন্দরী রাশিয়ান তরুণী ক্লাভিডার প্রেমে পড়ল। ক্লাভিডাও স্বাস্থ্যাবাসের একজন রোগিণী। ক্লাভিডা যখন স্বাস্থ্যাবাস ত্যাগ করে এবং তার প্রেম উপেক্ষা করে চলে গেল তখন ক্যাস্টরপ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। সারাদিন ফোনোগ্রাফ চালিয়ে শুধু গান শোনে আর জীবন্মৃত হয়ে পড়ে থাকে। স্বাস্থ্যাবাসে থেকেও সে নিজের চারদিকে আর একটা নতুন দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করেছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত অকস্মাৎ তাকে এই মুহ্যমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করল। সাত বছর পরে ক্যাস্টরপ স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে নাম লেখাল জার্মান সেনাবাহিনীতে। শুবার্টের গান করতে করতে সে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়।

ক্যাস্টরপ সঙ্গীত-প্রেমিক। মানের অন্যান্য কলা-রসিক নায়কদের মত

সে-ও কিছুকাল সব কিছু ভুলে শুধু গান নিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জীবনের আহ্বানে সে বন্দুক কাঁধে করে শুরু করল অভিযান। মান এখানে ললিতকলার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য বিধানের পথ নির্দেশ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মুখে শুবার্টের গান এই সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত। মানের রচনায় এতদিন শিল্প ও জীবনের মধ্যে যে প্রবল বিরোধ ছিল, 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর পর্ব থেকে তার উগ্রতা কমে অনেকটা কোমল হয়ে এল।

এই পরিবর্তনের সূত্রপাত মানের জীবনেও দেখা যায়। মান এতদিন নিজেকে 'অ-রাজনৈতিক' বলে প্রচার করতেন। রাষ্ট্র যে ভাবে ইচ্ছা চলুক, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিল্পী তার কাজ করে যাবে, এই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করে তিনিও ঔদাসীন্য ত্যাগ করলেন। নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লিখলেন 'অ্যান অ্যাপীল টু রীজন্'। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। জার্মানীর পাঠক মহলে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু নাৎসীবিরোধী বলে চিহ্নিত হবার পর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হল।

স্বদেশ থেকে নির্বাসনের পর আরম্ভ হল মানের সাহিত্যসাধনার তৃতীয় পর্যায়। দু হাজার পৃষ্ঠার বিরাট বই 'জোসেফ কাহিনী' এই পর্বের প্রথম উপন্যাস। বেদনাদায়ক বর্তমান থেকে মান চলে গেছেন খ্রীষ্টান পুরাণের কাহিনীর মধ্যে। শিল্পী ও সমাজের সম্পর্ক জোসেফ-কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করেছে। জোসেফ শিল্পী, গুণী, অনুভূতিপ্রবণ এবং বুদ্ধিজীবী। তবু মানের আদর্শানুযায়ী সে সমাজ থেকে দূরে থাকেনি। বরং সমাজের দুঃখ দুর্দশার অংশ সে নিজে ভোগ করে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে। এবং সে কাজে যে সাফল্য লাভ করেছে তা অভূতপূর্ব। মানের অন্যান্য শিল্পী নায়কদের মত জোসেফ বাস্তব জীবনে অকর্মণ্য স্বপ্নবিলাসী নয়। সে ভূমিসংস্কার, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। জোসেফের মত সমাজ-সচেতন কর্মদক্ষ শিল্পী মানের সাহিত্যে আর কেউ নেই। অবশ্য পৌরাণিক কাহিনীর আড়ম্বর জোসেফের শিল্প-সত্তাকে অনেকখানি ঢেকে রেখেছে।

'ডক্টর ফাউস্টুস্'-এ (১৯৪৮) মান পৌরাণিক যুগ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধপরবর্তী জার্মানীতে উপস্থিত হয়েছেন। জার্মান উপকথার ফাউস্টুস্ শয়তানকে

আত্মা দান করে তার বিনিময়ে পেতে চেয়েছিল জাগতিক সুখ ও ঐশ্বর্য। ফাউস্টাস্ যেন জার্মানীর প্রতীক। জার্মানীও যে-কোনও উপায়ে ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছে। ডক্টর ফাউস্টাসের নায়ক আড্রিয়ান লেভারকুন একজন সঙ্গীতশিল্পী। সে গানের কথা রচনা করে, কথায় সুর যোজনা করে। ছেলেবেলাতেই আড্রিয়ান সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। সঙ্গীতসাধনায় প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে আড্রিয়ান স্বাভাবিক সুস্থ জীবনকে ত্যাগ করে সন্ধি করল শয়তানের সঙ্গে। যে প্রেম সহজ ও সুন্দর সে প্রেম ভাল লাগল না আড্রিয়ানের। বারবনিতা এস্‌মারাল্‌ডার প্রেমে পড়ল সে। আরম্ভ হল শয়তানের প্রভাব। সিফিলিসের বিষ প্রবেশ করল তার দেহে। জীবনের শেষ ক' বছর রোগজীর্ণ দেহের যন্ত্রণায় উন্মাদ অবস্থায় কাটল আড্রিয়ানের।

শিল্পী আড্রিয়ানের রোগ এবং অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অবক্ষয় যুগের শিল্পীদের অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আড্রিয়ানের প্রেম রোমান্টিক নয়, সে ভুলেছে বারবনিতার প্রেমে, যে প্রেমে দেহের আকর্ষণ অত্যন্ত স্থূল ও বাস্তব। সিফিলিস রোগটাও যক্ষ্মার মত সভ্য সমাজের রোগ নয়। সুতরাং শিল্পী হয়েও আড্রিয়ান সংসারের খুব কাছাকাছি আছে। মানের পূর্ববর্তী শিল্পী-নায়কদের মত আড্রিয়ান বাস্তব জীবনের সম্পর্ক-শূন্য মানসিক পরিমণ্ডলে বাস করে না।

শিল্পী তার নিজের জগতে বসে শিল্পের সাধনা করে যাবে; রাষ্ট্রের যাই ঘটুক না কেন, শিল্পীকে তা প্রভাবান্বিত করবে না—এই ছিল মানের আদর্শ। মান তাই নিজেকে অরাজনৈতিক নাগরিক বলে প্রচার করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিপর্যস্ত জার্মানীর অবস্থা দেখে তিনি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারেননি। 'নন্ পলিটিক্যাল ম্যান' থেকে 'পলিটিক্যাল ম্যান'-এ রূপান্তরই মানের শিল্পাদর্শ বিবর্তনের ইতিহাস। 'ডক্টর ফাউস্টাস' 'পলিটিক্যাল' মানের প্রথম উপন্যাস।

এই উপন্যাসে শিল্পী আড্রিয়ান জার্মানীর প্রতীক মাত্র। শিল্পীর সমস্যাগুলি জার্মানীরই সমস্যা। আড্রিয়ান যেমন নিজেই তার দুর্দশার জন্য দায়ী, জার্মানীও তেমনি সীমাহীন লোভের ফলে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আড্রিয়ানের মৃত্যু হয়েছে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুকাল পরে।

জার্মানীর মৃত্যুযাত্রা তখন থেকেই শুরু। আড্রিয়ানের বন্ধু ৎস্এইটব্লুম তার জীবনী সমাপ্ত করবার পরই মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হল লেখকের বাড়ীতে। মিত্রশক্তি দ্বারা জার্মানী অধিকৃত হবার ইঙ্গিত। শিল্পীর সমস্যার সঙ্গে জার্মানীর সমস্যার সুন্দর যোগাযোগ স্থাপন করেছেন মান।

এর পর থেকে মানের শিল্পী চরিত্রগুলি শিল্পীজনোচিত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সাংসারিক জীবনের একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়নি। 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র অ্যানা এর দৃষ্টান্ত। অ্যানা ছবি আঁকে, সে কিউবিস্ট। মানের প্রথম পর্বের আদর্শানুযায়ী অ্যানার দেহ বিকৃত, সে চলে খুঁড়িয়ে। এখন তাব বয়স তিরিশ। যৌবনে একটি তরুণকে ভালবেসেছিল, কিন্তু প্রতিদান পায়নি। সেই অভিমানে অ্যানা বাস্তব জীবন থেকে বিদায় নিয়ে প্রবেশ করেছে ছবির জগতে। তবু সে মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। শুধু তার মন নিঃসঙ্গ। অ্যানার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, পাঠক বুঝতে পারে তার জীবন ছাঁচে-গড়া নয়, কিন্তু সে যে টোনিও ক্রোগার বা আশেনবাকের মত জীবনের উল্টো পথে চলতে চায়নি সেটা সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

শুধু অ্যানা নয়, শিল্পী মানও সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমেরিকা-বাসের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন নবীন জাতির শক্তি। আব এদিকে প্রাচীন জার্মান জাতি বুদ্ধির দোষে মরতে বসেছে। এখন আমেবিকার তাঁবে আছে জার্মানীর একাংশ। আমেরিকার সংস্পর্শে মুমূর্ষু জার্মানী নতুন জীবন লাভ করবে, এমনি একটা আশা ছিল তাঁর মনে। সেই আশার প্রতীক-কাহিনী 'ব্ল্যাক সোয়ান'। প্রৌঢা রোজালি যখন সন্তানধারণের ক্ষমতা হারাতে বসেছে, তখন সে ভালবাসল এক আমেরিকান তরুণকে। প্রেমে সে উন্মত্ত। লোকলজ্জা পযন্ত গ্রাহ্য কবে না। প্রেম তার নারীধর্ম বাঁচাবে এই তার বিশ্বাস। বিধবা রোজালির মধ্যে দেখতে পাই জার্মানীকে। আমেরিকান প্রেমিক তাকে রক্ষা করতে পাবল না। জাতি হিসাবে আমেরিকার সংস্পর্শে এসে জার্মানীও নতুন জীবন লাভ করতে পারবে কি-না সন্দেহ। কেন না, জীবনে ঘুণ ধরেছে। যেমন রোজালির গর্ভাশয়ে ক্যান্সার রোগ বাসা বেঁধেছিল। বাইরে কেউ বুঝতে পারেনি। হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

মানের শেষ উপন্যাস 'ফেলিক্স ক্রুলে'র প্রথম খণ্ড মাত্র বেরিয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনী ছোটগল্পের আকারে প্রায় চল্লিশ বছর পুর্বে প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল। ক্রুলের মা-বাবার চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল, পরিবারে ভাঙন ধরেছে। ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতে তার ঝোঁক। একবার কিছু শুনলেই হুবহু অনুকরণ করতে পারত। ক্রুলের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন সে একদিন পার্কের প্যাভিলিয়নে বাজনা বাজিয়ে শত শত শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিল।

ক্রুলের ধর্মপিতা ছিলেন শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে সে পেয়েছে শিল্পানুরাগ। তাঁর কাছে ক্রুল শুনেছে, শিল্পীর সৃষ্টিপ্রতিভাকে সমাজ মর্যাদা দেয়, কিন্তু স্বভাবের অন্য কোন ক্রটি ক্ষমা করে না। চৌর্যবৃত্তি, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ইত্যাদির মত শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতাও একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু শিল্পকর্ম গ্রহণ করে শিল্পীর চারিত্রিক ক্রটির জন্য তাকে শাস্তি দেব—সমাজের এই মনোভাবের জন্য যত বিরোধের সৃষ্টি হয়।

সত্যিকার শিল্পরসিক ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের রাজা পেরিক্লিস। তিনি শিল্পীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে জানতেন। ভাস্কর ফিডিয়াসকে দেবী অ্যাথেনির মূর্তি গড়বার জন্য এক তাল সোনা এবং কিছু পরিমাণ হাতীর দাঁত দেওয়া হয়েছিল। ফিডিয়াস তা আত্মসাৎ করবার অপরাধে দণ্ডিত হল। পেরিক্লিসের আদেশে শিল্পী মুক্তি পেল জেল থেকে।

ভাস্কর ফিডিয়াসের মত কিশোর শিল্পী ক্রুলেরও ছিল চুরির অভ্যাস। দোকান থেকে চুরি করত লজেন্স। তা ছাড়া মিথ্যা কথা বলে স্কুল পালাত। বাবার সই জাল করে স্কুলে না যাবার কৈফিয়ৎ দিত। বড় হয়ে চুরি ও জালিয়াতিকে সে জীবিকার্জনের প্রধান উপায় বলে গ্রহণ করল। জীবনে সাফল্য লাভ করবার জন্য ক্রুল যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তার একমাত্র লক্ষ্য, জীবনের পথে যে-কোন মূল্যে এগিয়ে যাওয়া। মানের অন্য কোন চরিত্রই জাগতিক সাফল্যের জন্য এমন তৎপর নয়। শিল্পীরা তো নয়ই। অবশ্য বড় হবার পর ক্রুলের শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাহিনী অসম্পূর্ণ। হয়ত ক্রুলের শিল্পীসত্তার পুনরুজ্জীবন দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটত।

ফ্রীডমানের জীবনবিমুখতা দিয়ে যে শিল্পাদর্শের শুরু, ফেলিক্স ক্রুলের জীবনের প্রতি গভীর আসক্তির মধ্যে তার পরিণতি। শিল্পাদর্শের এই বিবর্তন ঘটেছে মানের বাস্তবসচেতনতার ক্রমানুসারে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি এত বেশী পরিমাণে শিল্পী-চরিত্রগুলি প্রভাবান্বিত করেছে যে, এদের অনেক ক্ষেত্রেই আত্মজীবনীমূলক বলে মনে হবে। নাৎসীদের রোষদৃষ্টি ছাড়া

মান শিল্পের জন্য সাংসারিক জীবনে কোন ক্ষতি বরণ করেননি। তাঁর শিল্পীরাও সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেনি। বরং তাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বচ্ছন্দ বলা যেতে পারে। রাশিয়ান মহিলা-শিল্পী আইভানোভনা টোনিও ক্রোগারকে বুর্জোয়া বলে অভিযোগ করায় সে বলেছিল, অন্তরে যারা বেদনা ভোগ করে, বাহিরের জীবনে তাদের একটু আয়েস প্রয়োজন। এটা মানের নিজের কথা।

মানের শিল্পী-চরিত্রগুলি জীবন থেকে দূরে গিয়ে যদি তৃপ্ত থাকত, তা হলে কোন সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু দূরে গেলেও সুস্থ, সহজ, সাংসারিক জীবনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাদের পীড়িত করে। শিল্পীর মনের এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বই মানের শিল্পমূলক কাহিনীগুলির ভিত্তি। ক্রোগার স্পষ্টই বলছে: " my deepest and secretest love belongs to the blond and the blue-eyed, the fair and living, the happy, lovely, and commonplace " 'ফেলিক্স ক্রুলে' দেখতে পাই প্রসিদ্ধ লেখিকা ডিয়ানে ফিলিবার্ট অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করবার জন্য ব্যাকুল। ডিয়ানে বিবাহিতা এবং বয়স্কা মহিলা। স্বামীর কাছে থেকে যা সে পায়নি তা পাবার জন্য সে হোটেলের নগণ্য লিফ্‌ট্‌বয়ের সঙ্গে রাত্রি যাপন করল। এই আচরণের জন্য তার বুদ্ধিজীবী রুচিবাগীশ মনে অনুশোচনার শেষ ছিল না। কিন্তু সে নিরুপায়। কারণ, 'The intellect longs for the delights of the non-intellect'

শিল্পীর সঙ্গে জীবনের যে বিরোধ তার তীব্রতা যদিও মানের শেষ পর্বের রচনায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবু মান চিরদিন বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পীর জীবনের আবর্ত থেকে একটু দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। দূরে না থাকলে জীবনকে দেখতে পাবে না। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মান দুঃখ করে বলেছেন যে, এখন জীবনের সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা, শিল্পীর নির্লিপ্ত একান্ত সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মহৎ শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়েছে।

টমাস মান ও মৃত্যু

উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপর মৃত্যুর প্রভাব ছিল খুব বেশী। তারা মনে করতেন, বেদনা যে প্রেরণা দেয় সৃষ্টির পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। বেদনা যত তীব্র হবে সৃষ্টি হবে তত উজ্জ্বল। মৃত্যুর মত গভীর বেদনা কে দিতে পারে? মনোবিজ্ঞানের নতুন তথ্যগুলি তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বেঁচে থেকেও যে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাওয়া যায়, সে কথা সাহিত্যে প্রকাশ করবার জন্য লেখকদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের জীবন ও রচনা মৃত্যুর ছায়ায় ম্লান। রোমান্টিসিজমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দুঃখবিলাসিতা।

বিংশ শতাব্দীতে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। তার অর্থ এ নয় যে, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা বলিষ্ঠ জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন। যন্ত্রযুগের কর্মব্যস্ততা মৃত্যুর ছায়াকে দূরে সরিয়ে দিল। বড হয়ে উঠল আজকেব জীবন; বর্তমান জীবনের সমস্যা ও বেদনা স্থান পেল সাহিত্যে। তাছাড়া, মনোবিশ্লেষণ একটি নতুন জগতের সন্ধান দিল। দেখা গেল, দেহের মৃত্যুর চেয়ে মনের মৃত্যু কত বেশী মর্মান্তিক। সাহিত্যিকেরা মানুষের মনের জগৎ নিয়ে পড়লেন। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির জন্য মৃত্যু আর অপরিহার্য নয়।

বর্তমান শতাব্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে এক মাত্র ব্যতিক্রম টমাস মান। তিনি বিগত শতাব্দীর ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাঁর রচনায় মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মৃত্যুর এমন সর্বব্যাপী প্রভাব আর কারো রচনায় দেখা যায় না। মান মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্বে মৃত্যুকেই বড় করে দেখেছেন। এবং মৃত্যুর উপযুক্ত পটভূমিকা হিসাবে তিনি এনেছেন যক্ষ্মা, সিফিলিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবেশ।

মৃত্যুর প্রতি এই আকর্ষণ মান উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান রোমান্টিক লেখকদেব কাছ থেকে। বিশেষ করে তাঁর উপর বুদ্ধিবাদী লেখক নীটশে, শোপেনহাউয়ার ও রিচার্ড ভাগনারের প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও মানকে প্রভাবান্বিত করেছে। অনেক মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ

করেছেন। বিশেষ করে অল্প বয়সে বাবার মৃত্যু তাঁদের পরিবারে যে বিপর্যয় এনেছিল তার আঘাত তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। শুধু একটি ব্যক্তির মৃত্যু নয় ; একটি ঐশ্বর্যশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন পরিবারের মৃত্যু। মানের প্রথম সার্থক রচনা 'বুডেনব্রুকস্' এই ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা। নিজের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য মানের মনে মৃত্যু প্রায়ই ছায়া ফেলত। মৃত্যু নিয়ে তাঁর ভাবনার শেষ ছিল না। মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি কুসংস্কারও ছিল। মানেব ধারণা, 'সাত' অঙ্কটি একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হবাব ইঙ্গিত। তাঁর মার জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছিল সত্তব বছর বয়সে। মানের বিশ্বাস ছিল, তিনিও সত্তর বছব পূর্ণ হলে মারা যাবেন। এই হিসাবে ১৯৪৫ সনেই তাঁর মৃত্যু হবার কথা ছিল। এ থেকে দেখা যাবে যে, মৃত্যু তাঁর কাছে একটা দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবেই উপস্থিত হয়নি , তাঁর জীবন ও চিন্তাধাবা মৃত্যুর দ্বারা গভীবভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে।

'মৃত্যু' নামক একটি ছোট রেখাচিত্র মানেব শিক্ষানবিসি যুগের বচনা। এর সাহিত্যিক মূল্য নেই, কিন্তু তাঁব সাহিত্যেব প্রধান সুরটির ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থে মান কোন-না-কোন রূপে মৃত্যুকে উপস্থিত কবেছেন। তাঁর চোখে মৃত্যু কয়েক মুহূর্তের একটি জৈবিক ঘটনা নয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার বহু পূর্ব থেকেই মৃত্যুব যাত্রা শুরু হয়। নৈতিক অধঃপতন, দেহের অবৈধ কামনা ও রোগ সেই যাত্রাব পথ তৈবি করে। মানের উপন্যাসে মৃত্যু একটি অধ্যায়ে আবদ্ধ থাকে না। কাহিনীব প্রথম থেকেই তাব পদধ্বনি শোনা যায়। মৃত্যুব কাবণ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। তাই মানেব মৃত্যু-কল্পনা পাঠকের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি কবে।

'বুডেনব্রুকস' মানকে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর এই প্রথম সার্থক উপন্যাসটিব মধ্যেই মৃত্যু-কল্পনাব সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। ক্ষয়িষ্ণু বুডেনব্রুক পরিবাবের ধ্বংসের কাহিনী মান বসসমৃদ্ধ রীতিতে সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। বুডেনব্রুকবা যখন সমৃদ্ধির শিখরে তখনই তাদের ভবিষ্যৎ অধঃপতনের অশুভ ইঙ্গিত পাওযা যায়। একটি পরিবারের ইতিহাসে জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই আছে। কিন্তু বুডেনব্রুকদের কাহিনীতে মৃত্যুর প্রাধান্য জন্মকে আড়াল করে রেখেছে। পরিবাবের শেষ বংশধর হ্যান্নোর জন্মের ঘটনা থেকেই লেখক পাঠকদের তার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে রাখেন। আর্থিক ও নৈতিক

অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের এক-একটি লোকের মৃত্যু হওয়ায় ট্র্যাজেডি গভীর হয়েছে। মৃত্যুর বাস্তব ছবি মান এঁকেছেন নিপুণ হাতে। কিন্তু মৃত্যুর প্রত্যক্ষরূপকে অতিক্রম করে প্রায়ই একটি ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। বাস্তব ও রূপকের এই মিলন আরও সার্থক হয়েছে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'ম্যাজিক মাউণ্টেনে'। 'বুডেনব্রুকসে' মৃত্যুর যে রূপ দেখি তা অনেকটা স্বাভাবিক, তাছাড়া এই মৃত্যুর যেন একটি ম্লান সৌন্দর্য আছে: রোগপাণ্ডুর তরুণীর মুখের করুণ লাবণ্যের মত।

মৃত্যুর আর এক রূপ দেখা যায় মানের বড় গল্প 'ডেথ ইন ভেনিস'-এ। জার্মান লেখক গুস্তাভ আশেনবাক ভেনিসে বেড়াতে এসে বারো বছরের অপূর্ব সুন্দর পোলিশ বালক তাদ্‌ৎসিওকে দেখে মুগ্ধ হল। যে সৌন্দর্যের সাধনা সে এতদিন করে এসেছে কিন্তু সৃষ্টি করতে পারেনি, এই বালকের মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রতীক তাদ্‌ৎসিও। এই বালক তার মনে জাগাল অদম্য রূপতৃষ্ণা, সভ্য নাগরিক জীবনের নিরুদ্ধ বাসনা এত দিনে মুক্তি পেল। বালকের প্রতি অন্ধ আসক্তি তাকে কামনার কোন্ অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। কিছুতেই তৃপ্তি নেই। নীচে, আরও নীচে নেমে যাচ্ছে। যতই নীচে নামুক না কেন, সচেতন মন থেকে জীবনের মহৎ আদর্শ লুপ্ত হয়ে যায়নি। এক দিকে দেহের অন্ধ কামনার আকর্ষণ, অন্য দিকে মহৎ শিল্পের প্রেরণা আশেনবাকের হৃদয় ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র মৃত্যু। বিক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু মৃত্যু এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা দূর করতে পাবে। তাই ভেনিসে যখন মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিল, নাগরিকরা পালাতে ব্যস্ত হল, তখন সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাদ্‌ৎসিওর মোহে সেখানেই পড়ে রইল। আশেনবাকের মৃত্যুটা শোচনীয়; কিন্তু বেঁচে থাকলে তার হৃদয় দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হত, এবং এর কোন প্রতিকারও ছিলনা। সুতরাং মৃত্যু এসে তাকে যে শান্তি দিল তার জন্য পাঠকের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। মৃত্যু এখানে এসেছে পরিত্রাতার রূপ নিয়ে।

'বুডেনব্রুকসে'র তুলনায় 'ডেথ ইন ভেনিস'-এ মৃত্যুর রূপক-কল্পনার ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু 'ম্যাজিক মাউণ্টেনে' মান এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। 'ম্যাজিক মাউণ্টেনে'র কাহিনী একটি যক্ষ্মা-স্যানাটোরিয়ামের

জীবন কেন্দ্র করে রচিত। যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়ামটি পীড়িত পৃথিবীর প্রতীক। সুইজারল্যাণ্ডের সু-উচ্চ পর্বতশীর্ষে স্যানাটোরিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সামান্য, পরলোকেব দিকে অনেকটা এগিয়ে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পীড়িত নাগরিকের মত স্বাস্থ্যনিবাসের অধিবাসীরাও পীড়িত। এমন কি, চিকিৎসক হফরাট ও অসুস্থ। যক্ষ্মা ও সিফিলিস বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার অভিশাপ। তাই এ দুটি রোগ মানের উপন্যাসে বার বার এসেছে। স্বাস্থ্য-নিবাসের কায়িক পরিশ্রমকারী কর্মীদেব শুধু এই রোগ স্পর্শ করতে পারে নি। এখানকার রোগীদের জন্য প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধ ও চিকিৎসাব ত্রুটিহীন আয়োজন, সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি দেবাব জন্য আমোদ-প্রমোদেব ব্যবস্থা পৃথিবীব স্বার্থপব বর্তমান সমাজেব কথাই মনে করিয়ে দেয়। যক্ষ্মারোগীদের মত আমবাও সমাজকে ভুলে নিজেদের সুখ-সুবিধার চিন্তায় ডুবে আছি। আমাদের যাঁবা সমাজপতি অথবা রাষ্ট্রনায়ক, তাঁরা নিজেবাই স্বাস্থ্যনিবাসেব চিকিৎসকেব মত অসুস্থ। তাই তাঁদের অন্যেব ভাল করবার ক্ষমতা নেই। স্বার্থপবতার হাত থেকে আমাদেব রক্ষা কবতে পারে প্রচণ্ড কোনও আঘাত; আঘাত পেয়ে হয়ত আমবা নতুন কোনও জগতে জেগে উঠব। এ জন্যই 'ম্যাজিক মাউণ্টেনে'ব নায়ক ক্যাস্টর্প সাত বছর স্বাস্থ্য-নিবাসে থাকবার পর যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে নাম লেখাল। যুদ্ধে নাম লেখাবার ফলে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ক্যাস্টর্প স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। সাধারণ সংস্কারেব দ্বাবা বোগক্লিষ্ট সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যুদ্ধের মত বর্বর ও চবম ব্যবস্থার সাহায্যেই মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত কবা সম্ভব। এই কারণেই য়ুরোপের ইতিহাসে হিটলারের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। মান মনে করতেন যে, হিটলারের অত্যাচার শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কল্যাণই করবে। আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে মৃত্যু এই আঘাত নিয়ে আসে। সেণ্ট টেরেসার মত মান খ্রীষ্টান আদর্শানুযায়ী বলেননি—I die because I do not die. অর্থাৎ আত্মা অমর সুতরাং মৃত্যুকে পরোয়া করি না। মান মৃত্যুকে দেখছেন মুক্তির উপায় হিসাবে। মনের দ্বন্দ্ব থেকে, রোগ থেকে হতাশা থেকে মুক্তি। আর এই মুক্তির মধ্যেই আছে নবজীবনের মন্ত্র।

এটা মানের সাহিত্যে মৃত্যুর ইঙ্গিতার্থ। মৃত্যুর বাস্তব ছবি এবং তার বেদনাও নিপুণভাবে দেখিয়েছেন মান। রূপক-নিরপেক্ষ শিল্পকর্ম হিসাবে এরা

প্রথম শ্রেণীর। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে আয়রনির সাহায্যে মৃত্যুকে মর্মস্পর্শী করা হয়েছে। মানের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র নায়িকা রোজালি যাকে নারীত্বের পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন মনে করে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, কিছুকাল পরে দেখা গেল প্রকৃতপক্ষে তা গর্ভাশয়ে ক্যানসারের লক্ষণ, মৃত্যুর পরোয়ানা। রোজালির স্বপ্ন মিথ্যা আশার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং রোজালিব আশাভঙ্গ ও মৃত্যু পাঠকের অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত করে।

মানের শেষেব দিকের রচনায় জীবন ও মৃত্যু দুই-ই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। হয়ত জীবনের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখা যাবে। মৃত্যুর পূজারী বলে মানকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষ্যে মান এর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি জীবনকে ভালবেসেছি, কিন্তু সে ভালবাসা মৃত্যুকে বাদ দিয়ে নয়। মৃত্যুকে জেনেছি বলেই জীবনের সত্য রূপটা দেখতে পেয়েছি।

আলো-ছায়ায় ছবি ফুটে ওঠে। তেমনি জীবন ও মৃত্যু পৃথিবীর ছবি সম্পূর্ণ করে। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানের ছবিতে মৃত্যুর ছায়া একটু বেশী পড়েছে, তাই একমাত্রা বেশী কালো। অন্তত 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' পর্যন্ত।

বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

প্রায় সাতষট্টি বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে, তাহারা বিচ্ছিন্ন।"[১]

এখন আমরা জাতীয় সংহতির প্রশ্ন নিয়ে ভাবছি। রবীন্দ্রনাথ একাত্মবোধের সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পথটি নির্দেশ করে গিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে মানবগোষ্ঠীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানাই প্রকৃত জানা। একদা সংস্কৃত সাহিত্য ভারতের জনসাধারণকে এক সংস্কৃতি-ভাবনায় যুক্ত করেছিল। বেদ উপনিষদ ও কালিদাসের কাব্য ভারতের সকল অঞ্চলের পক্ষেই সমান সত্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য দেশের সর্বত্র রচনা করেছিল এক সাংস্কৃতিক পটভূমি।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব নানা কারণে ক্ষীণ হয়ে আসবার পর থেকে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশী সরকার এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তখন ইংরেজী ভাষার দাপটে আঞ্চলিক ভাষা তার দারিদ্র্য নিয়ে মর্যাদার আসন লাভ করবার সুযোগ পায়নি।

ইংরেজী যে ঐক্য এনেছে তা একান্তই বাহিরের। ইংরেজী আফিস-আদালত ও ব্যবসায়ের ভাষা। হৃদয়ের ভাষা নয়। দরিদ্র হলেও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই দেশের সত্যকার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। যাঁরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত তাঁরাও মাতৃভাষাকেই হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং এইজন্যই, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজীর আধিপত্য সত্ত্বেও, ইংরেজী সাহিত্যে ভারতীয় লেখকের দান উল্লেখযোগ্য নয়।

দেশের হৃদয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। জাতীয়

---

১ বাংলা জাতীয় সাহিত্য : 'সাহিত্য'

সংহতির জন্য দেশকে সমগ্রভাবে জানতে হবে। অপরিচিত ভাষার অন্তরালে দেশের হৃদয়ের যে খণ্ডাংশ আত্মগোপন করে আছে তাকে না জানলে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়।

জানবার উপায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ এবং আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ব্যবস্থা। এখনও আমরা বিদ্যালয়ে সেক্সপীয়র মিল্টন শেলী কীটস্ পড়ি। আঞ্চলিক সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠের সুযোগ থাকলে এরূপ অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব।

তুলনা ছাড়া আমাদের চলে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্তে তুলনা করতে হয়। জ্ঞানচর্চার জন্যও তুলনা অত্যাবশ্যক। ম্যাক্সমূলার বলেছেন, "all higher knowledge is gained by comparison, and rest on comparison" কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতি এসেছে অনেক পরে।

য়ুরোপের জাতীয়-সাহিত্যগুলি যতদিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার কথা ওঠেনি। তুলনার জন্য প্রয়োজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু বা বিষয়। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যে ল্যাটিন ভাষা, ক্লাসিক রীতি ও ধর্মের প্রাধান্য ছিল। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের উপরে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব পড়েছে একটি কেন্দ্র থেকে। সুতরাং এইসব প্রভাব অতিক্রম করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ। রোম-সাম্রাজ্য পতনের পর রাজনৈতিক বন্ধন শিথিল হল; নানা কারণে চার্চের কর্তৃত্বেরও জোর রইল না। এর ফলে য়ুরোপের মানচিত্রে দেখা দিল কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। এতদিন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ছিল দৃষ্টির অন্তরালে: গাথা, পল্লীগীতি এবং উপকথা ছিল এদের আশ্রয়। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর আঞ্চলিক সাহিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্রুত বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই অনেকগুলি আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পদশালী হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বর্তমানে যেমন যোগাযোগ নেই, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে য়ুরোপের সাহিত্যগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ।

গ্যেটের বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ শুধু সমসাময়িক লেখকদের রচনার পাঠ ও আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শাশ্বত মানবতার আদর্শে পৌঁছবার জন্য সাহিত্যের সহায়তা অত্যাবশ্যক। প্রাণিজগতে যেমন আদিরূপ আছে—বিভিন্ন আদি প্রাণী সেই রূপের বিচিত্র প্রকাশ—তেমনি আমাদের শিল্প ও বুদ্ধির জগতেও আরকিটাইপ বা আদিরূপের কল্পনা করা যায়। বিভিন্ন জাতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদিরূপেরই রূপভেদ। আদিরূপকে স্পষ্টতর করে বৃহত্তর মানবতা-বোধ উদ্বুদ্ধ করাই বিশ্বসাহিত্যের মুখ্য কর্তব্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে আদিরূপে পৌঁছবার সাধনা করবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাহিত্যে পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন সহজ হবে। কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উপলব্ধি না করতে পারবার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্যেটে বিশ্বসাহিত্য বলতে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যই হয়ত বুঝেছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তিনি য়ুরোপীয়ান ও বিশ্বসাহিত্য সমার্থক রূপে প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। সংস্কৃত ও চীনা সাহিত্যের নানা বই তিনি পড়েছেন, তবু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্য দেশের সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা এমন আর নতুন কথা কি। সভ্য সমাজে সকল যুগেই তা হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্য চীন দেশে, শ্যাম জাভা আরব প্রভৃতি দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই পাঠ নিবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে। জনসাধারণ বিদেশী সাহিত্যের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ, অনুবাদের প্রচার মুদ্রণ-পূর্ব যুগে ছিল খুবই কম।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছে মূলত গ্যেটের আদর্শ অনুসরণ করে। ইউনেস্কো বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন। এখন বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা অনুবাদের সাহায্যেই করা যেতে পারে, ভাষা না জানলে যে চর্চা বন্ধ রাখতে হবে তেমন অবস্থা আর নেই।

বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে একটি সাহিত্য যে কিরূপ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্য। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে সকল চিন্তাশীল বাঙালী ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ দেশে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যের প্রচারের জন্য মিলিত ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানাতে বিনামূল্যে বই-পত্র পাঠাবার জন্য। তাঁরা আবেদনে বলেছেন, "One of the great objects of the formation of this Institution [Calcutta Public Library] is the dissemination of European literature and science in this country. As the promotion of the real interests of India, and we may add the happiness of the inhabitants, mainly depend upon the successful prosecution of those efforts which have been made for some years past to foster a taste for the elegant literature and sound knowledge of the west, it may be considered a duty incumbent on every Englishman, whatever be his station, to assist in furthering this object."[৫]

অর্থাৎ, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য এ দেশে প্রচার করাই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্যের সুরুচিপূর্ণ সাহিত্য এবং প্রগাঢ় জ্ঞান এ দেশে প্রচারের উপরে ভারতবাসীর সুখ ও স্বার্থ অনেকটা নির্ভর করছে।

যে বছর এই আবেদন করা হয় সেই বছর, অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেন। আবেদনকারীরা ঐ কথাটি ব্যবহার না করলেও অন্তর্নিহিত ভাবটি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

শুধু এই ক'জন আবেদনকারীর মধ্যেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা দেশের মন বিদেশী সাহিত্যের দান গ্রহণ

৫ Calcutta Public Library . Annual Report, 1848-49

করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একমাত্র বাংলা সাহিত্য সেই প্রভাব থেকে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে আদানপ্রদানের পালা নিত্যই চলছে। নিজের মতো করে গ্রহণ করবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বাঙালীর তা ছিল, এই জন্যই বাঙালী লেখকরা অনুকরণ করেননি। সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিশ্বসাহিত্যের এই মূল তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন, "হোমার বর্জিল মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তারা গ্রহণ করেছিলেন, সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার? যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা না হয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনাফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়।··· অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন।"[৬]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।

---

৬ সাহিত্যরূপ : সাহিত্যের পথে

শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেব কাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয়নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত, যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে।·· সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।"[৭]

উপরোদ্ধৃত দুটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রধান তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে যে সাহিত্য অন্য জাতির মনে নব-সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত করে তা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। ভাবের জগতে ঋণ গ্রহণ স্বাভাবিক এবং সে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্যের ভাবসম্পদ কয়েকজন লেখককে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করলেও ইংরেজী পাঠক্রমের মাধ্যমে সাধারণ পাঠককেও তা স্পর্শ করেছিল। তা না হলে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত বাংলাসাহিত্য সমাদর লাভ করত না। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' শুধু মধুসূদনকেই প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানবার একমাত্র উপায় মিলটনেব আদর্শে বচিত গ্রন্থের অভ্যর্থনা দেখে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জনপ্রিয়তা থেকে বাঙালী পাঠকের মন যে সেদিন কোন্ দিকে ঝুঁকেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক অখ্যাতনামা লেখকও রচনার মধ্যে মিলটনের প্রতি আকর্ষণের ছাপ রেখে গিয়েছেন। যে-বছর 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয় সে বছরই বেরিয়েছিল তারিণীচরণ শর্মার 'রাবণের জীবনচরিত'।

১৯০৬-'০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের বাংলা বিভাগের পরিচালক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের অনুরোধে সাহিত্য সম্পর্কে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে যে বক্তৃতা

৭ সাহিত্যবিচার: সাহিত্যের পথে

দেন তার বিষয় ছিল 'বিশ্বসাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার নামকরণ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার উপরে যে আলোচনার ভাব দেওয়া হইয়াছে ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।"

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি তা প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবেঃ " ..পৃথিবী যেমন আমার খেত, তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে।৮ আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সম্পর্ক পৃথকভাবে দেখেননি। তিনি জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। "আমাদেব অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকেনা।"৮

সত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ তিন জাতের: বুদ্ধি, প্রয়োজন ও আনন্দেব যোগ। "সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়।" আনন্দের যোগ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিযে স্থাপন করা যেতে পারে। এটা প্রয়োজনের যোগ নয় বলেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবার আশঙ্কা নেই। "তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর হস্তক্ষেপ করে না, ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না, সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অন্ততঃ জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশেপাশেই একটা প্রয়োজন ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার

৮ বিশ্বসাহিত্য : সাহিত্য

প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে।...তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস।"

মানবপ্রকৃতির নিত্যকালীন আদর্শ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যেই যথার্থরূপে পাওয়া যায়। কেননা, আনন্দের সৃষ্টি স্বার্থকলঙ্কিত নয়। বিশ্বের মানুষকে জানতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে, সাহিত্যই প্রধান উপায়। তাই বর্তমান জগতে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সাহিত্য এবং শিল্পের, অর্থাৎ আনন্দ বা সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষে-মানুষে উদ্দেশ্যহীন যোগাযোগে লাভ কি? পরস্পরের মঙ্গলকামনাই হবে যোগাযোগের প্রধান লক্ষ্য। "কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে।...সৌন্দর্য-মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তি সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।"[৯]

সুন্দর ও মঙ্গল যেমন একার্থবোধক, তেমনি সুন্দর ও সত্য অভিন্ন। যা প্রকৃতই সুন্দর তা সত্য এবং মঙ্গলময়। সাহিত্য সত্যোপলব্ধির চিহ্ন। "জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।"[১০]

মহৎ শিল্প-সাহিত্যে সত্যের প্রকাশ ঘটে বলেই তার প্রভাব এড়ানো যায়না। বিশ্বসাহিত্যের জোর সেখানে। মুসলমান আমলে আমরা সেমিটিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি। আবার বর্তমানে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবকে ঠেকানো সম্ভব নয় এই জন্য যে, এর মধ্যে সত্যের জোর আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

৯ সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য
১০ সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য

"য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনো মতেই হইতে পারে না, যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।"[১১]

নিরন্তর একের প্রভাব অন্যের উপর পড়ে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের পাঠ আলোচনা ও প্রচার এই জন্যই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমানবতা একার্থক। জীবন থেকে পৃথক করে সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি উৎসুক নন। মহৎ সাহিত্যে মানুষের সত্য-রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই বিশ্বসাহিত্যে ঘটে সত্যের মিলন। যেখানে অসত্য, সংঘাত সেখানেই দেখা দেয়। সকল দেশের সাহিত্যের সমষ্টি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বসাহিত্য নয়। মহৎ সাহিত্যের সামগ্রিক রূপই বিশ্বসাহিত্য। এই সাহিত্য মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, তার অনুভূতির প্রসার ঘটায় এবং বিশ্বমানবতাকে এগিয়ে আনে। কিন্তু তাই বলে বিশ্বসাহিত্যই বিশ্বমানবতার একমাত্র পথ নয়। আমাদের শিল্প দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম সবই মানুষকে বৃহত্তর অনুভূতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়।"[১২]

১১ সাহিত্যসৃষ্টি : সাহিত্য

১২ শান্তিনিকেতন ১০

গান্ধী ও রাস্কিন

গ্রন্থ-জগতের ক্রমবর্ধমান বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানের ফসল আহরণ করবার ঝোঁক দিন দিন বেড়ে চলেছে। আজকাল সাধারণ পাঠকও নানা বিষয়ের বহু বই পড়ে বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে। এই জ্ঞানের ভাণ্ডার মজুতদারের গোলার ধানের মতো, যা কখনো দরিদ্রের খিদে দূর করতে সাহায্য করে না। এমনি পুঁথিগত জ্ঞানের সঞ্চয়কে গান্ধীজী বিশেষ মূল্য দেননি। তিনি আত্মচরিতে বলেছেন, ছাত্র-জীবনে পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বই পড়বার উৎসাহ তাঁর ছিল না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পরও তিনি খুব কম বই পড়েছেন। এজন্য গান্ধীজীর কখনো অনুতাপ হয়নি। বরং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে, রাশি রাশি বই না পড়বার ফলটা ভালই হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে বই সম্বন্ধে গান্ধীজীর আগ্রহ খুব সীমাবদ্ধ ছিল একথা ভাবলে ভুল করা হবে। মহাদেব দেশাই যারবেদা জেল ডায়েরির ১২ই মার্চ (১৯৩২) তারিখে লিখছেন, 'বাপু জানতে চাইলেন জেল লাইব্রেরিতে স্কট, মেকলে, জুলে ভার্ন, ভিক্টর হুগোর কোনো বই এবং কিংসলির Westward Ho অথবা গেটের ফাউস্ট আছে কি-না। তিনি আমাকে এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের Adam's Peak to Elephanta এবং নিবেদিতার Cradle Tales of Hinduism এনে দিতে আদেশ করে বললেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে বসে তিনি ডাক্তার জেকিল ও মিঃ হাইডের গল্পটা পড়েছেন। বাপু এখন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের The Wet Parade. বাপু বললেন, সিনক্লেয়ারের লেখায় খুব উপকার হচ্ছে। তিনি একটার পর একটা সামাজিক পাপকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপর চমৎকার আলোকপাত করছেন।'

গান্ধীজীর অধ্যয়ন সম্বন্ধে এক দিনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে কিন্তু তাঁর পুস্তক-বিমুখতা স্বীকৃতির সমর্থন পাওয়া যায় না। গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম অনেক গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। ছেলেবেলায় ভাগবতের গল্প এবং তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। বিলেত গিয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার

সুযোগ পেলেন গান্ধীজী। সল্ট-এর Plea for Vegetarianism, এডুইন আর্নল্ডের The Light of Asia এবং The Song Celestial, মাদাম ব্লাভাৎস্কির Key to Theosophy প্রভৃতি পুস্তক গভীরভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও তিনি একে একে পড়তে লাগলেন সক্রেটিস, ম্যাক্সমূলর, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাবলী। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র স্তম্ভে গান্ধীজী বার বার স্বীকার করেছেন যে, তিনি অনেক কিছুর জন্য টলস্টয়ের নিকট ঋণী। তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজের' পাঠকদের তিনি টলস্টয়ের ছ'খানা বই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। সক্রেটিসের নির্ভীক মৃত্যু তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। Trial and Death of Socrates গান্ধীজী গুজরাটিতে অনুবাদ করেন, কিন্তু ভারত সরকারের আদেশে ১৯১৯ সালে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

সবচেয়ে গভীরভাবে যে বই গান্ধীজীর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে তা হল জন রাস্কিনের (১৮১৯-১৯০০) Unto this Last. 'পুস্তকের জাদুমন্ত্র' নামক আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে গান্ধীজী এই গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' কাজে গান্ধীজীকে নাটাল যেতে হবে। পোলক এসেছেন গাড়ীতে তুলে দিতে। পথে পড়বার জন্য পোলক তাঁর হাতে দিলেন রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট'। পড়তে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকটি গান্ধীজীর মন প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিল; শেষ না করে তিনি থামতে পারলেন না। সে রাত্রিতে তাঁর চোখের ঘুম গেল দূর হয়ে, সংকল্প করলেন রাস্কিন যে জীবনাদর্শ প্রচার করেছেন এই পুস্তকের মাধ্যমে তাকে তিনি বাস্তবে রূপ দেবেন। গান্ধীজীর বই পড়ার এই ছিল বৈশিষ্ট্য। গ্রহণযোগ্য কোন নতুন জ্ঞান বা আদর্শ পেলে বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে আবদ্ধ করে রাখতেন না। জীবনে তাদের প্রয়োগ করে সত্যতা যাচাই করা ছিল তাঁর অভ্যাস। এই সত্যের পরীক্ষায় যে সব বই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে, 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর প্রভাব তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর।

গান্ধীজীর মতে 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর মূল কথা তিনটি: (১) সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যষ্টির কল্যাণ; (২) উকিল ও নাপিতের জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার; সুতরাং তাদের পারিশ্রমিকের হার একই নীতিতে নির্ধারিত হবে; (৩) কৃষক, মজুর প্রভৃতি যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের জীবনই আদর্শ

জীবন। অবশ্য এই কথাগুলো গান্ধীজীর কাছে একেবারে নতুন ছিল না। অনুরূপ আদর্শের অনুভূতি তাঁর মনে নীহারিকার আকারে উপস্থিত ছিল। রাস্কিনের স্বচ্ছ চিন্তা ও রচনার গুণে নতুন আদর্শের অস্পষ্ট অনুভূতিগুলি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সম্ভাবনাপুষ্ট হয়ে সাড়া জাগাল গান্ধীজীর মনে। তিনি তৎক্ষণাৎ 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর আদর্শ অনুযায়ী 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' পরিচালন ব্যবস্থা নির্ধারিত হবে স্থির করলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' আপিস শহর থেকে সরিয়ে কোনো কৃষিক্ষেত্রে নিতে হবে। সব কর্মীদের প্রধান কাজ হবে কৃষি, অন্য সময় করবে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' কাজ। এ কাজে সম্পাদক থেকে কম্পোজিটার সবার মাইনে হবে এক। এই পরিকল্পনা সত্যি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল এবং কিছুদিন গান্ধীজীর কাগজ এভাবেই চলেছিল।

পরে গান্ধীজী 'সর্বোদয়' নাম দিয়ে 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ক্রমে এই সংকীর্ণ অর্থ থেকে মুক্তি পেয়ে 'সর্বোদয়' নতুন মর্যাদা লাভ করেছে। গান্ধী-দর্শনের মূল কথাই হল সর্বোদয়। গান্ধীজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বরাজ তার প্রথম ও আবশ্যিক ধাপ মাত্র। সর্বোদয়ের আদর্শ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। যে গ্রন্থটি গান্ধীজীর মনে সর্বোদয় পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়েছিল, তার মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

অর্থনীতির ভূমিকায় সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে রাস্কিনের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয়। রাস্কিন এতে না দমে তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্র গ্রথিত করে ১৮৬২ সালে Unto this Last বের করেন। সে যুগের পক্ষে রাস্কিনের মতবাদের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। এমন কি, আজকের দিনেও রাস্কিনের দৃষ্টিকে অত্যন্ত প্রগতিবাদী বলে মনে হবে। তাই সাধারণ পাঠকের সমাদর লাভ করা সম্ভব হয়নি 'আনটু দিস্ লাস্টের' পক্ষে। এক হাজার কপির প্রথম সংস্করণ এগারো বছরেও নিঃশেষ হল না। কিন্তু প্রভাতের সূর্যালোক যেমন সবার আগে পর্বতের চূড়াকে চুম্বন করে তেমনি সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা রাস্কিনের নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 'আনটু দিস্ লাস্ট' টলস্টয়কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করল ; কার্লাইলের অকুণ্ঠ প্রশস্তিবাদ পেলেন রাস্কিন। য়ুরোপের অনেক মনীষী ইংরেজী শেখার উদ্যোগ করলেন শুধু 'আনটু দিস্ লাস্ট' পড়বার জন্য।

ক্রমে নব আদর্শের আলো নেমে এলো সমতলে—ইংলণ্ডের শ্রমিকদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল 'আনটু দিস্ লাস্ট।' যারা অত্যন্ত দরিদ্র, কিনে পড়বার সামর্থ্য নেই, তারা নকল করে রাখল সম্পূর্ণ বইখানি। তারা সকালে বিকেলে অবসর পেলেই পড়ত, আর আশা করত একদিন রাস্কিনের স্বপ্ন সফল হবে, শ্রমিক ও কৃষক যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯০৬ সালে পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সভ্যদের প্রশ্ন করা হল কোন্ বই তাঁদের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তর থেকে দেখা যায় অধিকাংশ সদস্যই 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর নাম করেছেন।

রাস্কিন নিজেও মনে করতেন এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। শেষ বয়সে কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক বন্ধুকে বলেছিলেন, এমন শর্ত যদি আরোপ করা হয় যে, একখানি বই ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনাবলী পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং সে বইখানি নির্বাচনের ভার থাকবে রাস্কিনের উপর, তাহলে তিনি 'আনটু দিস্ লাস্ট'কেই রক্ষা করতেন।

রাস্কিন শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর পক্ষে 'আনটু দিস্ লাস্টে'র মতো বই লেখা একটু আকস্মিক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পুস্তক রচনার পটভূমিকার পরিচয় পেলে একে অস্বাভাবিক বলে ঠেকবে না। ১৮৬০ সালের কিছু আগে থেকেই ইংলণ্ডের সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্প-বিপ্লবের কুফল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ম্যাঞ্চেস্টারগোষ্ঠীর অর্থনীতিবিদ্‌রা অর্থনীতি সম্বন্ধে যে নতুন মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন তাতে সংকট আরো বৃদ্ধি পেল। এই ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলের পুরোধা ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ ও জন স্টুয়ার্ট মিল। তাঁরা বললেন, উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে যদি প্রবল প্রতিযোগিতা থাকে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে গভর্নমেণ্ট যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে জাতীয় অর্থসম্পদ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে। এঁদের কাছে জাতীয় সম্পত্তির অর্থ হল সমগ্র জাতির মোট সম্পদ। দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন যদি অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র হয় তাতে ক্ষতি নেই; একজনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিকেই জাতীয় ধন বৃদ্ধি বলে গণ্য করা হবে। আবার দেশের কৃষক-মজুর যদি দু'বেলা খেতে পায়, কিন্তু বিত্তশালী ধনীর সংখ্যা যদি কম থাকে, তবু দেশ দরিদ্র বলে পরিচিত হবার সম্ভাবনা। অর্থনীতির এই তত্ত্বগুলির কেন্দ্র হল economic man বা 'আর্থিক মানুষ' বলে এক অদ্ভুত জীব। সে যুগের অর্থনীতিবিদ্‌রাই এর আবিষ্কর্তা। 'আর্থিক

মানুষ' সকল মানবিকতাবোধশূন্য হৃদয়হীন জীব। তার সকল কর্মপ্রচেষ্টার গোড়ার কথা হল টাকা।

রাস্কিনের অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী মন এই বিকৃত ব্যাখ্যায় ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, মানুষ সামাজিক জীব, তার আনন্দ-বেদনার অনুভূতি থেকে অর্থ উপার্জনকে পৃথক করে দেখা একান্তই অসম্ভব। আমাদের হৃদয়বৃত্তি অন্য সকল কাজকে যেমন, অর্থ উপার্জনকেও ঠিক তেমনি, প্রভাবান্বিত করে। শুধু প্রতিবাদ করেই রাস্কিন ক্ষান্ত হননি। ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রেণীর শোচনীয় জীবন তাঁকে মর্মাহত করেছিল। অথচ সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে তখন মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের জীবনে এসেছিল স্বর্ণযুগ। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে সুস্থ সহজ জীবন যাপন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে রাস্কিন সামাজিক ভিত্তিতে এক আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করে দেশবাসীর হাতে দিলেন। 'আনটু দিস লাস্ট'-এ তাঁর এই আদর্শটি রূপায়িত হয়েছে।

সে-কালের হৃদয়বৃত্তির সম্পর্কশূন্য অর্থনীতি বলত, ভৃত্যের কাছ থেকে কর্তা যত বেশী কাজ আদায় করবে, সমাজের তত বেশী কল্যাণ হবে এবং সে মঙ্গল ভৃত্যকেও স্পর্শ করবে। কিন্তু সমস্যা হল কাজ বেশী আদায় করা নিয়ে। কি করে তা সম্ভব? ভৃত্য তো আর যান্ত্রিক ইঞ্জিন নয় যে, যত চালাবে ততই কাজ পাওয়া যাবে। মানুষ কাজ করে তার হৃদয় ও আত্মার প্রেরণায়। কর্তা যদি ভৃত্যের হৃদয় স্পর্শ করবার ক্ষমতা রাখে তাহলে যে ফল আশা করা যায়, অধিক বেতন, জবরদস্তি ইত্যাদি উপায়ে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, অর্থনীতি যা-ই বলুক না কেন, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যদি সহানুভূতিপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক থাকে তাহলে পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ। কেউ কেউ বলেন ভৃত্য প্রায়ই সদয় ব্যবহারের অমর্যাদা করে। হয়ত কখনো কখনো করে, কিন্তু ভালো ব্যবহার পেয়েও যে কৃতজ্ঞ থাকে না, খারাপ ব্যবহার তাকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলবে। উদারচেতা প্রভুর সঙ্গে যে ভৃত্য অসদাচরণ করে, সে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে অন্যায়াচারী কর্তার পক্ষে। ভালো ব্যবহার যে ভৃত্যের অনিষ্টকারী মনোবৃত্তি কোমল করে আনে তা'তে ভুল নেই। কর্তা যদি তাঁর দরদকে অধিক আয়ের জন্য বাহ্যিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার না করেন, তাঁর সহানুভূতি যদি আন্তরিক হয়, তাহলে ভৃত্য নিশ্চয়ই সকল হৃদয় দিয়ে কাজ করবে এবং তার

পরিমাণ সহজভাবেই বৃদ্ধি পাবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্বন্ধেই একথা সত্য।

কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে এবং প্রতিযোগিতার দ্বারা মজুরীর হার নির্ধারণ করবার নীতিটা মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ নীতি যে ঠিক নয় তা আমরাও জানি। কারণ যেখানে আমাদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেখানে আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করি, প্রতিযোগিতা, সরবরাহ ইত্যাদির প্রশ্ন মনে আসে না। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদটা আমরা কখনো নীলামে তুলি না; যোগ্যতম ব্যক্তিকে বেছে নিই। অসুখ করলে টাকা কে কম নেবে তা বিচার করতে বসি না, ভালো ডাক্তারকে ডাকি। এমনি সকল ক্ষেত্রে। তবে উকিল, ডাক্তার, মিস্ত্রী, মেথর প্রত্যেকের জন্য মজুরীর একটা নির্দিষ্ট হার থাকা উচিত। এক থেকে একশ' আটাশ টাকার মধ্যে ডাক্তারদের ফীস ওঠানামা করবে না। তার কারণ ডাক্তারদের সমাজের প্রতি একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। কর্তব্যটা যেমন নির্দিষ্ট, তার জন্য সমাজ যে মূল্য দেবে তাও তেমনি নির্দিষ্ট থাকা সঙ্গত। সুতরাং সব ডাক্তার এক ফীস পাবে, সেটা চার কিংবা আট টাকা যা-ই হোক না কেন। কথাটা শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন। ভালোমন্দ সব ডাক্তার যদি একই পারিশ্রমিক পায় তাহলে ভালোর মূল্য কি? রাস্কিনের উত্তর হল, আমরা যে ভালোকে বেছে নিই সেটাই তার মূল্য। যাদের দক্ষতা কম তারা অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতে কাজ করবার জন্য নিয়োগ-কর্তাকে প্রলুব্ধ করে এবং এই প্রলোভন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ী হয়। এরই ফলে সমাজে দুঃখ ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। মজুরী নিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রকৃত দক্ষ কর্মী অনেক সময়ে কাজ পায় না, কিংবা পেলেও, উপযুক্ত মজুরী মিলে না। এতে কাজের মান নীচু হয়ে পড়ে এবং সকল শ্রেণীর কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। যারা কম পয়সায় কাজ করে তাদের জীবনও দুর্বহ হয়ে ওঠে, কারণ তাদের পারিশ্রমিক সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে। অপরপক্ষে গুণ-বিচার যদি নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হত তাহলে কাজ না পেয়ে অকুশলী কর্মীর মনে তাগিদ জাগত দক্ষতা অর্জন করবার।

সমাজ ও জাতির প্রতি আমাদের প্রত্যেকের একটা কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হয়। তার চেয়ে বেশী দাবী করা যেমন অন্যায়, কম নিয়ে কাজ করাটাও তেমনি অসঙ্গত। আদর্শ

সমাজে নাগরিকদের অন্তরে লাভ করবার মনোবৃত্তি থাকবে না। অথচ ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের এটাই হল সবচেয়ে বড় প্রেরণা। জাতীয় জীবনে তাদের যতটুকু দান তার চেয়ে বহুগুণ বেশী তারা আদায় করে নিতে চায়। আশ্চর্য এই যে সমাজও তাদের মুনাফার দাবীটা মেনে নিয়েছে। তবে আমাদের অন্তর হয়ত এতে সায় দেয় না। কারণ শিক্ষক ও ডাক্তারকে যে মর্যাদা দিই ব্যবসায়ীরা তা পাবে না আমাদের কাছ থেকে।

প্রত্যেক সভ্য-সমাজে কর্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে পাঁচটি প্রধান শ্রেণী আছে। সৈন্যের কাজ দেশ রক্ষা করা; গুরু শিক্ষা দেবে জাতিকে, ডাক্তারের হল স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব; আইনজীবীর কর্তব্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং বণিক জাতি ভার নেবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাবার। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণী যেহারে পারিশ্রমিক পাবে বণিক ও মিলমালিকেরা তার বেশী চাইবে কেন এবং চাইলে সমাজ তা সমর্থন করবে কোন্ নীতিতে? সবচেয়ে সস্তায় জিনিস কিনে সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রী করাকেই আমরা বলি ব্যবসা। আদর্শ সমাজে কিন্তু তার উল্টো। সবচেয়ে ভালো জিনিস যথাসম্ভব সস্তায় পাওয়া যাবে সেখানে। বিপদের সময় সৈন্যদের যেমন প্রাণ দিয়ে দেশরক্ষা করতে হয়, মৃত্যুর ভয় না করে ডাক্তারদের যেমন মড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, ঠিক তেমনি দুর্ভিক্ষে ও দুর্দিনে ব্যবসায়ীরা জাতির চাহিদা মিটিয়ে যাবে নিজের ক্ষতি করেও। কর্তব্য করতে গিয়ে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয় তাতেও দ্বিধা করলে চলবে না।

অর্থ উপার্জন করে ধনী হবার প্রকৃত মর্ম কি তা আমরা তলিয়ে দেখি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হবার কৌশল যার আয়ত্ত, দেশের দশ জনকে দরিদ্র করে রাখবার বিদ্যাটা সে ভালোরূপেই জানে। আমার পকেটের টাকার মূল্য তখনই হতে পারে যখন চারপাশের লোকদের পকেট শূন্য থাকবে। "The art of making yourself rich, in the ordinary mercantile economist's sense, is equally and necessarily the art of keeping your neighbour poor"

তাই ধনিক সম্প্রদায়ের নিরন্তর চেষ্টা চলছে দেশের লোকদের গরীব করে রাখবার। কেবল স্তূপীকৃত টাকার দিকে চেয়ে চেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না; স্বল্পবিত্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব করবার মধ্যেই রয়েছে আসল আনন্দ। ক্ষুধা-ক্লিষ্ট দরিদ্র না থাকলে প্রভুত্ব করবে কার উপর? সুতরাং দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী

করে রাখবার চক্রান্ত ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা দেশ সম্বন্ধে যেমন এটা সত্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি। বিত্তশালী জাতিগুলি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জাতিগুলিকে আর্থিক ব্যাপারে পঙ্গু করে রাখবার জন্য সর্বদা ষড়যন্ত্র করছে। কে কত অর্থ নিজের ঘরে আনবে তার জন্য দেখা দিয়েছে মর্মান্তিক প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে বিশ্বযুদ্ধে নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। টাকার প্রতি এই বিধ্বংসী আসক্তি দূর হতে পারে যদি ব্যষ্টির জীবনে থাকে নীতিবোধ। প্রত্যক্ষরূপে সমাজকে যতটুকু সেবা করতে পারব প্রতিদানে তার বেশী কিছু চাইব না, যা প্রয়োজন নেই তার উপর লোভ করব না,—এই নীতিবোধ যদি আমাদের প্রত্যেকের মনে সজাগ থাকে তাহলে অর্থলোলুপ জাতিগুলি রক্ষা পেতে পারে।

অর্থনীতি বলতে রাস্কিন বুঝতেন "that which teaches nations to desire and labour for the things that lead to life and which teaches them to scorn and destroy the things that lead to destruction."

নাগরিকদের কর্তব্যপরায়ণ, নীতিপরায়ণ জীবনগুলিই জাতির প্রকৃত সম্পদ। জীবনকে প্রস্ফুটিত করবার জন্যই অর্থ, অর্থের জন্য জীবন নয়। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় অর্থ যে-কোনো উপায়ে আহরণ করলে চলবে না। মুদ্রায় শুধু রাষ্ট্রের ছাপ থাকলে কী হবে, চাই ধর্মের ছাপ। পথ যদি সৎ না হয়, তাহলে সে পথে যত অর্থই আসুক, তা কখনো প্রকৃত জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে না। টাকা-পয়সা যারা ব্যবহার করবে তারা যদি চরিত্রবান না হয় তাহলে অর্থ হবে অধোগতির পথ। রাস্কিন দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতেন যে, সত্যিকার জাতীয় সম্পদ নির্ভর করে জাতীয় চরিত্রের উপর। তাঁর অর্থনীতি তাই ধর্মাচরণের সগোত্র।

নৈতিক জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে দুর্নীতি দেখা দেয়। তাছাড়া অসম প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যা-খুশী-হোক্ নীতি সমাজে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করেছে। হৃদয়হীন প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে উপর তলার লোক তলিয়ে যায়, নীচু তলার লোক উপরে ওঠে। এর ফলে শুধু যোগ্য ব্যক্তি নয়, অনেক ঠক্, জোচ্চোর ও অপদার্থ বিত্তশালী হয়ে বসে। আবার কিছু অযোগ্য নির্বোধ লোকের সঙ্গে কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু লোক দারিদ্র্যের জ্বালায় পিষ্ট হয়। এই দুর্ভাগ্য প্রত্যহ চোখে পড়ে এবং আমরা

ধিক্কার দিই ভগবানকে এবং ধর্মাচরণের উপদেশকে। রাস্কিন বলেন, প্রতি-যোগিতার বদলে সহযোগিতা এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারের সতর্ক হস্তক্ষেপ এর সমাধান করতে পারে।

'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর মূল কথা এই। জানি, রাস্কিনের অর্থনীতির অনেক তত্ত্ব আজকের বিশেষজ্ঞদের যুক্তির আঘাতে টলায়মান হতে পারে। কিন্তু এও জানি, যে নৈতিক ভিত্তির উপর তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত তাকে সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। গান্ধীজীর সঙ্গে রাস্কিনের আত্মাব যোগাযোগ এই নীতি-বোধকে কেন্দ্র করে। গান্ধীজী তাঁর সকল কাজের মধ্যে ন্যায় ও ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যষ্টির চরিত্র উন্নত না হলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয় একথা গান্ধীজী জীবনেব শেষ দিন পযন্ত নানাভাবে প্রচার করে গেছেন। রাস্কিন ও গান্ধী দু'জনেই জোর দিয়েছেন নাগরিকদের নিজেদের কর্তব্যের উপর। কর্তব্য পালন করলেই তো অধিকার পাওয়া যাবে। আজকাল আমরা কিন্তু আগে অধিকার দাবী করি।

গান্ধীজী যা সত্য বলে জেনেছেন নিজে তাকে জীবনে গ্রহণও করেছেন। রাস্কিনের মধ্যেও এই দুর্লভ সততা ছিল। তিনি বলতেন, অপরের জন্য যে পরিমাণ কাজ করা হয়, ঠিক সে পরিমাণ ফিরে পাবারই আমরা অধিকারী। একশ' টাকা ধার দিলে ঐ একশ' টাকাই ফিরে পাওয়া উচিত, তার জন্য সুদ চাওয়া অন্যায়। কারণ সুদের টাকাটার জন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিদান দেওয়া হয় না। এই হিসাবে কোম্পানীর লভ্যাংশ কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং রাস্কিন তাঁর বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে শুধু নিজের লেখার আয়ের উপরে নির্ভর করলেন।

আমরা সত্যকে দৈনন্দিন জীবন থেকে নিবাসন দিয়ে তাকে রেখেছি মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়। ঈশ্বরকে স্মরণ করি শুধু বিশেষ কয়েকটি দিনে। রাস্কিন সেই নির্বাসন থেকে এনে সত্যকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন আর্থিক ক্ষেত্রে। গান্ধীজী জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা করেছেন। সত্য আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাস্কিন ও গান্ধীজী যখন সত্যকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে চাইলেন তখন আমরা চমকে উঠলাম। সত্যের প্রতি নির্ভেজাল নিষ্ঠার মধ্যেই রাস্কিন ও গান্ধীজীর আত্মীয়তার সূত্র উপলব্ধি করা যেতে পারে।

গান্ধীজী 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর গুজরাটি অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'সর্বোদয়'। আচার্য ভিনোবা বলেছেন, 'সর্বোদয়ের' পরিবর্তে 'অন্ত্যোদয়' নাম দিলে রাস্কিনের অর্থটা সুপরিস্ফুট হত। কিন্তু পরিবর্তনটা যে গান্ধীজীর ইচ্ছাকৃত তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোদয় কোনো সংস্থা নয়, এই একটি শব্দের মধ্যে বিবৃত হয়ে আছে সমাজ-উন্নয়নের মহৎ আদর্শ। রাস্কিনের মতো এখানে দরিদ্র নাগরিকের আর্থিক উন্নতিটাকেই মুখ্য করে দেখা হয়নি। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ প্রত্যেককে উন্নত করতে হবে, বিকশিত করে তুলতে হবে তাদের জীবনের পূর্ণ সম্ভাবনাকে। সেই উন্নতি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উন্নতি হবে সর্ববিধ,—আর্থিক, নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক। যে যে-বিষয়ে পিছিয়ে আছে তাকে সেদিক থেকে টেনে তুলতে হবে, কারো প্রতি অবজ্ঞা নেই। এই সর্বাত্মক উন্নয়নের আদর্শ 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর পরিপ্রেক্ষিত থেকে মহত্তর ও বৃহত্তর পথের ইঙ্গিত দেয়।